বাংলাদেশে মৌলবাদ

জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির

আবুল বারকাত

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

বাংলাদেশে মৌলবাদ
জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির
অন্দর-বাহির

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

বাংলাদেশে মৌলবাদ:
জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির
অন্দর-বাহির
Fundamentalism in Bangladesh: External and Internal
Dimensions of the Political Economy of Militancy

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
স্বত্ব ২০১৮ © আবুল বারকাত
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার সপ্তম গ্রন্থ

বাংলাদেশে আবুল বারকাত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে
আবুল বারকাত
বাড়ি নং ৫, রোড নং ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
(ফোন নং: ৮১১৬৯৭২, ০১৯৭৭৯৯২২৬৮; ০১৭৫৬১৪২৩১৫)
ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com; barkatabul71@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা রোড, নীলক্ষেত, ঢাকা।

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারী-প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

ISBN : 978-984-34-3235-3

মূল্য: ৬০০ টাকা, ইউএস ৫০ ডলার, ইউকে ৩৫ পাউন্ড, ইউরোপ ৪০ ইউরো

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০১৮), বাংলাদেশে মৌলবাদ:
জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি।

উৎসর্গ

পৃথিবীতে যারা শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক
আলোকিত মানবসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেন

২। বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা **১১**

অধ্যায় ১. ভূমিকা **১৩**

২. ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: কিছু প্রারম্ভ কথা **২১**

৩. ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধকরণ **৩৩**

৪. মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: সাম্রাজ্যবাদসংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ **৫৯**

৫. পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব: ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক **৯১**

৬. "উদারনৈতিক ইসলাম" থেকে "রাজনৈতিক ইসলাম": সমকালীন পশ্চাৎমুখী রূপান্তর **৯৭**

৭. ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি: ভিত্তি, প্রকৃতি, মাত্রা **১০৯**

৮. মৌলবাদের অর্থনীতি: গঠনপ্রক্রিয়া, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা **১২৯**

৯. মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও জঙ্গিত্ব: যোগসূত্র কোথায়? **১৫৩**

১০. মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও জিহাদ: কালবিন্যাস। যাচ্ছিটা কোন দিকে? **১৭৭**

১১. "ধর্ম ও ব্রেইন": স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন-এর যে বিষয়টি বোঝা জরুরি **১৯১**

১২. মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সম্ভাব্য "সীমানা": তাহলে করণীয়? **২০৭**

সারণি

১. মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্ভব-সহায়ক গত চার দশকের খেরোখাতা, ১৯৭৫-২০১৬ **১১৪**

২. বাংলাদেশে মাদ্রাসা (ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান), মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মসজিদ-এর সংখ্যা ও এসবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা (অতীত, বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভবিষ্যৎ): ১৯৫০-২০৫০ **১১৭**

৩. বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণির গতি-প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১৬ **১২৪**

৪. বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক নিট মুনাফা, ২০১৬ সাল **১৪০**

৫. বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক নিট মুনাফার সাথে সংশ্লিষ্ট খাত-প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের আনুমানিক সম্পর্ক, ২০১৬ সাল **১৪৮**

৬. বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিদের দ্বারা সংগঠিত বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাক্রম: ১৯৯৯-২০১৬ **১৫৫**

৭. আনসারুল্লাহ বাংলা টিম/আনসার আল ইসলাম কর্তৃক বিভিন্ন ব্লগার ও প্রকাশক হত্যাকাণ্ড, ২০১৩-২০১৬ **১৫৮**

ছক

১. "ধর্ম ও রাজনীতি"র যোগসূত্র-সংশ্লিষ্ট ৭-টি ধারণার আন্তসম্পর্ক **৩০**

২. সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের লক্ষ্য, রাজতান্ত্রিক মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব ও বাংলাদেশ: যোগসূত্রসমূহ **৫৪**

৩. "সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"-সংশ্লিষ্ট কার্যকারণের রাজনৈতিক অর্থনীতির চক্রাবর্তন সূত্র **৫৬**

৪. একক পুঁজিবাদী বৈশ্বিক কাঠামোতে হোতা সাম্রাজ্যবাদ কেন অন্যদের অধীনস্থ করবে? অধীনস্থ বিন্যাসের পিরামিড **৫৭**

৫. রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থের ত্রিভুজ **১৩১**

৬. মৌলবাদের আর্থরাজনৈতিক সাংগঠনিক মডেল **১৩৪**

৭. মৌলবাদী শক্তিসমূহের কৌশলিক আন্তসম্পর্ক **১৬৩**

৮. বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠনসমূহের বৈশিষ্ট্যসহ বিকাশকাল **১৮৩**

৯. মানুষের 'ধর্মীয় ব্রেইন' (religious brain) কী কী কারণে বিকশিত হয় এবং কীভাবে কাজ করে: উপাদানসমূহ **১৯৯**

প্রদর্শ ১. কওমি মাদ্রাসা-সৃষ্ট জঙ্গি মুফতি হান্নান **১১৮**

২. মূলধারার 'ইসলামি' দল এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের মধ্যে সম্পর্ক: অর্থের উৎস **১৩৭**

পরিশিষ্ট ১. বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট অথবা জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী অথবা ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনকারী ইসলামি সংস্থাসমূহের নাম (সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত ও কালো তালিকাভুক্তসহ) **২২২**

২. গণজাগরণ মঞ্চের ৬ দফা (৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে ঘোষিত) **২২৭**

৩. ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী (৬৩ জেলায়) ইসলামি জঙ্গিরা একযোগে বোমা হামলার সময় বিতরণকৃত লিফলেট (জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি-এর নামে প্রচারিত) **২২৮**

৪. ঢাকায় ৫ মে ২০১৩ সালে লংমার্চের পরে হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক পেশকৃত ১৩ দফা দাবিনামা **২৩০**

৫. ২০১৩-১৪ সালে হিযবুত তাহ্‌রীর কর্তৃক প্রচারিত-প্রকাশিত কয়েকটি লিফলেট ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি **২৩২**

তথ্য উৎস: ২৪১

নির্ঘণ্ট: ২৫৩

এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিদগ্ধজনের মত-মন্তব্য :

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমদ রফিক, কামাল লোহানী, অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল- ইসলাম, সুলতানা কামাল, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সেলিনা হোসেন, মামুনুর রশীদ, অধ্যাপক মিজানুর রহমান

কৃতজ্ঞতা

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর একাংশ "ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের অর্থনীতি" জনসম্মুখে উপস্থাপন করার প্রথম আনুষ্ঠানিক সুযোগটি হয়েছিল ২০০৫ সালের ২১ এপ্রিল ড. আবদুল গফুর প্রথম স্মারক বক্তৃতা'য় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে)। এ সুযোগ সৃষ্টির পেছনে মূল ব্যক্তি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে আমার সহকর্মী অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ— আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। "মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতি" নিয়ে আমাকে দেশে-বিদেশে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-কনফারেন্সে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন অনেকেই। এসব প্রাজ্ঞজনের কয়েকজন হলেন অধ্যাপক ড. কৌশিক বসু (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ১৫-১৭ অক্টোবর, ২০০৫), জনাব শাহরিয়ার কবির ও অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন (জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২৬ জুন, ২০১২); অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ও ড. জামাল উদ্দিন আহমদ, যাঁরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ব্যানারে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির উদ্যোগে দেশব্যাপী ৬টি বিভাগীয় শহরে এ বিষয়ে গণ-বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন (২০১৫-২০১৬ সালে), আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সমিতির ১৮তম বিশ্ব কংগ্রেসে এ বিষয়ে বিশেষ সেশনে বক্তৃতায় আমন্ত্রণের জন্য কংগ্রেসের সায়েন্টিফিক কমিটি (মেক্সিকো ১৯-২৩ জুন, ২০১৭)— আমি তাঁদের সবার প্রতি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার নীতিনির্ধারণী ব্যক্তিবর্গের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও আছেন অনেকেই, যাঁদের নাম-পরিচয় এ মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত— তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার বহু বছরের চিন্তা ও শ্রমের ফল। রচনাকালীন ২০ বছরের প্রথম অর্ধেক সময় কাটিয়েছি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারে, আর বাকি অর্ধেক সময় কাটিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আবাসস্থল ৩৭/জ-এর নিভৃত চিলেকোঠায়। এসব সময়ে আমাকে সময়ে-অসময়ে চিন্তায়-অবসাদে চা-পানি দিয়ে সাহায্য করেছে— জুন্নুন, ফয়েজ, মঈন, শিল্পী খাতুন, আদুরি খাতুন, আবদুল হক বাবুল— ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপি অনেক দফা টাইপ ও পুনর্টাইপে ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়েছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের মো. মোজাম্মেল হক; পাণ্ডুলিপি টাইপের পরে একাধিকবার পাঠ করে ভুলত্রুটি সংশোধনে নির্ঘুম রাত্রি

কাটিয়েছেন সেলিম রেজা; তথ্য সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মো. কবিরুজ্জামান এবং তথ্য উৎসের ছক বিন্যাসে সহায়তা করেছেন মানযুমা আহসান; প্রাথমিক পাণ্ডুলিপির ভাষাশৈলী দেখে দিয়েছেন কুয়াত ইল ইসলাম; বাংলা ভাষার বানানরীতি ও ভাষা-শৌষ্ঠব একাগ্রতার সাথে দেখেছেন প্রিয়ভাজন আফজালুল বাসার; সর্বশেষ পাণ্ডুলিপিসহ প্রেস কপি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দেখে দিয়েছেন এস এম তারিকুল ইসলাম; গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণের কাজটি করেছেন সব্যসাচী হাজরা; ছাপার কাজটি নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছেন শাহীন আহমেদ, আর ছাপাখানায় কম্পিউটার টাইপ সেটিং-এর কাজটি নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছেন আব্দুল মোতালেব, নিত্য চন্দ্র আর মেশিনম্যান আরিফ রাব্বানির হাত দিয়ে ঘুরেছে মুদ্রণের চাকা— আমি এদের সবার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্তকরণের পরে গ্রন্থটির জন্য যুৎসই অথচ মূল বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হয় এমন একটি স্বব্যাখ্যায়িত অথচ ছোট নামকরণ নিয়ে ভাবছিলাম। এ ভাবনায় আমাকে শর্তহীন সহযোগিতা করলেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক প্রদীপ বকশি। তাঁর প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থ রচনাকালে বাংলাদেশে মৌলবাদ, মৌলবাদের অর্থনীতি, সংশ্লিষ্ট রাজনীতি বিষয়ে আমি অনেক বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছি, অনেক আলোচনা অনুষ্ঠানে মত ব্যক্ত করেছি, যে কারণে মৃত্যু হুমকির সম্মুখীন হয়েছি বহুবার। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সরকার বেশ কয়েকবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করে আমাকে রক্ষার প্রস্তাব করেছিল। এসব কারণে আমার কন্যাত্রয় অরণি, আনোখি, অবন্তি ও সহধর্মিণী সাহিদা আখতার আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। ওদের ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধযোগ্য।

আগাম ধন্যবাদ পাঠকদের।

ঢাকা: ৪ জানুয়ারি, ২০১৮ আবুল বারকাত

অধ্যায় ১

ভূমিকা

"সব শিক্ষার শুরু যখন আমাদের স্বচ্ছন্দ ধারণাগুলো অপ্রতুল প্রমাণিত হয়।"
জন ডিউই, ১৮৫৯-১৯৫২

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে আমার ভাবনা-যাত্রা শুরু বলা যায় তখন থেকে, যখন দেখলাম স্বাধীন বাংলাদেশে বৈষম্যহীন অর্থনীতি আর অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো বিনির্মাণের প্রতিশ্রুত পথগুলো রুদ্ধ হয়ে আসছে। প্রথমে ১৯৭৫ সালে (১৫ আগস্ট) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মানুষে-মানুষে বৈষম্য বৃদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িকতা তোষণের রাজনীতির শুরু; তারপরে মুক্তিচিন্তার প্রায়োগিক সবকিছু নীতিগতভাবে বিসর্জন; তারপরে "সেক্যুলারইজম" অথবা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' অথবা 'ইহজাগতিকতা' (সেক্যুলারইজম-এর বাংলা ভাবানুবাদ যেটাই হোক না কেন)কে সাংবিধানিকভাবে বর্জন; তারপরে ১৯৮৮ সালে "ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম" হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণ— এসবই আমাকে দেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদের অর্থনীতি, এবং রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতির 'ইসলামীকরণ'-এর কার্যকারণ (causal relations) ও ভবিষ্যৎ প্রভাব-অভিঘাত (future impact and implications) নিয়ে ভাবিত করে। তখন থেকেই আমার ভাবনা জগতে দুটো প্রশ্ন জেঁকে বসল, যার সূত্রায়ন হতে পারে এ রকম: (১) "ধর্ম জন্মসূত্রীয় ব্যাপার। তাহলে ধর্ম নিয়ে ভালো-মন্দ বিচার সভ্য বিষয় হতে পারে না", (২) "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার; তাহলে রাষ্ট্রের আবার ধর্ম কী?"

এসব নিয়ে ভেবেছি অনেক বছর। চেয়েছি নির্মোহভাবে বিষয়টি অনুসন্ধান-অনুধাবনের। একই সাথে চেয়েছি সম্পূর্ণ বিষয়টির কার্যকারণ-এর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধের কাজটি করতে। বিষয়টি সহজ ছিল না। এসব নিয়ে আমার সক্রিয় গবেষণাকাজের শুরু বলা চলে ১৯৯৫-৯৬ সালের দিকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কাজটি শুরু করেছিলাম "বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি"-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির গবেষণা দিয়ে। যে গবেষণার ফলটি লোকবক্তৃতা (Public Lecture) আকারে প্রথম প্রকাশ করি ২০০৫ সালের ২১ এপ্রিল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির অডিটোরিয়ামে) ড. আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতায়। ড. আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতার পরে মৌলবাদের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ, আকার-আয়তন এবং এসবের সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সংযোগ— এসব নিয়ে অনেকের একদিকে যেমন চক্ষু চড়কগাছ আর অন্যদিকে কেউ কেউ এসবও বললেন যে, "মৌলবাদের অর্থনীতি" ধারণাগতভাবে 'concept' হিসেবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এক ধারণা। তবে কোন যুক্তিতে "মৌলবাদের অর্থনীতি" অপেক্ষাকৃত দুর্বল ধারণা, তা নিয়ে তাঁরা কিছুই বললেন না অথবা লিখলেন না। অথচ ২০০৫ সালের ড. গফুর স্মারক বক্তৃতাতেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আমি বলেছিলাম যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, এ দেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে হলে অথবা রাষ্ট্রক্ষমতায় বহাল থাকতে হলে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করতে হবে; পাশাপাশি এও বলেছিলাম যে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদীরাই এ দেশে ইসলাম ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম, যদি 'অন্দর' (internal) ও 'বাহির'-এর (external) স্বার্থ-সম্মিলন ঘটে।

২০০৫ সালে ড. আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতা এবং তৎপরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় যে শুধু 'মৌলবাদের অর্থনীতি' নিয়ে গবেষণা যথেষ্ট নয়, গবেষণা করতে হবে "মৌলবাদের রাজনীতি" নিয়েও। সেটাও আমি চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি "মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি" সূত্রবদ্ধকরণের। আর এসবই আমি দেশে ও বিদেশে উপস্থাপন করেছি; অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি; যেসব প্রশ্নের অনেক কিছুরই বিজ্ঞানসম্মত উত্তর আমার কাছে ছিল না। এ গবেষণা কর্মকাণ্ডটি আমি কখনো বন্ধ করিনি। সর্বশেষ আমি বুঝেছি যে ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে গবেষণাকাজে 'ধর্ম ও ব্রেইন' বিষয়টির অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানকে জানতে হবে (যাকে বলে Neurotheology); জানতে হবে স্নায়ুতান্ত্রিক রসায়ন (Neurochemistry)। এসবও বোঝার চেষ্টা করেছি। আর সুদীর্ঘ ২০ বছরের নির্মোহ গবেষণার এ প্রক্রিয়ার ফসলই বলা চলে আজকের এ গ্রন্থ।

এ গ্রন্থের ভাবনাকাল-রচনাকাল বলা যায় বেশ দীর্ঘ। এ গ্রন্থটিকে 'মৌলবাদের অর্থনীতি', 'মৌলবাদের রাজনীতি', 'মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি', 'ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব', 'মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমার বিগত ২০ বছরের (১৯৯৬-২০১৭) গবেষণাফলসমূহের নির্যাস বলা চলে। প্রকাশিত হওয়া আমার এ-সংক্রান্ত গবেষণার অন্যতম হলো:

'*বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি*', ড. আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা: ২১ এপ্রিল, ২০০৫; "*Economics of Fundamentalism in Bangladesh: Roots, Strengths, and Limits to Growth",* presented at South Asia Conference on Social and Religious Fragmentation and Economic Development, Cornell University: 15-17 October, 2005; "*ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার : মহাবিপর্যয় রোধে সেক্যুলার ঐক্যের বিকল্প নেই*", সেক্যুলার ইউনিটি বাংলাদেশ, ঢাকা : ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৫; "*বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি*", জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২০১২, ঢাকা: ২৬ জুন, ২০১২; "*Political Economy of Fundamentalism in Bangladesh*", in *Mainstream,* Special Supplement on Bangladesh, New Delhi: Vol. L1, No 14, March 13, 2013; *''বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি",* Keynote paper presented at International Public Lecture organized by Bangladesh *Itihas Sammilani* "Religion and Politics: South Asia", Dhaka: 4-5 October, 2013; "*Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh*", Keynote paper presented at International Seminar "Combating Fundamentalism and Imperialism in South Asia", Dhaka: 29 May, 2015; "*A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh*", Lead Speaker's paper, IISS, London: 9 September, 2015; "*বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: মর্মার্থ ও করণীয়*", মূল প্রবন্ধ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত জাতীয় সেমিনার ২০১৫, ঢাকা: ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ এবং চট্টগ্রাম: ১৯ মার্চ, ২০১৬; *"মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার প্রসঙ্গে"*, দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নারী-প্রতিরোধ শীর্ষক তৃতীয় দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন ২০১৬-এর জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা: ১১ মার্চ, ২০১৬; "Political Economy of Religion-based Extremism in Bangladesh: When in a Unitarian Imperialism External Causes Override

Internal Causes", XVIII World Congress of the International Economic Association, Mexico: 19-23 June, 2017.

ইতিমধ্যে বলেছি, বর্তমান গ্রন্থটি গত ২০ বছরে মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব নিয়ে আমার গবেষণাফল। আর এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যদের গবেষণা-উদ্ভূত বিষয়াদি, যুক্তিতর্ক প্রভৃতি। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব বিষয় নিয়ে গবেষণাকাজে যতই ভেতরে ঢুকলাম ততই নতুন নতুন মাত্রা আসতে থাকল। যেমন "ধর্ম ও ব্রেইন" (neurotheology); ধর্ম ও রাজনীতির বিভিন্নতর যোগসূত্র; আল-কায়েদার মহাপরিকল্পনা (বা মাস্টার প্ল্যান) আর তার সাথে আমাদের দেশের মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সম্পর্কাদি; আমাদের দেশে মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনসমূহের উত্তরণপর্বসমূহ এবং সেসবের বৈশিষ্ট্য; 'অন্দরের' (internal) অর্থাৎ দেশজ মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সাথে 'বাহিরের' অর্থাৎ বহিস্থ (external) উপাদান—সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব কব্জাকরণ প্রক্রিয়ার সম্পর্কের প্রকৃতি, কার্য-কারণ প্রভৃতি। যা হোক শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল ১২ অধ্যায়ের এই গ্রন্থ।

এ গ্রন্থের অধ্যায়সমূহের শিরোনাম মোটামুটি স্বব্যাখ্যায়িত। শিরোনামসমূহ নিম্নরূপ: ভূমিকা (অধ্যায় ১), ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: কিছু প্রারম্ভ কথা (অধ্যায় ২), ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধকরণ (অধ্যায় ৩), মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: সাম্রাজ্যবাদসংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ (অধ্যায় ৪), পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব: ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক (অধ্যায় ৫), "উদারনৈতিক ইসলাম" থেকে "রাজনৈতিক ইসলাম": সমকালীন পশ্চাৎমুখী রূপান্তর (অধ্যায় ৬), ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি: ভিত্তি, প্রকৃতি, মাত্রা (অধ্যায় ৭), মৌলবাদের অর্থনীতি: গঠনপ্রক্রিয়া, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা (অধ্যায় ৮), মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও জঙ্গিত্ব: যোগসূত্র কোথায়? (অধ্যায় ৯), মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও জিহাদ: কালবিন্যাস। যাচ্ছিটা কোন দিকে? (অধ্যায় ১০), "ধর্ম ও ব্রেইন": স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন-এর যে বিষয়টি বোঝা জরুরি (অধ্যায় ১১), এবং মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সম্ভাব্য "সীমানা": তাহলে করণীয়? (অধ্যায় ১২)। সর্বশেষ অধ্যায়ে আরও যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, তা হলো বৈশ্বিক আর্থরাজনৈতিক-ভৌগলিক সমীকরণে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ-প্রবণতার বিষয়াদি।

ভূমিকাতেই বলে রাখা জরুরি যে যেহেতু এ গ্রন্থের শিরোনামে "বাংলাদেশে মৌলবাদ" শব্দ দুটি আছে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ দাঁড়ায় অন্য দেশেও মৌলবাদ আছে যার বহিঃপ্রকাশ ভিন্নতর। আমার মতে, "বাংলাদেশের মৌলবাদ" "বিশ্বব্যাপী মৌলবাদের" বাংলাদেশি বহিঃপ্রকাশ বা রূপমাত্র। যে মৌলবাদ মূলত ইসলামভিত্তিক, যেখানে শিয়া-সুন্নি, ওয়াহাবি-সালাফিসহ সুফিবাদেরও বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিরাজমান।

'মৌলবাদ' ও তার ইংরেজি তরজমা 'Fundamentalism' বলতে আমি যা বোঝাতে চাই তা 'মৌলবাদের' জন্য খুব সঠিক প্রপঞ্চ বা প্রত্যয় মনে করি না। 'মৌলবাদ' বা 'Fundamentalism' প্রপঞ্চ বা প্রত্যয়টির আবিষ্কর্তা পশ্চিমা গণমাধ্যম, যা ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষ "সঠিক"(!) শব্দ-বার্তা বলেই ধরে নিয়েছে। 'মৌলবাদ' (Fundamentalism) প্রত্যয় বা প্রপঞ্চ বা ধারণাটির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু করে পশ্চিমা গণমাধ্যম ঠিক তখন থেকে, যখন ১৯৭৯-৮০ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে মার্কিন দূতাবাস দখল করে দূতাবাসকর্মীদের বন্দী করা হয়। ওই সময় থেকেই পশ্চিমা গণমাধ্যম আয়াতুল্লাহ খোমেনির শিয়া-ইসলামকে খ্রিস্টান ধর্মের আধুনিকতাবিরোধী ইঙ্গ-আমেরিকান ধারার সাথে সমার্থক বলে প্রচার শুরু করে।

যেহেতু 'মৌলবাদ' শব্দটি মানুষ এখন সহজেই বোঝে সে কারণেই এ গ্রন্থে তা ব্যবহার করেছি। তবে এ গ্রন্থে ধারণাগত যে অর্থে 'মৌলবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছি তার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ (যা গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি):

> "ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে যুদ্ধংদেহী এক ধর্মপ্রীতি। এটি এমনই এক বিশ্বাস, যা প্রতিনিয়ত আদর্শিক সংঘর্ষের জন্য তৈরি থাকার প্রেরণা জোগায়। সব ধর্মের মৌলবাদীরা নির্দিষ্ট এক ছকের অনুসারী। তারা আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রামের চেতনায় সদা প্রস্তুত। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসীদের সাথে মৌলবাদের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদীরা তাদের আদর্শগত এই সংগ্রাম-সংঘর্ষকে প্রচলিত রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে মূল্যায়ন করে না। বরং তাদের বিশ্বাস, এ যুদ্ধ হচ্ছে শুভ এবং অশুভ শক্তির মধ্যে দুনিয়াব্যাপী লড়াই। অস্তিত্ব হারানোর প্রচ্ছন্ন এক ভীতি মৌলবাদীদের প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রায়শ তারা সমাজের মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব বিকল্প এক চেতনার উদ্ভব ঘটায়। মনোনিবেশ করে আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্যতার

> দিকে। তথাপি মৌলবাদীরা অবাস্তব কোনো ধ্যান-ধারণার অনুসারী নয়। তারা তাদের মূল আদর্শকে অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নতুন এক মতাদর্শে বিনির্মাণ করে। তারা ধর্মীয় মৌলবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য মেলে ধরে কর্মপরিকল্পনা। মৌলবাদীরা তাদের ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনিকে সৃষ্টিকর্তার কর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে তারা জটিল সব পৌরাণিক কাহিনিকে সর্বজন উপযোগী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব মতাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হলে তাদের মধ্যে তৈরি হয় ক্ষোভ। তারা হয়ে ওঠে প্রতিহিংসাপরায়ণ।"[১]

এ গ্রন্থের শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ হলো "জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির"। এখানে 'অন্দর' বলতে বুঝিয়েছি "বাংলাদেশে মৌলবাদ"-এর অভ্যন্তরীণ (internal) বিষয়াদি। যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনোজাগতিক কার্য-কারণসংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ। জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির "অন্দরের" এসব বিষয়ের উৎস-কারণ-পরিণাম-উপাদান-বহিঃপ্রকাশ-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে পঞ্চম থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত। আর "বাহির" বলতে বুঝিয়েছি "বাংলাদেশে মৌলবাদ"-এর বহিঃস্থ বা বাইরের (external) বিষয়াদি। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিচারে বৈশ্বিক শোষণব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার প্রধান প্রতিভূ সাম্রাজ্যবাদ (এবং হোতা সাম্রাজ্যবাদ— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ)-কেই মৌলবাদী জঙ্গিত্বের মূল "বহিঃস্থ উপাদান" অথবা "বাহির" হিসেবে দেখেছি। বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি সংগঠন, যেমন আল-কায়েদা, আইএস (বা আইএস)— দৃশ্যমান এসবের কোনো কিছুকেই মৌলবাদী জঙ্গিত্বের প্রধান কারণ বা "শেকড়ের কারণ" (root cause) হিসেবে দেখিনি, দেখেছি প্রধান কারণের অথবা প্রধান কারণ সৃষ্টিকারীদের স্বার্থরক্ষার আপাত-প্রতিনিধি বা proxy হিসেবে। আবার বৈশ্বিক-সিস্টেমে মার্কিন আধিপত্যের (hegemony) পাশাপাশি প্রতিযোগী হিসেবে যেসব দেশ নতুন আধিপত্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে সেসবের সাথে মৌলবাদ-সিস্টেমের সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহকেও 'বাহির'-এর বিষয় হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছি। জঙ্গিদের রাজনৈতিক অর্থনীতির 'বাহিরের' এসব বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি প্রধানত চতুর্থ, তৃতীয় ও দশম অধ্যায়ে। অবশ্য তৃতীয় অধ্যায়ে 'অন্দর' ও 'বাহির'-এর আন্তসম্পর্কিত বিষয়াদির বিশ্লেষণ

[১] আবুল বারকাত, ২০১৫, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: মর্মার্থ ও করণীয়, পৃ. ৫।

ও সংশ্লেষণপূর্বক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধের চেষ্টা করেছি।

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু গবেষণায় ব্যবহার করেছি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (analysis and synthesis) পদ্ধতি, আরোহ ও অবরোহ (induction and deduction) পদ্ধতি, বিমূর্ততা-তত্ত্ব (theory of abstraction), ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism), দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব (theory of dialectics)-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পদ্ধতি। আর গবেষণা-উদ্ভূত ফলাফল উপস্থাপন করেছি এমন এক যুক্তিকাঠামো অনুসরণ করে, যা গবেষণা পদ্ধতির ঠিক উল্টো বলা চলে।

ভূমিকাতে আরো একটি বিষয় না বললে এ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয়ের গুরুত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যেসব বিষয়ের একটি এ রকম— ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে আমি যখনই দেশে এবং বিদেশে (বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে) প্রবন্ধ পাঠ করেছি এবং/অথবা বক্তব্য দিয়েছি, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই "প্রশ্ন-উত্তর পর্বের" বিষয়াদি সূত্রবদ্ধ করলে বিষয়টি ছিল এ রকম: আমার জীবনে "মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির"-এর মর্মার্থ নিয়ে অনেক মানুষ আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। প্রত্যুত্তরে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে আমাকে বলতে হয়েছে— "আপনার প্রশ্নটা যেন কী?" আমার ধারণা এর পেছনে প্রধান কারণ হতে পারে এ রকম যে উপস্থাপন-বক্তৃতার পরে যারা আমাকে প্রশ্ন করেছেন (ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন বলা চলে), তারা ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে হয় আমার ভাবনার বিপরীত চিন্তার মানুষ অথবা আমার ভাবনার বহিঃস্থ (জঙ্গিবাদের 'বাহির'-এর বিষয়) উপাদান (বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ)-এর গুরুত্ব স্বীকার করতে রাজি নন অথবা মনে করেন যে এসবে "দেশের অভ্যন্তরের বিষয়াদিই প্রধান" এবং বহিঃস্থ উপাদান (সাম্রাজ্যবাদ) নিয়ামক নয় অথবা মনে করেন এসবে 'ধর্ম'-ই প্রধান কারণ; অন্য সবকিছুই বড়জোর প্রভাবক ভূমিকা পালন করে মাত্র ইত্যাদি। অবশ্য এ বিষয়ে বেশ আগ্রহোদ্দীপক বিষয়টি হলো এ রকম যে, যখন ওই প্রশ্নকর্তাদের সাথে একান্ত মুখোমুখি আলোচনা করেছি, তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ করেছি তাদের 'সুর নরম' (অর্থাৎ মনের গভীরের অব্যক্ত কথা আর বাহ্যিক ব্যক্ত কথা এক নয়)।

২০। বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির

অধ্যায় ২

ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: কিছু প্রারম্ভ কথা

"প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরকে প্রয়োজন।"
হোমার, খ্রি. পূ. ৮০০-৭০০

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আগে 'ধর্ম' বা 'Religion'- এর মর্মবস্তু বলা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী এ মুহূর্তে মোট ধর্মের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক (বিষয়টি গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে)। আর 'ধর্ম' বিশ্বাস করে না এমন মানুষ নেই বললেই চলে। মূলত যে কারণে এ অধ্যায়ের শুরুতেই গ্রিক কবি-দার্শনিক হোমারের উদ্ধৃতি দিয়েছি: "প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরকে প্রয়োজন"— তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন— ধর্ম কী? এ নিয়ে ধর্মবিদ্যকদের (theologicians) মধ্যে মতভেদ আছে।

আমার ধারণা 'ধর্ম' (religion)— সেটা যে ধর্মই হোক না কেন— হলো জীবন এবং জগতের ওপর অতিজাগতিক এক কিংবা একাধিক শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস। বিভিন্ন কারণে হতে পারে তা মনের গভীরে অলৌকিক কোনো বিষয়ে বিশ্বাস অথবা অনুরূপ অবস্থা-বিশ্বাসসহ কোনো অবস্থা। ধর্মবিশ্বাস মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশের সাথে সম্পর্কিত বিধায় এ বিশ্বাসের রূপ-ধরন-বহিঃপ্রকাশ মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবসময় একই রকম ছিল না। যেমন আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতির বহু ধরনের শক্তির সামনে অসহায় ছিল, যেসব শক্তির অন্যতম হলো সূর্য, খরা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, আগুন (বন-জঙ্গলে দাবানল), আকাশে বিদ্যুতের ঝলক (বাজ), বৃহদাকার পশু-পাখি ইত্যাদি। প্রকৃতির এসব শক্তির সামনে অসহায়ত্ব আদিম যুগের মানুষকে এ সবকিছুই অতিজাগতিক-অলৌকিক

বিষয় বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। অসহায় আদিম যুগের মানুষ প্রকৃতির এসব শক্তিকে অলৌকিক মনে করে পূজা-আরাধনা করেছে।

মানুষের মনোজগতে সৃষ্টি হয়েছে আধ্যাত্মিক (spiritual) এক জগৎ। অতিজাগতিক, অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক এসব বিষয় নিয়ে মানুষের বিশ্বাস চলতেই থাকবে (রূপ পরিবর্তন হতে পারে মাত্র)। কারণ সৌরমণ্ডল একমাত্র মণ্ডল নয়; মহাজগতে অসংখ্য জগতের অস্তিত্ব আছে এবং পৃথিবী ছাড়া অপর জগতেও জীবন থাকা সম্ভব। এসব কথা এখন থেকে ৫০০ বছর আগেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বলেছেন জ্ঞানজগতের গুরু ইতালির গিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)। আর এ জন্য তাকে হত্যাও করা হয়।

মানব ইতিহাসে অতিজাগতিক শক্তি অথবা অলৌকিক শক্তির ওপর বিশ্বাসের ধরন-বৈশিষ্ট্য-বহিঃপ্রকাশ সবসময় একই রূপের ছিল না। এসবের জাগতিক ইতিহাস আছে। যে কারণেই ধর্মের ইতিহাসে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিকাশ ইতিহাস প্রতিফলিত হয়। যেমন মানুষের বিকাশ যত বেশি ত্বরান্বিত হয়েছে ততই বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম থেকে একেশ্বরবাদী ধর্মের উদ্ভব ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

ধর্ম যেটাই হোক না কেন তার সাথে ভাববাদী দর্শনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে। ভাববাদী দর্শন ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তি বিনির্মাণের চেষ্টা করে। ভাববাদী দর্শন বলে জগতের উপর আছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; বলে যেহেতু কারণ ছাড়া কোনো কাজ হতে পারে না, সেহেতু জগতেরও এক আদি কারণ আছে; বলে ধর্মের উদ্ভব-বিকাশ-অবলুপ্তি হতে পারে, তবে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়; কারণ "ঈশ্বর হলো আদি কারণ"।

ধর্মের বিবর্তনগত সুবিধাসহ ধর্মীয়-ব্রেইন কীভাবে কাজ করে সেসব বিষয় গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বলেছি। তবে এখানে বলে রাখি যে ধর্ম অবশ্যই মানুষের বিশেষ প্রয়োজনের পরিপূরক, আর এ প্রয়োজনের উৎস মানবসভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে একই রকম নয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এ প্রয়োজনের মূল উৎস হলো বৃহৎসংখ্যক শোষিত মানুষের অসহায়ত্ব, হতাশা-নিরাশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া, ন্যায়-বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং শ্রেণিসমাজে-ইহজগতে তাদের অবস্থা যে এমনই হবে বা হতে বাধ্য এ বিষয়ে বদ্ধমূল বিশ্বাস; আর একই সাথে এ আশা ও বিশ্বাস যে পরজগতে সর্বশক্তিমান রক্ষাকর্তা তাদের জন্য স্বর্গলোকে সব ধরনের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করবেন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এ বিশ্বাসটিই আবার শোষক শ্রেণি তাদের প্রচলিত অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বিনির্মাণ এবং তা জিইয়ে রাখার সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে।

এসব কারণেই দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বলেছেন, "ধর্মের সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটিগুলোর অন্যতম হলো নিজের 'ভাগ্য' নিয়ে দরিদ্রদের সন্তুষ্ট রাখতে এটা ব্যবহার করা যায়, যা ধনীদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক"।

ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও ধর্মীয় জঙ্গিত্বের মর্মার্থ অনুধাবনে প্রথমেই তিনটি বিষয় নিয়ে শুরু করা যথার্থ মনে করি। বিষয় তিনটি নিম্নরূপ:

প্রথমত, একদিকে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভিত্তিক জরিপের ভিত্তিতে গবেষকেরা বলছেন, "বিশ্বে মোট ১৩০ কোটি মুসলমান। এদের মধ্যে ৭ শতাংশ অর্থাৎ ৯ কোটি ১০ লক্ষ রাজনৈতিকভাবে উগ্রপন্থী। এই উগ্রপন্থীরা যদি মনে করতে থাকেন যে তারা রাজনৈতিকভাবে পদদলিত, আগ্রাসনের শিকার এবং অসম্মানিত, সেক্ষেত্রে পশ্চিমাদের পক্ষে ওদের মন পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।"[২] এ তো গেল সম্ভাব্য ভয়াবহতা নির্দেশকারী প্রবণতার এক দিক। আর এসব মারাত্মক প্রবণতার সৃষ্টি কোথা থেকে এবং এ প্রবণতার সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে? (এসব বিষয় পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। দ্বিতীয়ত, (অন্যদিকে) "সমস্যা সমাধানের দর্শন"(!) হিসেবে ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত উগ্রবাদী জামায়াতে-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯) বলছেন, "ইসলামের লক্ষ্য শুধু কোনো একক দেশে অথবা একগুচ্ছ দেশে ইসলামি-রাজ কায়েম করা নয়— ইসলামের লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী ইসলামি-রাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে বিপ্লব করা।"[৩] ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অন্যতম প্রবক্তা আবুল আলা মওদুদীর বিশ্বব্যাপী ইসলামি-রাজ কায়েমে যুক্তিক্রমটা মারাত্মকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। যুক্তিক্রমটা এ রকম: "যেহেতু ইসলাম নিতান্ত সাধারণ কোনো ধর্মমাত্র নয়, ইসলাম হলো মানুষের জীবন পরিচালনের বৈপ্লবিক কর্মসূচি; সেহেতু মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব হলো এই বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিজেদের পূর্ণ মাত্রায় নিয়োজিত করা। 'জিহাদ' হলো ওই বিপ্লবী লড়াই-সংগ্রাম, যা

---

[২] জন এসপোসিটো ও ডালিয়া মোগাহেদ, ২০০৭, Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. Based on Gallup's World Poll-the largest study of its kind. New York: Gallup Press.

[৩] বিস্তারিত দেখুন, হজরত মির্জা তাহয়ির আহমদ, ১৯৮৯,. *Murder in the Name of* Allah (translated by Syed Barkat Ahmad). London: Lutterworth Press. (Author wrote in Chapter 5: The Moududian Law of Apostasy, "Maulana Maududi's desire for political power knew no bounds. The law of apostasy which he evolved was an extension of his distatorial and intolerant personality– it had nothing to do with Islam. Ahmed quoted Maududi's work: "In our domain we neither allow any Muslim to change his religion nor allow any other religion to propagate its faith", দেখুন পৃ. ৪৯).

ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জনে অনুশীলন করতে হবে। ইসলামের লক্ষ্য হলো ইসলামি-রাজ কায়েম করা এবং ওই রাজ প্রতিষ্ঠায় যেসব রাষ্ট্র বাধা দেবে তাদের সমূলে ধ্বংস করা"।[৪] তৃতীয়ত, পশ্চিমাদের 'মুসলিমভীতি' অথবা 'ইসলামভীতি'-র কারণ শুধু এই-ই নয় যে (পশ্চিমাদের গবেষণা বলছে) ১৩০ কোটি মুসলমানের ৭ শতাংশ রাজনৈতিকভাবে উগ্রপন্থী (অর্থাৎ উল্লিখিত প্রথম বিষয়) অথবা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ তেল-গ্যাস-জ্বালানি-খনিজ-এর বড় অংশের ভৌগলিক অবস্থান মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল বা দেশসমূহ, অথবা মাওলানা মওদুদীর 'জিহাদ' তত্ত্ব অতি উগ্র (অর্থাৎ দ্বিতীয় বিষয়)। আমার ধারণা, আরও একটি কারণ মনে রাখা জরুরি; আর তা হলো বিশ্ব জনসংখ্যায় ভবিষ্যতে মুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য। আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে বিশ্বের মোট জনসংখ্যায় ধর্মগতভাবে মুসলিমদের সংখ্যা হবে সম্ভবত সবচে বেশি (প্রধানত জন্মহার তুলনামূলক বেশি হওয়ার কারণে)। ২০১০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার (অর্থাৎ ৬৯০ কোটির) ৩১.৪ শতাংশ ছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, যারা ২০৫০ সালে হবে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার (মোট প্রাক্কলিত জনসংখ্যা হবে ৯৩০ কোটি) ৩১.৪ শতাংশ। কিন্তু এখনকার বিশ্ব জনসংখ্যার দ্বিতীয় প্রধান গ্রুপ মুসলমানদের তুলনীয় সংখ্যা এ সময়ে (২০১০-২০৫০) ২৩.২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৯.৭ শতাংশে; আর তৃতীয় প্রধান হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তুলনীয় সংখ্যা ১৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ১৪.৯ শতাংশে।[৫] আমার হিসাবে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আর তা-ই যদি হয় সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিধানই হোক ("এক ব্যক্তি এক ভোট"), আর মুসলিম জনসংখ্যার ভৌগলিক অবস্থানই হোক (যেমন ইউরোপের অনেক দেশেই মুসলিম জনসংখ্যা এত হবে যে যখন তারা অন্তত ভোটাভুটিতে নির্ধারক শক্তি হয়ে উঠবে), কিংবা মুসলিম দেশে জ্বালানি-গ্যাস-খনিজসম্পদের মজুদের পরিমাণই হোক— সব মানদণ্ডেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের খাটো করে দেখার যুক্তি থাকবে না। এ ক্ষেত্রে 'খাটো' করার একমাত্র পথ হতে পারে 'ধর্ম' এবং/অথবা অন্য যেকোনো বিচারে বিভক্ত করার ফলপ্রদ পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করা (এ বিষয়ে আপাতত যথেষ্ট কার্যকর মাধ্যম হলো "End of the Time Narrative"; বিষয়টির মর্মবস্তু তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি)।

---

[৪] দেখুন পল কেলি ও অন্যান্য, ২০১৩, The Politics Book, London: Dorling Kindersley Limited, পৃ. ২৭৮।

[৫] বিস্তারিত দেখুন, Pew Research Centre, The Future of World Religions: Population Growth Projection, 2010-2050. Washington DC.

উপরে যা বললাম তারই নিরিখে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শুরুতেই 'ধর্ম' নিয়ে দ্বি-বিভাজনমূলক (dichotomous) একটি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ধারণাত্মক দ্বি-বিভাজনটা নিম্নরূপ:

১. 'বিশ্বাস হিসেবে ধর্ম' (religion as faith) এবং 'মতাদর্শ হিসেবে ধর্ম' (religion as ideology) এক কথা নয়;
২. 'ধর্মপ্রাণ' ও 'ধর্মান্ধ' এক কথা নয়;
৩. 'ধর্মবিশ্বাস' ও 'ধর্মীয় গোঁড়ামি' এক কথা নয়;
৪. 'ধার্মিক' ও 'ধর্মান্ধতা' এক কথা নয়;
৫. 'ধর্মভীরু' ও 'ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতা' এক কথা নয়;
৬. 'ধর্মপ্রবণ' ও 'ধর্মীয় কুসংস্কারপ্রবণ' এক কথা নয়;
৭. 'ধর্ম' (religion) এবং 'ধর্ম নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি' (perception of religion) এক কথা নয়।

ধর্ম, ধার্মিক, ধর্মান্ধতার বহিঃপ্রকাশ এবং এসবের গূঢ় অর্থ নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা-সিদ্ধান্ত যথেষ্ট মাত্রায় ঘোলাটে। এসব স্পষ্টীকরণে উল্লিখিত দ্বি-বিভাজনসমূহ নিয়ে দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের রীতিমতো নির্মোহ গবেষণা জরুরি।

ধর্ম নিয়ে দ্বি-বিভাজনের বিষয়টি ধারণাগত, প্রায়োগিক ও নীতিগত সব দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথমত, প্রায়শই দ্বি-বিভাজনের একটি অংশের সাথে অন্য অংশ সমার্থক মনে করা হয়, ফলে সিদ্ধান্ত হয় ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, দ্বি-বিভাজনের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অংশে রূপান্তর সম্ভাবনা থাকলেও বিপরীত সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তৃতীয়ত, একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এসব দ্বি-বিভাজনের কোন অংশে যাবেন সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তিনি যে সমাজে বাস করেন ওই সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য-প্রবণতাসমূহ, ওই সমাজে তার অবস্থা-অবস্থান, তার চিন্তা-ভাবনা থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর। চতুর্থত, (এবং সম্ভবত বেশ জটিল) 'ধর্ম' (religion) এবং 'বিশ্বাস' '(faith) সমার্থক নয়। কেউ যদি বলেন, "আমি প্রকৃতির শক্তিতে বিশ্বাস করি", তাহলে একদিকে 'ধর্ম' বলবে, "প্রকৃতি যেহেতু ঈশ্বরের সৃষ্টি, সেহেতু আপনি কোনো না কোনো 'ধর্মে' বিশ্বাস করেন, আর সেটা হলো সেই ধর্ম যে ধর্মের ঈশ্বরই প্রকৃতির স্রষ্টা; ধর্ম অবলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নয়; কারণ তিনিই আদি কারণ"। আর অন্যদিকে, 'প্রকৃতিবিশ্বাসী' মানুষটি দার্শনিক ফয়েরবাখের অনুসরণে বলতে

পারেন, "যেহেতু আমরা আমাদের নিজ স্বার্থে নিজ নিজ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছি, সেহেতু আমি প্রকৃতির শক্তিতেই বিশ্বাসী; অন্য কিছুতে নই।" অথবা "প্রকৃতিবিশ্বাসী" মানুষটি লিও তলস্তয়ের অনুসরণে বলতে পারেন "আমি ধার্মিক নই। আমি একজন মানবতাবাদী, কেননা ধর্মীয় মতবাদ ও পরম্পরগত ঐতিহ্যের চেয়ে মানুষ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" অর্থাৎ 'ধর্ম' ও 'বিশ্বাস'— এ দ্বি-বিভাজনের বিষয়টিও অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

ধর্মের সাথে রাজনীতির যোগসূত্র নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। বিগত দুই হাজার বছরের লিখিত ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ মেলে যে ছোট-বড় সংঘাত-সংঘর্ষ-যুদ্ধে 'ধর্ম'কে ব্যবহার করা হয়েছে (এ বিষয়ে গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে)। আর সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই সাধারণ মানুষ— আমজনতা (অথবা তাদের পক্ষের কেউ) জনগণের ন্যায় অধিকার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে, তখনই রাষ্ট্র (সে যে ধরনের রাষ্ট্রই হোক না কেন) ওই অধিকার দমনের লক্ষ্যে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে প্রায়শ ধর্মকে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ বিষয়টি "ধর্ম' নয়", "ধর্মের দোহাই"।

আবার এমনটিও লক্ষ করা যায় যে ইতিহাসে যখনই কোনো নতুন আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আগমন ঘটছে, তখনও ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন ইউরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভবকালীন সময়ে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বিপরীতে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মের ব্যবহার।[৬] আবার এমনও দেখা যায় যে যখন জনকল্যাণকামী কোনো আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ হচ্ছে, তখন তা প্রতিরোধে ধর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমাজতন্ত্রবিরোধীদের ধর্ম ব্যবহার। অথবা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে ধর্মের ব্যবহার।

আমাদের নিকট ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করে যে, জনগণ যখন তাদের ন্যায় অধিকার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, তখনই ধর্মের অপব্যবহার বেশ শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। যেমন পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১

[৬] ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে সংস্কারবাদী আন্দোলনের যুগে প্রোটেস্ট্যান্টবাদের উদ্ভব। প্রোটেস্ট্যান্টদের মতে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে ব্যক্তির জন্য যাজক বা গির্জার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের ওপর খ্রিষ্ট যাজক সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্টদের এই অভিমত ছিল চূড়ান্ত আঘাত, এসবই ছিল পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভবকালীন সহায়ক-ধর্মশক্তি। সামন্তবাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল বিধিবন্ধন থেকে ব্যক্তির মুক্তি সাধনে এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্টবাদ বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে [এমনই সহায়ক ভূমিকা যখন ম্যাকস্ ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) রচনা করে ফেললেন "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism", 1977]।

সময়কালে) এ দেশের মানুষ যখনই তাদের ন্যায় অধিকার ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রাম করেছে, তখনই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী (তাদের অনেকেই এমনকি আনুষ্ঠানিক অর্থেও ইসলাম ধর্ম পালন করত না, যেমন করে না ধর্মনির্বিশেষে রাজতন্ত্রীরা) ওইসব লড়াই-সংগ্রাম নির্মূল করতে ধর্মকেই স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছে; বলেছে, *"ইসলাম খাতরে ম্যায় হ্যায়"* (ইসলাম বিপন্ন)। আসলে বিপন্ন হলো অগণতান্ত্রিক শোষণভিত্তিক ও গণবিরোধী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তার সরকার। কিন্তু ওই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে ব্যবহার করা হলো ধর্মের নাম। অর্থাৎ লক্ষণীয় হলো "ধর্ম ও রাজনীতির" সুস্পষ্ট যোগসূত্র। 'ধর্ম ও রাজনীতির' এ যোগসূত্র হতে পারে বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন ধরনের। যেমন,

১. *ধর্মের রাজনীতি* (Politics of religion) : অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব-স্বকীয় রাজনৈতিক আদর্শ-মতাদর্শ-ভাবাদর্শ আছে। এসব নিজস্বতা বা স্বকীয়তা ধর্মে-ধর্মে হানাহানি ও সহিংসতার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে (বিষয়টি একাদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি)।

২. *ধর্মের মধ্যে রাজনীতি* (Politics in religion) : অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে ধর্মের মধ্যেই রাজনীতির বীজ আছে, যা সময়-সুযোগমতো যেকোনো দিকে ব্যবহার করা যায় এবং যা রাজশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, ক্ষমতাধর শক্তি ব্যবহারও করে। বিষয়টি ধর্মনির্বিশেষে ধর্মের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-উদ্ভূত।

৩. *ধর্ম নিয়ে রাজনীতি* (Politics using religion) : অর্থাৎ ধর্মকে সমাজের উপরিকাঠামোর বা রাজনীতির বা রাষ্ট্র পরিচালনার অংশ-পদ্ধতি-উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ। এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এবং/অথবা ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিকে— যখন যেভাবে প্রয়োজন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সুযোগমতো ব্যবহার করা হয়। অথবা বিষয়টি এমনও হতে পারে যে যখন আর কোনো কিছু দিয়ে শাসকেরা পারছে না, তখন মানুষকে বিভাজনের পদ্ধতি হিসেবে ধর্ম ব্যবহার করছে অথবা দেশের কোনো অংশের (কোনো ধর্মের) মানুষকে আপাতত ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছে।

৪. *রাজনীতিতে ধর্ম* (Religion in Politics) : ওপরে ইতিমধ্যে যা বললাম 'রাজনীতিতে ধর্ম" বলতে যেমন ওইসব বোঝানো যেতে পারে আবার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানোর জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নির্দিষ্ট ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। বিষয়টি রাষ্ট্রিক

অথবা সরকারি আচার-অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট ধর্মের বাণী দিয়ে শুরু করা থেকে নির্দিষ্ট ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫. *রাজনৈতিক ধর্ম* (Political religion) : বিষয়টি "ধর্ম-রাজনীতি" যোগসূত্রের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মারাত্মক; যার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় অভিঘাতই মারাত্মক প্রগতিবিরুদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল। যেমন "ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র" অথবা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মকে সাংবিধানিকভাবে অথবা প্রাত্যহিক প্রায়োগিক জীবনে "রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়"। এ ধরনের স্বীকৃতি এখন দেখা যায় ইসলাম ধর্মে, ইহুদি ধর্মে, হিন্দু ধর্মে, বৌদ্ধ ধর্মে, খ্রিস্টান ধর্মে; এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই এ প্রবণতা এখন লক্ষ করা যায়। এ অবস্থায় আমার স্পষ্ট সূত্র-বক্তব্য হলো: "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার; তাহলে রাষ্ট্রের আবার ধর্ম কী?"

৬. *ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ* (Politicization of religion) : এসব লক্ষ করা যায় যখন ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয়, অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী যখন তাদের কর্মসূচি-ঘোষণাপত্রে নির্দিষ্ট ধর্মের পক্ষ গ্রহণ করে, অথবা ধর্মের নামে রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনা করা হয়, অথবা সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেমন শিক্ষাব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট ধর্মের পক্ষাবলম্বন করা হয় প্রভৃতি। ধর্মের রাজনৈতিকীরণের সামাজিক সাংস্কৃতিক অভিঘাতটি দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিকর, প্রগতিবিরুদ্ধ। এ বিষয়ে আমাদের দেশকেন্দ্রিক অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে কথাটি কয়েক দিন আগে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেছেন, তা হলো: "সংবিধানের সংশোধনীর দ্বারা ১৯৭২ সালের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে বটে, কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম রয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম কীভাবে সহাবস্থান করতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। তাই ১৯৭২-এর সংবিধানে যেসব মূলনীতি ঘোষিত হয়েছিল অক্ষতভাবে তা যে ফিরে আসবে, আমার সে ভরসা নেই। এবং সে মোড় নেওয়ার সময়ে ইতিহাস আমার ভরসা-নির্ভরসাকে বিবেচনায় নেবে না। আজ মনে হয়, ১৯৭১ থেকে আমরা দূরে, বহু দূরে চলে এসেছি এবং ১৯৭১-এর পূর্ববর্তী ২৪ বছরের সংগ্রাম ও অর্জনের ধারার সঙ্গে তুলনা করলে তার পরবর্তী ৪৬ বছরের ধারাকে পশ্চাদপসরণ ও বিসর্জনের ইতিহাস বলতে হবে।"[৭]

[৭] আনিসুজ্জামান, ২০১৭, আমাদের সংবিধানের মূলনীতি, পৃ. ১১। বাঙলার পাঠশালা আয়োজিত বাংলাদেশ সংবিধান দ্বিতীয় সম্মাননা স্মারক ২০১৭ প্রাপ্তি উপলক্ষে স্বাগত ভাষণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ৮ নভেম্বর, ২০১৭।

৭. *রাজনীতির ধর্মীকরণ* (Religionization of politics) : এটা করা হয় বিভিন্ন কারণে। তবে প্রধানত তখন এসব করা হয়, যখন দেখা যায় যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ে রাজনীতিকেই ধর্মীকরণ করা সবচেয়ে সহজ পথ। আর এটা করা হয় সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রেই– রাজনৈতিক (এমনকি অপেক্ষাকৃত "অসাম্প্রদায়িক" পরিচিতির বাহন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র থেকে শুরু করে দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে), সাংস্কৃতিক (যার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় শিক্ষার কারিকুলাম থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মকাণ্ডে), সামাজিক (সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম-পরিচয় জনসম্মুখে প্রচারের মাধ্যমে), এবং অর্থনৈতিক (শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকিং থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের আর্থিক কর্মকাণ্ডে)।

এতক্ষণ "ধর্ম ও রাজনীতি"র সংযোগ বা যোগসূত্র নিয়ে যে ৭টি সূত্রের কথা বললাম সেগুলো যেমন এককভাবে দেখা সম্ভব, তেমনি একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কিত। "ধর্মের সাথে রাজনীতি" (অথবা রাজনীতির সাথে ধর্মের) যোগসূত্র নিয়ে ওপরে যে সাতটি ধারণা (concept) বা সূত্রের কথা বললাম এগুলোর একটি আরেকটির সাথে কীভাবে সম্পর্কিত সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে তেমন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু এসব সংযোগসূত্র "ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি"র সার্বজনীন সূত্র বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় বিষয়, সেহেতু "ধর্ম ও রাজনীতি"র যোগসূত্র-সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত সাতটি ধারণার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় পদ্ধতিতত্ত্বগতভাবে (methodologically) বেশ জরুরি। এ বিষয়ে আমার ধারণা নিম্নরূপ: প্রথমত, "ধর্মের মধ্যে রাজনীতি", "ধর্মের রাজনীতি" এবং "ধর্ম নিয়ে রাজনীতি" — এ তিনটি ধারণাকে একটি বৃহৎ বর্গের (প্রথম বৃহৎ বর্গ) অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে দেখা যেতে পারে, যেখানে বাকি চারটি ধারণা দ্বিতীয় বৃহৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ "রাজনীতিতে ধর্ম", "ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ", "রাজনীতির ধর্মীকরণ" এবং "রাজনৈতিক ধর্ম" অন্তর্ভুক্ত হবে দ্বিতীয় বৃহৎ বর্গে। দ্বিতীয়ত, প্রথম বৃহৎ বর্গ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে দ্বিতীয় বৃহৎ বর্গের অস্তিত্ব থাকে না; অর্থাৎ প্রথম বৃহৎ বর্গটি দ্বিতীয় বৃহৎ বর্গের উদ্ভবের কারণ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত ধারণাত্রয়ের যৌক্তিক বিন্যাস হতে পারে এ রকম: 'ধর্মের মধ্যে রাজনীতি' → 'ধর্মের রাজনীতি'→ 'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি'। আর দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত চারটি ধারণার যৌক্তিক বিন্যাস হতে পারে এ রকম: "রাজনীতিতে ধর্ম" → "ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ" → "রাজনীতির ধর্মীকরণ" → "রাজনৈতিক

ধর্ম"। এসবই সহজবোধ্যভাবে ছক ১-এ দেখানো হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যেহেতু খুবই জটিল, সেহেতু সহজবোধ্য করার ক্ষেত্রে সরলীকরণজাত ত্রুটি থাকতে পারে (অবশ্য তাতে মর্মগত কোনো পরিবর্তন হবে না)।

ছক ১: "ধর্ম ও রাজনীতি"র যোগসূত্র সংশ্লিষ্ট ৭টি ধারণার আন্তসম্পর্ক

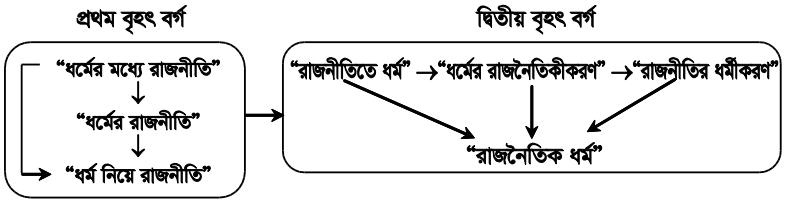

"সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"— এসব নিয়ে আরও এগোনোর আগে স্পষ্ট করা প্রয়োজন প্রত্যয় বা ধারণা হিসেবে (অর্থাৎ as category or concept) 'অ—সাম্প্রদায়িকতা' (secularism) ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কি সমার্থক? উভয়েই কি একই অর্থ ধারণ করে?

'সেক্যুলারইজম' বা 'অসাম্প্রদায়িকতা' প্রত্যয়টির উদ্ভব ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতি দর্শনে; যার সারবস্তু ধর্মনিরপেক্ষতাহীনতা অথবা ধর্ম-অনিরপেক্ষতা নয়। আমাদের দেশে 'অসাম্প্রদায়িকতা' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে একই অর্থে দেখা হয়, সমার্থক মনে করা হয়। যেমন আমাদের সংবিধানের বাংলাভাষ্য সংস্করণে যত জায়গায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি আছে, ইংরেজি তরজমায় ঠিক সেসব জায়গায় লেখা হয়েছে 'সেক্যুলারইজম' (অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িকতা)। শুধু তা-ই নয়, 'কম্যুনালইজম' (communalism) তাহলে কী? কম্যুনালইজমের আভিধানিক অর্থ হলো "বিশেষত কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের উগ্র জাতীয় চেতনা, যা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার বা সহিংসতার জন্ম দেয়।" আমাদের দেশে 'ধর্মভিত্তিক উগ্রতা' কি জাতীয় চেতনায় রূপ নিয়েছে? আমার মতে, এসব বিভ্রান্তি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বিভ্রান্তিই নয়, তা ধারণাত্মক বিভ্রান্তি ও মর্মগত ভ্রান্তিও। কারণ একজন মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে (বা কারণে) সাম্প্রদায়িক হতে পারেন। আবার সাম্প্রদায়িক হতে হলে "প্রচলিত অর্থের ধর্ম" থাকতেই হবে এ কথা বিভ্রান্তিকর এবং ভুল। অনুরূপ, কেউ ধর্মনিরপেক্ষতাহীন হলে তাকে ধর্মের ব্যবহার করতেই হবে, আবার ধর্মপ্রাণ বা ধার্মিক হলেই যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাহীন হবেন— এর কোনোটিই স্বতঃসিদ্ধ নয়। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা-অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষহীনতা-ধর্মনিরপেক্ষতা— এসব নিয়ে দার্শনিক, ভাষাবিজ্ঞানী ও সামাজিকবিজ্ঞানীদের অনেক গভীরে গিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। এসব

ভাবনা-ফল ও তার প্রয়োগের সাথে ভবিষ্যৎ সমাজ-প্রগতির অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব— এসবের স্বরূপ অনুধাবনে আরও অগ্রসর হওয়ার আগে বলা উচিত যে, আত্মিক অথবা প্রায়োগিক যেকোনো অর্থেই ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে যুদ্ধংদেহী এক ধর্মপ্রীতি। এটা এমনই এক বিশ্বাস, যা প্রতিনিয়ত আদর্শিক সংঘর্ষের জন্য তৈরি থাকার প্রেরণা জোগায়। বড় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এর অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ এমনকি কনফুসিয়াস অনুসারীদের কথা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে যাওয়ার আগে "ধর্ম ও রাজনীতি" সম্পর্ক নিয়ে আমার ব্যক্তিগত ধারণার কয়েকটি উপসংহারিক বিষয় (পাঠকের ভাবনা-চিন্তার জন্য) স্পষ্ট উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। যেগুলো হলো: (১) ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার; তাহলে রাষ্ট্রের আবার ধর্ম কী? (২) ধর্ম জন্মসূত্রীয় ব্যাপার; তাহলে ধর্ম নিয়ে ভালো-মন্দ বিচার সভ্য বিষয় হতে পারে না। (৩) ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের আচরণে ধর্মাচার যখন ধর্মীয় সংখ্যাস্বল্পদের জন্য ভীতির কারণ হয়, তখন পরিণতিতে এমন কিছু ঘটে যা পূর্বানুমান কঠিন; কিন্তু যেকোনো বিচারেই তা মহাবিপর্যয়কর (বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বিশ্লেষিত হয়েছে)।

৩২। বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির

অধ্যায় ৩

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধকরণ

"সব বিজ্ঞানই অনাবশ্যক প্রমাণিত হতে পারে যদি বিষয়ের বাহ্যিক রূপ এবং মর্মার্থ সরাসরি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।"
কার্ল মার্কস, ১৮১৮-১৮৮৩

"সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ"— এসবের উত্থান-উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতি নিয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির কোনো সাধারণ-সার্বজনীন তত্ত্বের (generalized political-economic theory) কথা আমার জানা নেই। এসব বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।[৮]

[৮] বিগত ৪০-৫০ বছরে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দেখুন (এখানে শুধু গ্রন্থকার/প্রবন্ধকার-এর নাম, প্রকাশনা সাল ও গ্রন্থ/প্রবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করা হলো; প্রকাশনা-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি এ গ্রন্থের শেষে তথ্যপঞ্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে): জি এইচ হ্যানসেন, ১৯৭৯, Militant Islam; ইমানুয়েল সিভান, ১৯৮৫, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics; রোবিন রাইন, ২০০১, Sacred Rage: The Wrath of Militant Islam; ক্রস লরেন্স, ১৯৯৫, Defenders of God: the Fundamentalist Revolt against the Modern Age; জ্যাকব ল্যানডাত্ত, ১৯৯০, The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization; উইলিয়াম মন্টগোমেরি ওয়াট, ১৯৮৮, Islam Fundamentalism and Modernity; জোহান্স জ্যানসেন, ১৯৯৭, The Dual Nature of Islamic Fundamentalism; জন ইসপোসিটো (সম্পাদিত), ১৯৯৭, Political Islam: Revolution, Radicalism or Reform?; সাঈদ আবুল আলা মওদুদী, ১৯৯৮, Political Theory of Islam: তালাল আসাদ, ২০০৩, Formations of the Secular: Christianity, Islam and Modernity; সামির আমিন, ২০০৭, Political Islam in the Service of Imperialism; আইযায আহমদ, ২০০৮, Islam, Islamists and the West; বাসসাম টিবি, ১৯৯৮, The Challenge of Fundamentalism; Political Islam and the New World Disorder; ইউসুফ চৌয়েরি, ১৯৯০, Islamic Fundamentalism; হামিদ দাবাসি, ২০০৮, Islamic Liberation Theology: Resisting the Empire; গ্রাহাম ফুলার, ২০০৩, The Future of Political Islam; রিচার্ড ডাওকনিস, ২০০৬, The God Delusion; জিওফফ্রে ও

'ধর্মের' সাথে 'যুদ্ধের' সম্পর্ক অথবা 'ধর্মের' সাথে সংঘাত-সংঘর্ষ-বিদ্রোহ-বিপ্লব— এসবের সম্পর্ক নিয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্যে বহু মত আছে। এসব 'মত'-এর বেশির ভাগই 'ধর্মকে'-ই যুদ্ধ-সংঘাত-সংঘর্ষ-বিদ্রোহ-বিপ্লবের 'মূল কারণ' হিসেবে দেখিয়ে থাকে। বেশির ভাগই বলে এসবে "ধর্মভিত্তিক কারণই মূল কারণ", আবার কেউ কেউ বলে "ধর্ম এসবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে"। নোয়াম চমস্কির মতে, ইসলাম ধর্মভিত্তিক জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ (বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ) "ভিত্তিমূল" বা "পটভূমি" (background) সৃষ্টি করেছে। আর তেমন কোনো গবেষণা নেই বললেই চলে যেখানে বলা হয় যে "শোষণ", "সাম্রাজ্যবাদ", এবং "হোতা সাম্রাজ্যবাদ— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ" এসবের পেছনে "মূল কারণ" (বর্তমান অধ্যায় ও চতুর্থ অধ্যায়সহ এসবের ঐতিহাসিক কালপর্ব সম্পর্কে একাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে)। তাহলে মূল কথা দাঁড়ায় এ রকম– এসবের উৎস-সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ-সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করে এখন পর্যন্ত কেউই সমগ্র বিষয়টিকে রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের নিরিখে সার্বজনীন সূত্রবদ্ধকরণে (general political economy theory) সক্ষম হননি। এ পর্যন্ত আমরা কেউ সংশ্লিষ্ট সূত্রবদ্ধকরণের জটিল তত্ত্বীয় কাজটির প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি উপলব্ধি করিনি। আমরা ধর্মভিত্তিক মৌলবাদকে মৌলবাদের দৃষ্টান্ত (example অর্থে) আর তার বহিঃপ্রকাশ (appearance অর্থে) দিয়ে ব্যাখ্যা করেছি; মৌলবাদী জঙ্গিত্বকেও আমরা ওসবের দৈনন্দিন দৃষ্টান্ত আর দৃশ্যমান প্রকাশ দিয়েই বুঝবার চেষ্টা করেছি মাত্র। আসলে এসব নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজটি কখনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে খুব গুরুত্বের সাথে জ্ঞানশাস্ত্রীয় বিধি-বিধান মোতাবেক করা হয়নি। এসবের পেছনেও অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন— (১) "গতানুগতিক ধারণা কষ্টসাধ্য চিন্তা থেকে আমাদের রক্ষা করে" (জন কেনেথ গলব্রেথ), (২) "বিভ্রান্তিকর জ্ঞান থেকে সাবধান, এটা অজ্ঞতার চেয়ে ভয়াবহ" (জর্জ বার্নাড শ্), (৩) "জ্ঞানের সবচেয়ে বড় শত্রু অজ্ঞতা নয়; তা হলো জ্ঞানের বিভ্রান্তি" (স্টিফেন হকিং), (৪) ধর্মভিত্তিক উগ্রতার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি তার উগ্রতার পরিণাম আঁচও করতে পারে না; এবং শোষকেরা ধর্মের প্রতি অতিমনোযোগী। আর এ মনোযোগ হাজার গুণ বাড়ে, যখন তাদের ভিতে ভূ-কম্পন বাড়ে (শেষোক্তটি আমার ধারণা)। এসব বিষয়ে পরে আসছি।

তারিক মোদুদ (সম্পাদিত), ২০০৯, Secularism, Religion and Multicultural Citizenship; লেইলা আহমেদ, ১৯৯২, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate; তারিক আলী, ২০০২, The Clash of Fundamentalisms: Crusade Jihads and Modernity; জেমস পিসকাটেরি (সম্পাদিত), ১৯৮৩, Islam in the Political Process; প্রভাত পাটনায়েক, ২০০৩, Imperialism and Terrorism.

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মূলত পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ যোগাযোগমাধ্যমে আমরা অনেক কিছুই দেখছি, শুনছি। এসবের দৃশ্যমান রূপ অনেক ধরনের। বহু রূপ এসবের। দেশ-বিদেশে এসবের দৃষ্টান্ত আর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমরা সবাই যা দেখেছি ও দেখছি, তার অতিসংক্ষিপ্ত তবে খুব প্রয়োজনীয় একটি তালিকা হতে পারে এ রকম:

১. সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র সহযোগিতা প্রদান করল, আর সাথে সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর মাধ্যমে পাকিস্তানের সহযোগিতায় সেখানে সশস্ত্র তালেবানইজম সৃষ্টি করল, সৃষ্টি করল মোল্লা ওমর-বিন লাদেনদের; দখল করল আফগানিস্তান; মাদক সম্রাট (drug lord) এবং অস্ত্র সম্রাটদের (arms lord) রাজত্ব প্রসারিত হলো। আবার উল্টোটাও বলা হয় যে ১৯৭০-এর দশকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকায় আফগানিস্তানসহ আফগান-পাকিস্তান বর্ডারে (মূলত খাইবার গিরিপথ অঞ্চল এবং পেশোয়ার অঞ্চলে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর প্রত্যক্ষ সহায়তায় ইসলামি জঙ্গি প্রশিক্ষণকেন্দ্রসহ বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এ ছিল আফগান বর্ডার অঞ্চলে সোভিয়েত আক্রমণের অথবা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদের প্রাক্-প্রস্তুতি। এসব কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে নতুন সরকার গঠনসহ সামরিক সহযোগিতা প্রদান করে। অর্থাৎ সমগ্র বিষয়টি একদিকে যেমন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা রক্ষার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস আর অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদলের কোনো রাষ্ট্র আফগানিস্তানে যেন কোনোমতেই সৃষ্টি না হতে পারে সে লক্ষ্যে সামরিক শক্তি সরবরাহসহ ইসলাম ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব সৃষ্টি করা। অর্থাৎ শেষোক্ত ক্ষেত্রে "ইসলামাইজেশন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট-বিরোধী অন্যতম কৌশল"।

২. অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মুসলমানদের একাংশ ইসলামিক স্টেটস অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (ISIS), যা এখন ইসলামিক স্টেটস (IS) নাম নিয়ে সিরিয়া ইরাক, ইয়েমেনসহ বেশ কিছু দেশে যুদ্ধে নেমেছে; যে যুদ্ধের নাম "জিহাদ"; যে জিহাদের মাধ্যমে হয় তারা সুনির্দিষ্ট কোনো এলাকা

দখলে রাখতে চায় অথবা রাষ্ট্রকেই দখল করে নিতে চায়। এসবে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি বিভাজনসহ যত ধরনের বিভাজন-সম্ভব সবই কাজে লাগানো হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা তাদের কর্মকাণ্ডে আইএসকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে "শেষ সময়ের বর্ণনা" অথবা "পৃথিবীর শেষ ঘণ্টা" ("End of the Time Narrative, ETN)" বলে একটি বিষয় আবিষ্কার করেছে। 'শেষ সময়ের বর্ণনা' অথবা "পৃথিবীর শেষ ঘণ্টার বর্ণনা" বিষয়টি এ রকম: "হজরত মুহম্মদ (দ:) জীবনের শেষ দিকে বলে গিয়েছেন যে, (১) শুধু সুন্নিরাই প্রকৃত মুসলমান।" উদারবাদী মুসলমান, শিয়া ও আহমেদিয়ারা প্রকৃত মুসলমান নন। (২) পৃথিবীর শেষ ঘণ্টাটা বাজবে তখন, যখন পশ্চিমারা সিরিয়ার দাবিক শহরে অনুপ্রবেশ করবে, আর তখনই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা (মোজাহেদিনরা) ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।" [৯] উল্লেখ্য যে ETN অনুযায়ী দাবি করা হয় যে হজরত মুহম্মদ (দ:) জীবনের শেষ দিকে সিরিয়ার দাবিক শহরে অবস্থানকালে ETN নিয়ে বলেছেন; দাবিক শহর এখন IS-এর হেডকোয়ার্টার (সদর দপ্তর) হিসেবে পরিচিত এবং একই সাথে IS-এর ওয়েবসাইটের নামও "দাবিক"।

৩. ইসরায়েলে ইহুদি ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের হত্যাসহ জমিজমা নির্বিচারে দখল করছে। প্রায় এক শ বছর ধরে চলছে এসব।

৪. পাকিস্তানে ধর্মের নামে মানুষ হত্যাসহ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

৫. কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ-লড়াই সেটাও চলছে ধর্মের নামে। এসবই চলছে ৭০ বছর ধরে।

৬. ভারতের উত্তর প্রদেশে হিন্দু মৌলবাদীরা (বিজেপি) ক্ষমতায় এসে (এই ২০১৭ সালে) মুসলমানদের গো-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। এসব নিয়ে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে কয়েক শ মানুষ। শুধু তা-ই নয়

[৯] "শেষ সময়ের বর্ণনা" বা "End of the Time Narrative": নিয়ে বিস্তারিত দেখুন: Kirsten E. Schulze, 2009, "Indonesia– The Radicalisation of Islam"; Sahih Muslim, The Book of Tribulations and Portets of the Last Hour, Chapter: The Conquest of Constantinpole, book 54, hadith 44, 'The Emergence of the Dajjal and the Descent of 'Eisa bin Mariam', http://sunnah. com/muslim/54-44.

ক্ষমতাসীন বিজেপির মতাদর্শিক গুরু সংগঠন, আরএসএস ভারতকে "হিন্দু রাষ্ট্র" বানাতে চায় বিধায় আরএসএস-এর মনোনীত কাউকে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বানানোর চেষ্টা চলছে। তবে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা দলিত সম্প্রদায়কেও সামনে আনছে।

৭. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'লাল ঘেটিওয়ালা সাদারা' (ওদের বলে red neck white), যারা মূলত খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী; এরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মোটামুটি ক্রুসেড ঘোষণা করেছে (প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব বেশ পরিষ্কারভাবেই বলেন)।

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মুসলিম-অধ্যুষিত উইঘুর অঞ্চলে মেয়েদের বোরখা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৯. মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে ও হচ্ছে, তা গণহত্যা (জেনোসাইড) এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এসবই করা হচ্ছে থিরাভাদি বৌদ্ধ ধর্মীয় মৌলবাদ ব্যবহার করে। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম বলে "জীব হত্যা মহাপাপ"।

১০. বাংলাদেশে মৌলবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে; ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ তার নিজস্ব এক অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করেছে (যা আমি ২০০৪ সাল থেকে "মৌলবাদের অর্থনীতি" বলে বিশ্লেষণ করে আসছি); মৌলবাদী জঙ্গিরা অনেক মানুষ হত্যা করেছে, অনেক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে; মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করেছে; আত্মঘাতী নারী জঙ্গিরা জীবন দিতে কুণ্ঠা বোধ করছে না (শিশুরাও পরিত্রাণ পাচ্ছে না); জঙ্গিদের হাতে খুন হচ্ছেন বিদেশিরাও (১ জুলাই ২০১৬, হলি আর্টিজান বেকারি); এখন ১৩৩টি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন কাজ করছে; ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলাম যেভাবে ঢাকা শহর দখল করেছিল, তা দেখে জীবন নিয়ে ভীত হননি এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া যাবে না; হেফাজতে ইসলামের দাবি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তিত হচ্ছে— শিক্ষার ইসলামীকরণের কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে; কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাকে উচ্চতর ডিগ্রির সমমর্যাদা দেওয়া হচ্ছে; দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে বিনির্মিত গ্রিক দেবীর ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার দাবি উঠেছে, মোটামুটি নিশ্চিত যে এরপরে সব ধরনের অসাম্প্রদায়িক ও লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উচ্ছেদে হাত দেওয়া হবে;

নারীবিদ্বেষ এবং গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তি বাড়ছে— এসবের ফলে ত্বরান্বিত হচ্ছে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, সংকুচিত হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতার অন্তর্নিহিত শক্তি, ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজ দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

১১. থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার বহু দিনের ইতিহাস। আর মুসলমানেরাও সেখানে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করছে। কথিত যে এসবে আল-কায়েদা ও আইএস-এর সম্পর্ক আছে।

১২. ইয়েমেনে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নারী-শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে। ইদানীং ইয়েমেনে সবচেয়ে বর্বর ঘটনাটি ঘটেছে ২৭ জুন, ২০১৬ তে মুকাল্লা শহরে। যেদিন আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৩৮ জন নিরীহ নারী-শিশু নিহত হয়েছেন।

১৩. তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক বিমানবন্দরে বোমা হামলায় ৪৫ জন মানুষের প্রাণ দিতে হয়েছে (২৮ জুন, ২০১৬)।

১৪. মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ধর্মের নামে বোমা হামলা হচ্ছে।

১৫. ফিলিপাইনে 'মোরো' জঙ্গিরা শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

১৬. ইরাকের বাগদাদসহ বিভিন্ন শহরে বোমা হামলা এখন নিত্যনৈমিত্তিক। সর্বশেষ বড় মাপের বিপর্যয়কর ঘটনাটি ঘটেছে ৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাগদাদের ব্যস্ততম সুপার মার্কেটে। ওই দিন মধ্যরাতে গাড়ি বোমা হামলায় ৩০৮ জনের প্রাণহানি ছাড়াও শত শত মানুষ আহত হন।

১৭. সৌদি আরবে ২০১৬ সালের ৪ জুলাই তিনটি শহরে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে।

১৮. ইন্দোনেশিয়ায় ২০১৬ সালের ৫ জুলাই পুলিশ স্টেশনসহ বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা হয়েছে।

১৯. প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র কাতারের উপর ১৩ শর্ত দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কাতারের সীমান্তের চার দেশ (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর ও

বাহরাইন), আর করিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এরপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত কাতারের সাথে ব্যাপক অস্ত্র ব্যবসা করবে এবং গ্যাস-তেলের ভাগ নেবে; আর কাতারে ইতিমধ্যে অবস্থান করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল বিমান ঘাঁটি। অথচ কাতারের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ যে দেশটি আইএস-কে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং কাতারে আফগান তালেবানদের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কাতারের বাদশাহ শেখ তামিম বিন্ হামাদ আল থানি পশ্চিমা গণমাধ্যমের কাছে স্বীকার করে বলেছেন, "হ্যাঁ, কাতারে তালেবানদের কার্যালয় স্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে ওই সুযোগ দেওয়া হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুরোধে। আমরা তালেবানদের দাওয়াত করে আনিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে তালেবানদের সাথে সংলাপ (dialogue) করতে এবং আমাদের বলেছে, আমরা এই সংলাপের আয়োজক দেশ (host country) হতে পারি কি না? আমরা ওই সংলাপের আয়োজক হয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে।" (বিস্তারিত দেখুন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন্ হামাদ আল থানির ২০১৭ সালে ২৯ অক্টোবর সিবিএস নিউজ করেসপন্ডেন্ট চার্লি রোজকে দেওয়া সাক্ষাৎকার)।

২০. ধর্ম নিয়ে রাজনীতি— ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী স্বৈরতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক দেশে মোটামুটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে।

২১. ধর্ম এবং/অথবা গোষ্ঠীগত মারামারি-হানাহানি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখন বিশ্বব্যাপী সাধারণ রূপ নিয়েছে।

এতক্ষণ যে কয়টি উদাহরণ দিলাম তা এ বিষয়ে শত শত উদাহরণের কয়েকটি মাত্র এবং হয়তো বা গুরুত্ব বিবেচনায় এসবের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ বাদ পড়েছে। আমার কাছে উদাহরণগুলোর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এসবের কার্যকারণ। কার্যকারণের নিরিখে দুটো বিষয় বলা প্রয়োজন:

প্রথম: আমরা যা দেখছি অর্থাৎ উদাহরণ— এগুলো ঘটনামাত্র, ঘটনার কারণ নয়। এগুলো মূল বিষয়ের বাহ্যিক বা দৃশ্যমান বিষয়াদি। বিষয়ের বাহ্যিক রূপ আর মর্মার্থ এক নয়।

দ্বিতীয়: তাহলে এসব দৃশ্যমান ঘটনার কার্যকারণটি কী? প্রশ্নটি সহজ-সরল, কিন্তু উত্তর— বেশ জটিল অথবা তর্কাতীত নয়।

উপরে যা বললাম তার বাহ্যিক-দৃশ্যমান কারণ হিসেবে যেসব বিষয় প্রায়শ উল্লেখ করা হয়, সেসবের মধ্যে আছে: অর্থনৈতিক বৈষম্য-উদ্ভূত বিষয়াদি,

সামাজিক বৈষম্য-উদ্ভূত বিষয়াদি, হতাশা-নিরাশা-উদ্ভূত বিষয়াদি, নৈতিক মূল্যবোধ-উদ্ভূত বিষয়াদি, ঘৃণা-উদ্ভূত বিষয়াদি, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা অথবা সাংস্কৃতিক বহিঃভুক্তকরণ অথবা বহিঃস্থকরণ (exclusion)-উদ্ভূত বিষয়াদি, পরিচয়-সংকট (identity crisis)-উদ্ভূত বিষয়াদি, শুধু ইহজাগতিক নয় পরজাগতিক বিষয় (after death)-উদ্ভূত বিষয়াদি। ওপরে যা বললাম এসব মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান ও বিকাশের মূল কারণ নয়। বাহ্যিক-দৃশ্যমান এসব কারণ মূল অথবা প্রধান 'কারণ' হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতাটা বেশ জনপ্রিয়। এ নিয়ে আমার বক্তব্য হলো এসব আসলে কোনো কারণ নয়— এসব হলো 'কারণ-উদ্ভূত', আর আসল "কারণ" (cause) আরো গভীরের বিষয়। অনেক গভীরের। আর গভীরের এ কারণ নির্ণয়ে প্রাচীন রোমের দার্শনিক সিসেরো-র (খ্রি. পূ. ১০৬-৪৩) একটি ছোট প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ: প্রশ্নটি হলো *"Cui bono"*(?) — লাভটা কার?

যেহেতু 'কারণ' (cause) এবং 'উপলক্ষ' ('কারণসদৃশ' বা কারণের প্রতিফল) নিয়ে কথা বলছি, সেহেতু মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের কারণ-পরিণাম সম্পর্ক নির্ধারণে আমার মূল বক্তব্য বিশ্লেষণসহ উপস্থাপনের আগে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলা যৌক্তিক বলে মনে করি। বিষয়টি দর্শনশাস্ত্রীয় (বিধায় কাঠখোট্টা মনে হতে পারে)।

বিষয়টি এ রকম— দুটি বস্তু বা দুটি ঘটনার মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কই হলো কার্যকারণ সম্পর্ক (causal relation); এ ক্ষেত্রে ঘটনাদ্বয়ের যেটি আগে সংঘটিত হয় সেটাই "কারণ" এবং যেটা তার ফল হিসেবে পরে ঘটে সেটাই "কার্য"; কার্য-কারণ সম্পর্ক দুটি ঘটনা বা দুটি বস্তুর সম্পর্ক হলেও কার্য ও কারণ হিসেবে সংঘটিত হয় না; আমাদের উপলব্ধির সুবিধার্থে আমরা ঘটনাদ্বয়কে অপরাপর ঘটনা থেকে বিযুক্তভাবে ভাবার চেষ্টা করি; কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা যে ঘটনাকে কার্য বলে অভিহিত করি ওই ঘটনা একই সময়ে অন্য ঘটনার কারণ এবং যাকে কারণ বলে অভিহিত করি সে অপর ঘটনার কার্য বা ফল হিসেবে সংঘটিত হয়। আসল কথা হলো: বস্তুর সমগ্র বিশ্বচরাচর কার্যকারণের সামগ্রিকতার-সামূহিকতার সূত্রে আবদ্ধ। একটি কার্যের সামগ্রিক কারণ তাই একটি নির্দিষ্ট কারণের চেয়ে বৃহত্তর, এবং সে যুক্তিতেই কোনো ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ তার সামগ্রিক কারণের ভিত্তিতেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অভিজ্ঞানের বিজ্ঞানটাই হলো এই যে— ঘটনায়-ঘটনায় অথবা বস্তুতে-বস্তুতে কার্যকারণের সম্পর্ক আমাদের মনের কল্পনার বিষয় নয়; কার্যকারণ সম্পর্ক কোনো বস্তু বা ঘটনা নয়, আর তাই এ সম্পর্ক দৃশ্যমান নয়।

ওপরে যা বললাম তা দর্শনশাস্ত্রীয়; বিধায় একটু সহজবোধ্য করা প্রয়োজন। বিষয়টি আসলে ততটা দুর্বোধ্য নয় যতটা মনে করা হয়। একটা সহজবোধ্য উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব। যেমন আমরা আগুন দেখতে পারি; আমরা ধোঁয়াও দেখতে পারি, কিন্তু আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক দেখতে পারি না; আগুন যে ধোঁয়ার কারণ আর ধোঁয়া যে আগুনের কার্য বা ফল এটা আমরা দেখতে পারি না। সুতরাং "সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তৃতি"— কার্যকারণসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র বিনির্মাণে দর্শনের জ্ঞানশাস্ত্রীয় যে বিষয়টি স্বীকার করে এগুতে হবে তা হলো: কার্যকারণ সম্পর্ক কোনো বস্তু নয়; কার্যকারণ সম্পর্ক মানুষের কল্পনাও নয়; বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা মানুষের কল্পনার বিষয় নয়; আর এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক।

আমরা খালি চোখে যা দেখি, তা যা দেখি তার বাহ্যিক রূপ বা অবস্থামাত্র (appearance বা form অর্থে)। সেটা হতে পারে বস্তুর, হতে পারে ঘটনার, হতে পারে প্রকৃতির গাছপালাসহ প্রাণিজগতের বাহ্যিক অবস্থা। এসবের কোনোটিই আমরা খালি চোখে অথবা ইন্দ্রিয়গতভাবে যা দেখি অথবা আমাদের সামনে এসব বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয় অথবা দৃশ্যমান হয়, তা কখনো বিষয়ের (অর্থাৎ বস্তুর, ঘটনার, প্রকৃতির) অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু (essence) নয় অথবা আধেয় (content) নয়। এখানেই কারণ-পরিণাম-এর (cause-effect বা causal) অথবা কারণ-পরিণাম বা কারণ-উপলক্ষ-এর প্রকৃত পার্থক্য। বিষয়টিকে সাধারণ্যে দর্শনশাস্ত্রীয় বলা হলেও বিষয়টি আসলে জ্ঞানশাস্ত্রীয় (epistemological)— যা যেকোনো শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এবং শতভাগ প্রযোজ্য।

ধরা যাক "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" প্রসঙ্গ। নির্দিষ্ট সমাজে মানুষ যে বিচারহীনতার শিকার হয় অর্থাৎ সুবিচার, ন্যায়বিচার, ন্যায্যবিচার থেকে বঞ্চিত হয় তার কারণ কি এই যে বিচারিক আইনকানুনে সমস্যা আছে (?) এবং/অথবা বিচারক বিচারকাজে পারদর্শী নন এবং/অথবা বাদী-বিবাদী (আসামি)-সাক্ষ্য প্রদানকারীরা মিথ্যা কথা বলেন অথবা সত্য গোপন করেন এবং/অথবা বিচারকদের হাতে ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষমতা স্বল্প এবং/অথবা বিচারক ন্যায়বিচার প্রদানে বিব্রত বোধ করেন এবং/অথবা বিচারক অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী হন না? আসলে এসবের কোনোটিই সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার প্রদানে আসল বাধা নয়। আইন তো যথেষ্ট পরিমাণেই এবং যথেষ্ট দ্রুত কাজ করে যখন গ্রামের গরিব-দুর্বল কৃষক সলিমুদ্দি-কলিমুদ্দি-যদু-মধু ১০ হাজার টাকার কৃষি ঋণ নিয়ে

পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে সার্টিফিকেট মামলায় মাজায় দড়ি বেঁধে দিনে-দুপুরে জনসমক্ষে থানায় নিয়ে জেলখানায় পাঠানো হয়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর পরে— এ এক বিরাট 'ন্যায়বিচার'!! কিন্তু যখন কেউ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে সদর্পে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে মুক্ত-স্বাধীনভাবে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়— তার (বা তাদের) বিচার হয় কি? সহজ-সরল উত্তর– হয় না। ওদের বিচার করতে পারবেন না। কারণ, প্রকৃত শোষক শ্রেণির আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ওরাই সম্মিলিতভাবে- এক দুর্ভেদ্য রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর সিস্টেম সৃষ্টি করেছে; যে সিস্টেমের এজেন্টরা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না অন্যদের সৃষ্ট সম্পদ লুট করে মাত্র। রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি ওই রেন্ট-সিকার সিস্টেমেরই অনুগত-অধীনস্থ (দাস) সত্তামাত্র। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শোষণ-উদ্ভূত রেন্ট সিকিং-এর ওই সিস্টেমটি কিন্তু দৃশ্যমান নয়, দৃশ্যমান শুধু মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব। সুতরাং কারণ-পরিণাম গুলিয়ে ফেললে সময়ক্ষেপণকারী বক্তাবাজির বাইরে বেরুনো সম্ভব হবে না। হবে না তা যৌক্তিক।

ওপরে যা বললাম, সারগতভাবে একই ধারণা প্রযোজ্য 'মৌলবাদ', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'মৌলবাদী জঙ্গিত্ব' থেকে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা পর্যন্ত— এক কথায় সংশ্লিষ্ট সবকিছুই। কিছু মানুষ সিদ্ধান্ত নিলো যে আমরা ধর্মের পতাকা সমুন্নত রাখব এবং প্রয়োজনে ধর্মযুদ্ধ করব, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে জিহাদ করব, মানুষ মারব— এসবের কোনোটিই সাম্প্রদায়িকতা অথবা মৌলবাদ অথবা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান ও বিস্তৃতির আসল কারণ নয়। এসবই আসল কারণের দৃশ্যমান বাহ্যিক রূপমাত্র। ওসবের কারণ অনেক গভীরে।

আগেই বলেছি, কার্যকারণ সম্পর্ক কোনো বস্তু নয়। কার্যকারণ সম্পর্ক আমাদের কল্পনাও নয়। কার্যকারণ সম্পর্ক বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত এবং সমগ্রকতাসংশ্লিষ্ট; ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা আমাদের কল্পনার বিষয় নয়। কারণ অনুসন্ধান করতে হলে একদিকে যেমন দাস যুগ থেকে সামন্ত যুগ হয়ে আধুনিক পুঁজিবাদ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বপ্রভুত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতির শেকড়ে যেতে হবে; আর অন্যদিকে স্থানিক থেকে বিশ্বযুদ্ধ হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসহ মহাকাশের সামরিকীকরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নির্মোহ ইতিহাস জানতে হবে (পাঠক ভাববেন না যে আমি রাজনৈতিক অর্থনীতির বাইরে অন্য কিছু বুঝি না)। আর শেকড়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির সেই ইতিহাস স্পষ্ট বলবে যে স্থানিক থেকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রসমূহের জোট আর রাষ্ট্রসমূহের জোট থেকে বিশ্বপ্রভুত্বের বাসনাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-

সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক যুদ্ধের প্রকৃত কারণ— **শোষণ; আরও শোষণ; এমনকি তেমন কোনো কিছু বৈষয়িক উৎপাদন না করেই 'বুদ্ধি' দিয়ে 'শক্তি' দিয়ে শোষণ যেটাই আসলে "রেন্ট সিকিং সিস্টেম"**।

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বসংশ্লিষ্ট কারণ-এর রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র উদ্ভাবনে সম্ভবত আরও পেছনে, আরও গভীরে যাওয়া দরকার। কারণ, একদিকে শোষণ-উদ্ভূত দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা; আর অন্যদিকে কিছু মানুষের হাতে প্রকৃতির বিধিবিরুদ্ধ অঢেল সম্পত্তি— এসবের কার্যকারণ নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের মন-মননকে "পৌরাণিক কাহিনির" অথবা একই কথা "ধর্মভিত্তিক কাহিনির" দাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আমরা, এমনকি যাদের আমরা আলোকিত মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিই, তাদের অনেকেই বলেন– "মানুষ গরিব কারণ সে গরিব", "মানুষ গরিব কারণ সে পরিশ্রমী নয়", "মানুষ গরিব কারণ সে মিতব্যয়ী নয়", "মানুষ গরিব কারণ সে বুদ্ধিমান নয়", "মানুষ গরিব কারণ সে অলস", "মানুষ গরিব কারণ সে উচ্ছৃঙ্খল", "মানুষ গরিব কারণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কম" ইত্যাদি— এসবই হলো মানুষকে হেয়প্রতিপন্ন করার হরেকরকম অনৈতিক ও সর্বৈব মিথ্যা "গরিবি তত্ত্ব"। এসবের সাথে "ধর্ম" এবং "ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্বের" সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

গরিবের গরিব হওয়া আর ধনীর ধনী হওয়ার পেছনে আমাদের এক আদি পাপের কাহিনি (!) শোনানো হয়। পৌরাণিক আদি পাপের কাহিনিটি এ রকম: "আদম আপেল খেয়েছিল বলেই মনুষ্য জাতির ওপর পাপের বোঝা নেমেছিল।" এর উদ্ভট ব্যাখ্যা করা হলো বলে ধরা হয়, যখন এটিকে পুরাকালের একটি কাহিনি হিসেবে বলা হয়। পৌরাণিক কাহিনিতে বলা হয়: বহুকাল পূর্বে দুই ধরনের মানুষ ছিল— এক শ্রেণিতে ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি মিতব্যয়ী ওপর মহলের বাছাই লোকেরা। আর অন্য শ্রেণিতে ছিল অলস ধূর্তের দল, যারা তাদের সর্বস্ব খুইয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। ধর্মতত্ত্বে আদি পাপের কাহিনি থেকে আমরা অবশ্যই জানতে পারি, কোন শাস্তির ফলে মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্নের সংস্থান করতে হয়; কিন্তু অর্থনৈতিক আদি পাপের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই যে, কিছু লোকের ক্ষেত্রে তা কোনোমতেই আবশ্যিক নয়। তা সে যাই হোক! মোদ্দা কথা, দেখা গেল যে প্রথম শ্রেণির লোকেরা ধন সঞ্চয় করল এবং দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদের শেষ পর্যন্ত নিজের গায়ের চামড়া ছাড়া আর কিছুই বিক্রি করবার মতো অবশিষ্ট থাকল না। আর এই আদি পাপের সময় থেকেই শুরু হলো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য, ব্যাপক পরিশ্রম সত্ত্বেও যাদের নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বিক্রি করবার রইল না। আর মুষ্টিমেয় লোকের ধন-

সম্পত্তি ক্রমাগত বেড়েই চলল; যদিও বহু আগে তারা কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে। সম্পত্তি সংরক্ষণের অজুহাতে এই ধরনের জোলো, ছেলেমানুষী ধর্মোপদেশ আমাদের প্রতিদিন শুনতে হচ্ছে।... বস্তুত আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতিগুলো আর যা-ই হোক, "নির্দোষ রাখালিয়া কাব্যধর্মী নয়"[১০]। আসলে মূল্যহীন আমার এসব কথাবার্তা শুনতে ভালো লাগলেও লাগতে পারে তবে এসব দিয়ে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব (সাধারণ সূত্র) বিনির্মাণ সম্ভব নয়— এ কথা যে-কেউ ভাবতেই পারেন। অসার ভাবনা আরেকটি অসার ভাবনার জন্ম দেয়: আর তা চলতে থাকলে অসার ভাবনার সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন চলতে থাকে। যুক্তিযুক্তভাবেই এখন আসা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বিনির্মাণের প্রসঙ্গে। আর তার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের কথাটি বলা দরকার; যেখানে রাসেল বলছেন, "ধর্মের সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটিগুলোর অন্যতম হলো নিজের ভাগ্য নিয়ে দরিদ্রদের সন্তুষ্ট রাখতে এটি ব্যবহার করা যায়, যা ধনীদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক"।

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব, সাম্প্রদায়িকতা, বিচারহীনতা, দুর্বৃত্তায়ন (অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক), কুশাসন, অপশাসন, দুঃশাসন, স্বৈরশাসন, ঘুষ, দুর্নীতি, দারিদ্র্য, বৈষম্য, অসমতা— এসবের কোনোটিই একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন (isolated), খণ্ডিত (fragmented) ও কামরাভুক্ত (compartmentalised) কোনো বিষয় নয়। এসবের প্রতিটি যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় (category বা ধারণা অর্থে) হিসেবে ধরি, তাহলে প্রতিটি একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। আমি এখানে রাজনৈতিক অর্থনীতির যে তত্ত্বকাঠামো বিনির্মাণের প্রয়াস নিয়েছি, সেখানে মূল কথা হলো এসব প্রত্যয়ের যেকোনো একটি অন্যটির দৃশ্যত কারণ হিসেবে মনে হলেও শেষ বিচারে প্রকৃত অর্থে তা কারণ নয়— কারণসদৃশ (looks like cause)। যেমন প্রায়ই মনে করা হয় যে "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"ই "ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের" উত্থান ও বিস্তৃতির প্রধান কারণ। আসলে এটা ঠিক নয়, উল্টোটা তো নয়ই। ইতিপূর্বে আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলেছি সে নিরিখে এসব প্রত্যয় আসলে ধোঁয়া– অর্থাৎ কারণ নয়, কারণের ফল, যেখানে আগুন হলো কারণ। তাহলে এ ক্ষেত্রে

[১০] কার্ল মার্কস ১৮৬৬ সাল নাগাদ এসব লিখেছেন, যার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হয়েছে ১৯৮৮ সালে। দেখুন, পুঁজি, খণ্ড ১, প্রথম পর্ব, পৃ. ২৬১-২৬২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন। 'পুঁজি' গ্রন্থটি মার্কস লিখেছিলেন জার্মান ভাষায়। গ্রন্থটি প্রথম অনূদিত হয় রুশ ভাষায়, পরবর্তী সময়ে ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায়। এখানে উল্লেখ জরুরি যে "অনুবাদের কারণে হারিয়ে যাওয়া" বা "lost in translation" বলে একটা কথা আছে। তবে গ্রন্থকার যা বলতে চেয়েছেন অথবা যা বোঝাতে চেয়েছেন অনুবাদে তা ঠিকঠাক থাকলেই চলে।

যৌক্তিক প্রশ্ন—"দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"র কারণ কী? শেষ বিচারে ওই কারণটিই হবে অংশত ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্বসহ উল্লিখিত সব প্রত্যয়সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উদ্ভব, বিকাশ, বিস্তৃতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রধান নির্ণায়ক—প্রধান কারণ। সম্ভবত এ কারণেই নোয়াম চমস্কি বলেন, "বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ হ্রাস করার অন্যতম পথ হলো নিজেদের (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) এ থেকে নিবৃত রাখা"। আর হাওয়ার্ড জিন বলেন, "সুইসাইড সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হবে যখন আমরা (মার্কিনরা) অন্য দেশে হস্তক্ষেপ বন্ধ করব"।

আমার মতে, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্বের উত্থান ও বিকাশের প্রধান নির্ণায়ক বা নিয়ামক কারণটি হলো 'শোষণ' (exploitation)— শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী মুক্তবাজার কাঠামো। আর এই শোষণের রূপটি চিরায়ত মার্কসীয় রূপের মতো নয়, যেখানে 'শিল্পপুঁজি' প্রধান। এ রূপটি ভিন্নতর— 'রেন্ট সিকিং'-উদ্ভূত। সেই সাথে এই শোষণপ্রক্রিয়া প্রধানত দেশজ হলেও তা আর দেশজ সীমানায় আবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভুত্ব (মার্কিন) একদিকে যেমন এই শোষণ (অর্থাৎ কারণ); আর অন্যদিকে এই শোষণ-উদ্ভূত পরিণাম বা প্রতিফলে (অর্থাৎ কার্য) শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, **শেষ বিচারে শোষণ অথবা অন্যের সৃষ্ট সম্পদকে আত্মসাৎ করা এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা এবং এই শোষণের সম্প্রসারণই সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব উদ্ভব ও বিকাশ-বিস্তৃতির শেকড়ের কারণ।**

সম্পূর্ণ এই প্রক্রিয়াটি সমাজে যেভাবে কাজ করে তা হলো এ রকম:

১. পুঁজিপতি রেন্ট-সিকাররা অর্থপুঁজি-বিত্তপুঁজি-ক্ষমতাপুঁজি-প্রভাবপুঁজি বিনিয়োগ করে;

২. এ বিনিয়োগের উদ্দেশ্য বিনিয়োজিত পুঁজির ফল (উদ্বৃত্ত) আত্মসাৎ করে (অর্থাৎ শোষণ করে) সংশ্লিষ্ট সব ধরনের পুঁজি সম্প্রসারিত করা এবং যেকোনো মূল্যে শোষণ-ব্যবস্থাকে স্ব-প্রসার্যমাণ রাখা। এখানে পুঁজির স্ব-প্রসারণ বা স্ব-সম্প্রসারণ ঘটে। যার ফলে পুঁজির মালিক আগের চেয়ে শক্তিধর হয়ে ওঠে; এবং

৩. এসব পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় সমাজের উপরিকাঠামোর সব মতাদর্শ থেকে শুরু করে মতাদর্শগত সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে রাষ্ট্রের আইনসভা, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, গণমাধ্যম, ধর্মীয় মতাদর্শ

> ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব মতাদর্শগত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ প্রক্রিয়া কোনো পর্যায়ে থেমে থাকে না, অব্যাহতভাবে চলে। এ প্রক্রিয়া নানা পর্যায় অতিক্রমকারী এক নিরন্তর বিচলন বা সঞ্চালন (circulation in perpetuity) প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া থেমে গেলে রেন্ট-সিকারদের শোষণ-উদ্ভূত প্রতিফল অথবা বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, জঙ্গিত্ব– এসবই থেমে যাবে, নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে; আর এ প্রক্রিয়ার গতি হ্রাস পেলে প্রতিফল বা পরিণামের গতিও হ্রাস পাবে এবং তা ধীরে ধীরে নির্জীব-নিস্তেজ হয়ে পড়বে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা কার্ল মার্কসের "পুঁজির সাধারণ সূত্রস্থ পুঁজির বর্তনী ও আবর্তন-এর" মতো হলেও মার্কস-পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদ বিকাশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে যুক্ত হবে রেন্ট-সিকার (যা নিয়ে মার্কস তেমন বলেননি)।

পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সব পদের পাগল পাওয়া যেতে পারে একটি পদ ছাড়া। এমন পদের পাগল একটিও পাওয়া যাবে না যিনি নিয়মিতভাবে (as a general rule) পুঁজি হিসেবে যত টাকা বিনিয়োগ করেন (ধরুন ১ কোটি টাকা) বিনিয়োগ ফল হিসেবে ঠিক তত টাকাই (অর্থাৎ ওই ১ কোটি টাকা) ফেরত পেতে চান। সাধারণ যুক্তিই বলে তিনি ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগ ফল হিসেবে ১ কোটি টাকার বেশি (অবশ্যই সমানও নয় কমও নয়) পেতে চাইবেন। এই বেশিটা তিনি কীভাবে পাবেন, কোথায় পাবেন, কী করলে পাবেন? এটা পেতে হলে পুঁজি হিসেবে তিনি যে অর্থ ব্যয় করলেন ওই অর্থ দিয়ে তাকে এমন কিছু পণ্য কিনতে হবে যে পণ্য নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ধরুন শিল্পপুঁজির মালিক। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে সঠিক উদাহরণ হলো "সমরাস্ত্র পুঁজি" এবং 'রেন্ট সিকিং' পুঁজি।

পুঁজির মালিক প্রথমে অর্থ নিয়ে ক্রেতা হিসেবে বাজারে আসবেন; কিনবেন শ্রমশক্তি (সাধারণভাবে বলা হয় শ্রমিক) এবং উৎপাদনী যন্ত্রপাতিসহ উৎপাদনের কাঁচামাল। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের এমন কোনো নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই যে তাদের যা মূল্য, তারা নিজেরা তার চেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। তারা যা পারে তা হলো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কাঁচামালের রূপান্তর সাধন; যেখানে রূপ পরিবর্তন হয় কিন্তু মূল্য পরিবর্তন হয় না (বা বাড়ে-

কমে না)। এ ক্ষেত্রে একমাত্র পণ্য যা কিনলে মূল্য বাড়ে তা হলো শ্রমশক্তি, যে নিজের মূল্যের চেয়ে (অর্থাৎ মজুরির চেয়ে) বেশি মূল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু এ অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় উৎপাদনে; কিন্তু তা উসুল (realize) হয় বাজারে ঠিক তখন, যখন পুঁজিপতি তার উৎপাদিত পণ্য (যার মূল্য লুক্কায়িত আছে শোষণ-নিমিত্ত উদ্বৃত্ত মূল্যে) বাজারে আনবেন বিক্রেতা হিসেবে। এরপর আবারও তিনি বাজারে আসবেন ক্রেতা হিসেবে এবং ক্রেতা→বিক্রেতা→ক্রেতা →বিক্রেতা... এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। অতএব প্রথমে তিনি ক্রেতা, পরে বিক্রেতা, তারপরে আবারও ক্রেতা। অর্থাৎ প্রথমে তিনি ক্রেতা হিসেবে তার অর্থপুঁজিকে উৎপাদনশীল পুঁজিতে রূপান্তরিত করবেন (এটাকে বলা হয় পুঁজির চক্রাবর্তনের প্রথম পর্যায়); তারপরে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের যে মূল্য উৎপন্ন পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় শ্রমিকেরা নিজ শ্রমে তার রূপান্তর ঘটায় এবং নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, যার মধ্যে থাকে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদিত মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজির চক্রাবর্তনের দ্বিতীয় এ পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ের উৎপাদনশীল পুঁজি পণ্যপুঁজিতে রূপান্তরিত হবে। এরপরে পুঁজির চক্রাবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ে পুঁজিপতি ক্রেতা হিসেবে নয়, বিক্রেতা হিসেবে তার পণ্য বাজারে বিক্রি করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়েছে, তা উসুল (realize) করবেন। এ ক্ষেত্রে চক্রাবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পণ্যপুঁজি আবারও প্রথম পর্যায়ের অর্থপুঁজিতে রূপান্তরিত হবে। তবে শেষোক্ত এই অর্থের মধ্যে থাকবে উদ্বৃত্ত মূল্য, যা পুঁজিপতি আত্মসাৎ করবেন— আর এটাই শোষণ— যে শোষণপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখাটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। নিরবচ্ছিন্ন এই শোষণপ্রক্রিয়া সমাজের নিচতলায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধিসহ বিচ্ছিন্নতা বাড়ায়। আর উপরতলায় বিত্ত-বৈভব-সম্পদ-সম্পত্তি বাড়ায়, জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে সমাজের নিচতলার মানুষের হিস্যা কমায়; আর উপরতলার হিস্যা দ্রুতগতিতে বাড়ায়, আর একই সাথে এই প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয় পুঁজিবাদের সংকটের সব রূপ (যেসব রূপ বাণিজ্যচক্র অর্থাৎ business cycle-সহ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়)। আর একক পুঁজিবাদী বৈশ্বিক কাঠামোতে (unitarian global capitalism) একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রে (বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) বৈশ্বিক পুঁজির পুঞ্জীভবন ও ঘনীভবন (accumulation and concentration) ঘটবে, ঠিক একই সাথে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

এতক্ষণ যা বললাম, সেখানে দেখানো হয়েছে যে পুঁজির মালিক প্রথমে অর্থপুঁজি নিয়ে বাজারে আসেন— ক্রেতা হিসেবে। কিন্তু এমনটি যদি হয় যে পুঁজির মালিক

বাজারে আসছেন ক্রেতা হিসেবে নন 'দখলদার' হিসেবে; তিনি জবরদখল করতে চান জমি, জলা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ আকাশ-মহাকাশ। এ কাজটিই করছে বৈশ্বিক রেন্ট-সিকাররা। অর্থাৎ পুঁজির প্রচলিত বর্তন-আবর্তনে এ প্রক্রিয়ায় বৈশ্বিক পুঁজির পুঞ্জীভবন ও ঘনীভবন-এর রূপটি এখন এমন যখন সমগ্র প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে এবং করবে বিভিন্ন ধরনের রেন্ট-সিকাররা, যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না অন্যের সৃষ্ট সম্পদ লুটতরাজ করে। দখলবাজ ওই পুঁজির ক্ষেত্রে পুঁজির বর্তন-আবর্তনে কী ঘটল সেটা তাদের জন্য মুখ্য বিষয় নয়। "দখলবাজ" পুঁজির ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হলো লুণ্ঠন— আরো লুণ্ঠন, যার ফলে পৃথিবীর চার মৌলকৌশলিক সম্পদের (জমি, জলা, জ্বালানি-শক্তি-খনিজ, আকাশ-মহাকাশ) ওপর একক মালিকানা ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে পদ্ধতি হতে পারে অনেক ধরনের: যুদ্ধ, ধর্ম, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মারপ্যাঁচ, মুদ্রার বিনিময় হারজনিত কারসাজি, দেশে দেশে সরকারের ওলট-পালট ... সব কিছুই।

সুতরাং ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধকরণের লক্ষ্যে এতক্ষণ যা বললাম, তার প্রাথমিক ভিত্তি-কথা হলো— পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় পুঁজির সাধারণ চক্রাবর্তন সূত্রটি হবে নিম্নরূপ:

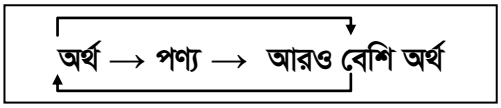

এই-ই যদি পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার সারসূত্র হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে শেষ বিচারে শোষণব্যবস্থা কীভাবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উদ্ভব-উত্থান, বিকাশ ও বিস্তৃতির মূল কারণ হতে পারে? সেক্ষেত্রে উল্লিখিত রাজনৈতিক অর্থনীতির রূপান্তরিত সূত্রটিই বা কেমন হতে পারে। এ সূত্রটির মর্মকথা ওপরে উল্লেখ করেছি?

তবে বিষয়টির গুরুত্বের কারণে এ সম্পর্কে আমার প্রস্তাবিত সূত্র উত্থাপনের আগে আরও কিছু যুক্তির কথা বলা প্রয়োজন। এমন অবস্থা কি হতে পারে যখন আর্থসামাজিক ব্যবস্থাটায় শোষণভিত্তিক অথচ সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার বিদ্যমান? কেউ হয়তো বলবেন, হতে পারে (এটা সম্ভব) এবং উদাহরণ দেবেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট-শাসিত দেশ থেকে শুরু করে আধুনিক যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এই ধারণা বড় মাপের ভ্রান্তি। তা না হলে এখন জোসেফ স্টিগলিজকে কেন "The Price of Inequality", পল ক্রুগম্যানকে কেন "End this Depression Now", থমাস পিকেটিকে "Capital in the

Twenty First Century" এবং নোয়াম চমস্কিকে "The Failed State" গ্রন্থ রচনা করে পুঁজিবাদের রূপান্তরের কথা বলতে হয় (অথচ এদের কেউই সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা নন)? উন্নত পুঁজিবাদী ওইসব দেশে বৃহত্তর নাগরিকসমাজ ব্যক্তিপর্যায়েও অনেক ধরনের ন্যায্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় থেকে বঞ্চিত; আর বৃহত্তর পর্যায়ে ওইসব দেশের রাষ্ট্র-সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভুর ইরাক দখল থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অপকর্মের সাথে হয় সরাসরি জড়িত এবং/ অথবা জাতিসংঘসহ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ (!) সংস্থায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে দুর্বলদের বিরুদ্ধে সবল অবস্থান গ্রহণ করে। তাহলে শোষণভিত্তিক সমাজে, তা একক কোনো দেশভিত্তিক হোক অথবা সমষ্টিবদ্ধ জোট হোক— বিভিন্ন ধরনের বিচারহীনতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রূপের সম্প্রদায়গত-গোষ্ঠীগত-ধর্মপরিচয়গত দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো স্বাভাবিক বিষয়ই হওয়ার কথা, হওয়ার কথা সাধারণসূত্রীয় বিষয়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে 'ব্যক্তি'— সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ— রবিনসন ক্রুশোর মতো কোনো দ্বীপের একক বাসিন্দা নয়।

আমি প্রস্তাবিত সূত্র উথাপনের আগে আরও একটু স্পষ্ট করে বলতে চাই যে "শোষণ→অধিকার" সমীকরণে 'শোষণ' হলো কারণ (cause); আর 'অধিকার' হলো পরিণাম (effect)। শোষণ-উদ্ভূত যে পরিণামে থাকবে 'সবলের অধিকার' আর 'দুর্বলের অধিকারহীনতা' (এটাকে বলা হয় "থুকোডাইডেস প্রিন্সিপ্যাল")। আবার সমীকরণটা যখন "অধিকার→ শোষণ", তখন অধিকার কারণ হিসেবে দৃশ্যমান; আর 'শোষণ' পরিণাম হিসেবে দৃশ্যমান। এসবই হলো কারণ-পরিণামের বাহ্যিকতা—দৃশ্যমান রূপ। আসলে কিন্তু শেষ বিচারে কারণ হিসেবে দৃশ্যমান 'অধিকারহীনতার' কারণ হলো 'শোষণ'। আর তাই প্রকৃত সূত্র না বুঝে "শোষণ প্রসঙ্গকে নিয়ামক না মেনে" কেউ যদি বলেন দেশ থেকে বিচারহীনতা-সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মীয় মৌলবাদ-মৌলবাদী জঙ্গিত্ব-দুর্নীতি-অপশাসন— এসব দূর করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে— সেক্ষেত্রে আমি বলব, তিনি আসলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির কিছুই বোঝেননি অথবা বুঝতে চান না অথবা বুঝলে অসুবিধা হবে অথবা এসবের একাধিক (সেক্ষেত্রে তার বোধের এবং/অথবা সৎ সাহসের দীনতায় দুঃখ করা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই; তাকে হেদায়েত করা আমার কাজ নয়)। শোষণব্যবস্থা প্রসঙ্গ এড়িয়ে এরকমটিই বলে "সুশীলসমাজ শ্রেণি" ও "বুদ্ধিজীবী শ্রেণি"-র স্তাবক-চাটুকার-দালাল গোষ্ঠী, যারা আমার বিচারে সাম্রাজ্যবাদী মহাপ্রভুদের মতাদর্শিক

আজ্ঞাবাহী। যে কারণে তারা শেকড়ের বিষয় এড়িয়ে গিয়ে বিচারহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বায়বীয় বিষয় (মূল কারণ এড়িয়ে এসব নিয়ে কথাবার্তা নিঃসন্দেহে বায়বীয়) নিয়ে নাড়াচাড়া করে; আর এসবে মদদ দিয়ে জনগণের চেতনায়ন প্রক্রিয়াকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করতে যথেচ্ছ ব্যবহার করে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে সবধরনের প্রচার-সম্প্রচার যন্ত্র। এটাই আবার গণমাধ্যম আর প্রচার-সম্প্রচারমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতির মুখ্য রূপ।[১১]

এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শোষণ যখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নেয়, তখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশে অধিকারহীনতা ও বিচারহীনতাও একক দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নেয়; অর্থাৎ তা আন্তর্জাতিক-বৈশ্বিক শোষণব্যবস্থার অধীনস্থ সত্তায় রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্বপ্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্বব্যাপী "ন্যায় বিচার-ন্যায্য বিচার-সুবিচার-সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিচারমুক্ত ও স্বাধীন সত্তায় অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার"-বিরোধী অবস্থান। এ সবকিছু যা ডিক চেনি-রোনাল্ড র‍্যামসফেল্ড-কলিন পাওয়েল প্রণীত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রান্ড স্ট্রাটেজি-উদ্ভূত। আর এখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ কৌশলই অধিকতর আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন (নিকট ভবিষ্যতেও এর পরিবর্তন হবে না)। আন্তর্জাতিক-বৈশ্বিক শোষণব্যবস্থার হোতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ কৌশল আপাতত মুসলিম-অধ্যুষিত তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে দৃশ্যমান হলেও এ কথা মনে করার কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না যে ভবিষ্যতে অবস্থাটা ভৌগোলিকভাবে এসব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ

[১১] গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তু এ রকম: সব ধরনের গণমাধ্যম শেষ পর্যন্ত মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে যে মালিকেরা প্রধানত রেন্ট-সিকার (যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না, অন্যদের সম্পদ জোরদখল করেন); এরাই আবার রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতির নিয়ন্ত্রক; আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমসমূহের ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য তবে তাদের অবস্থান উচ্চতর স্তরে, যেখানে দেশজ গণমাধ্যমসমূহ স্তর বিন্যাসের নিরিখে প্রধানত ওদের অধীনস্থ সত্তামাত্র। গণমাধ্যমে সেন্সরশিপ-এর অর্থ মূলত স্ব-সেন্সরশিপ; গণমাধ্যমে ফিচার প্রবন্ধ অথবা 'চুপ থাকা' (maintaining silence) হলো "মৌন যৌথ ক্রিয়া" (tacit collective action), গণমাধ্যমের মূল কাজ হলো মালিকানার প্রণোদনা, বাধা (constraints), সংগঠন, বাজার ও রাজনৈতিক সমতার নিরিখে "bias mobilise" করা, যা শেষ পর্যন্ত নিয়ামক শ্রেণির অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে (এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, এডওয়ার্ড এস হেরমান ও নোয়াম চমস্কি, ১৯৯৪, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, পৃ. xii, xv, 1-2, 13-15, 35, 303, 306)।

থাকবে। এখানে আসলে 'ধর্ম' কোনো **কারণগত** বিষয় নয়। মূল বিষয় **শোষণ, বিশ্বপ্রভুদের বৈশ্বিক শোষণ** আমরা যার অবিচ্ছেদ্য-অধীনস্থ অংশমাত্র। মূল বিষয় বিশ্বপ্রভুর সাম্রাজ্য বিস্তার ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এবং ওই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে ৯/১১ কে "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" (War on Terrorism) নামে বিশ্বব্যাপী ভয়ভীতি সৃষ্টি ও নির্যাতন-নিবর্তনের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে-হচ্ছে-হবে। কিন্তু শেষ বিচারে মূল শেকড়ের বিষয় থেকে যাবে একটাই, তা হলো "শোষণ, আরও শোষণ"— এ শোষণের রূপ আর পদ্ধতি যে ধরনেরই হোক না কেন।

"শোষণ আরও শোষণ"-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরিকল্পিতভাবে এগুতে হবে। এ পরিকল্পনার অন্যতম কার্যকর উপাদান হলো 'ধর্ম'। সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ও বিকাশের সাথে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের সম্পর্কের কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। সাম্রাজ্যবাদ— মার্কিন এবং ব্রিটিশ— তার স্বার্থোদ্ধারে মুসলিম বিশ্বে তাদের বশংবৎ সৃষ্টিতে এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক শক্তির অস্তিত্ব দমনে (যাতে "শোষণ আরও শোষণ" সমীকরণ বহাল থাকে) ইসলাম ধর্মকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। এসবের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ (যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিক কালানুক্রম উল্লেখ করা হয়েছে একাদশ অধ্যায়ে):[১২]

১. ১৯২০ সালের দিকে মিসরে স্বৈরতন্ত্র রক্ষায় এবং অসাম্প্রদায়িক-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ওয়াফদ্ পার্টির উত্থান রুখতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি "মুসলিম ব্রাদারহুড পার্টি" সৃষ্টি করেছিল। শুধু তা-ই নয় মিসরের জাতীয়তাবাদী নেতা প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসেরের মৃত্যুর পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুসলিম ব্রাদারহুডের যেসব সদস্য পালিয়ে সৌদি আরবে অবস্থান নিয়েছিল তাদের মিসরে ফিরিয়ে আনা হয়। আর দীর্ঘমেয়াদি এ

[১২] প্রভাত পাটনায়েক, ২০০৩, "Of Finance and Facism", in K. N. Pannikkar and Sukumar Muralidharan (eds). *Communism, Civil Society and the State: Reflections on a Decade of Turbulence.* New Delhi: SAHMAT, পৃ. ৮১-৮২; প্রভাত পাটনায়েক, ২০০৩, "Imperialism and Terrorism", in The Retreat to Unfreedom: Essays in Emerging World Order. New Delhi: The Tulika Books, পৃ. ১০৫-১১০; আইযাজ আহমাদ, (জানুয়ারি ২০০৮), "Islam, Islamisms and the West", *Socialist Register,* Vol. 44, পৃ. ১-৩৭; আমিন সাইকাল, ২০০৩, "Islam and the West: Conflict or Cooperation? Basingstoke: Palgrave Macmillian, পৃ. ৬২-৬৮; সামির আমিন, (ডিসেম্বর ২০০৭), "Political Islam in the Service of Imperialism", *Analytical Monthly Review,* Vol. 5, No. 9, পৃ. ৬-৮।

পরিকল্পনার ফলাফল হলো অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল মিসরে অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সরকারের পতন এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্ষমতায় আরোহণ।

২. ইরানে প্রেসিডেন্ট মোসাদ্দেক-এর সাথে তুদে পার্টি (কম্যুনিস্ট পার্টি) জোট যখন তেলসম্পদ জাতীয়করণ করল, তখন সরাসরি সিআইএ-পুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ওই সরকার উৎখাত করে সাম্রাজ্যবাদ নীতি-পুষ্ট রেজা শাহ পাহলভিকে রাজা হিসেবে ক্ষমতাসীন করা হলো (রেজা শাহ পাহলভিকে বলা হতো "সব রাজার রাজা")।

৩. ইন্দোনেশিয়া ও সুদানে কম্যুনিস্ট নিধনে সিআইএ সরাসরি জড়িত ছিল।

৪. ১৯৫৫ সালে বান্দুং কনফারেন্সে (Bandung Conference) প্রতিষ্ঠিত "ইউনাইটেড ফ্রন্ট অব এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকান স্টেটস" কে পরে বিলুপ্ত করে মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি উদ্বুদ্ধ করতে সৃষ্টি করা হয় "ইসলামিক কনফারেন্স"। এ উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৫. প্যালেস্টাইনে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল করতে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসরায়েল (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে যোগসাজশে) হামাসকে সমর্থন দেয়।

৬. আফগানিস্তানে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সরাসরি তত্ত্বাবধানে তালেবানসহ অন্যান্য ইসলামি জঙ্গি সংগঠন সৃষ্টি করে।

এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব, দুর্নীতি, দুঃশাসন, স্বৈরাচার ইত্যাদির কারণ-পরিণামসূত্রে শোষণই যে এসবের মুখ্য ও নিয়ামক কারণ সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। আর এ শোষণপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে যুক্ত হয়েছে রেন্ট সিকিং-এর একটি পদ্ধতি, যা হয়তো আগেও ছিল তবে এখনকার মতো আগ্রাসী ছিল না, ছিল না এখনকার মতো 'বৈজ্ঞানিক' ধোপদুরস্ত (যেসবের বাহ্যিকতা নিয়ে উইকিলিকস্, পানামা পেপারস্, প্যারাডাইস পেপারস্সহ ইতিমধ্যে বেশ কিছু "মাথা ঘোরানো" তথ্য প্রকাশ পেয়েছে)।

আমার ধারণা, বিগত ৪০-৫০ বছরে বিশ্ব যেভাবে পাল্টেছে, তাতে করে এখন আর পুঁজির মালিক ও রেন্ট-সিকারদের ভিন্ন সত্তা ভাবার কোনো কারণ নেই। হয় পুঁজির মালিকেরাই এখন একই সাথে পুঁজির মালিক এবং রেন্ট-সিকার অথবা বিশুদ্ধ পুঁজির মালিকেরা এখন রেন্ট-সিকারদের অধীনস্থ সত্তামাত্র। এসব রেন্ট-সিকারের মধ্যে আছে সামরিক সাজসরঞ্জাম থেকে শুরু করে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং তাদের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন স্বল্প-দৃশ্যমান এজেন্ট, বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনকারী এজেন্ট গোষ্ঠী, "বিজ্ঞান দখলকারী" ব্যক্তি-গোষ্ঠী, প্রযুক্তি দখলকারী গোষ্ঠী, গণমাধ্যম দখলকারী ব্যক্তি-গোষ্ঠী, বিভিন্ন দেশে বৃহদাকার অবকাঠামো বিনির্মাণ থেকে শুরু করে বড় বড় কন্ট্রাক্ট-এর দালাল (তদবিরবাজ) গোষ্ঠী, মৌলকৌশলিক সম্পদ-সম্পত্তির মালিক গোষ্ঠী, একীভূত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধারক গোষ্ঠী। আর এসবে নেতৃত্ব দিচ্ছে হোতা সাম্রাজ্যবাদ— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ওপরের ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র বিনির্মাণে বিশ্লেষণসহ যা কিছু বললাম তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আরো একটি বিষয় বলা প্রয়োজন; আর তা হলো সাম্রাজ্যবাদ সিস্টেমের লক্ষ্য– রাজতন্ত্রীয় মধ্যপ্রাচ্য, ইসলামভিত্তিক জঙ্গিত্বের সাথে একক কোনো দেশের যেমন মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ— বাংলাদেশ-এর যোগসূত্র। বিষয়টি সহজবোধ্যভাবে ছক ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট যোগসূত্রের বিষয়টি এ রকম:

ছক ২: সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের লক্ষ্য, রাজতান্ত্রিক মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব ও বাংলাদেশ: যোগসূত্রসমূহ

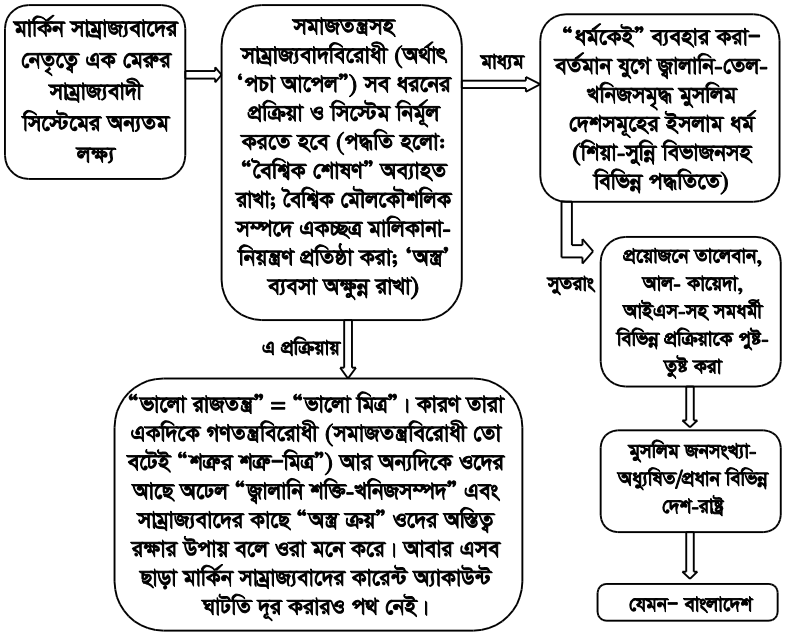

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে একমেরুর সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের অন্যতম লক্ষ্য হলো সমাজতন্ত্রসহ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সব ধরনের প্রক্রিয়া ও সিস্টেম (যারা সবাই "পচা আপেল" তত্ত্বে-র অন্তর্স্থিত 'পচা আপেল') নির্মূল করতে হবে। কারণ একক সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের "বৈশ্বিক শোষণ" প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে; বৈশ্বিক (চার) মৌলকৌশলিক সম্পদে একক মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব আধিপত্য নিশ্চিত করতে হবে, এবং "অস্ত্র ব্যবসা" অক্ষুন্ন রাখতে হবে। আর এ প্রক্রিয়ায় 'ভালো রাজতন্ত্র' অথবা 'ভালো মিত্র'কে সাথে রাখতে হবে; কারণ ওদের আছে অঢেল জ্বালানি-খনিজ-শক্তিসম্পদ, ওরা 'দুর্বল', এবং "সমরাস্ত্র ক্রয়' ওদের নিজ অস্তিত্বেরও অন্যতম শর্ত বা উপায়। একই সাথে এসব ছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের (অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদেরও) কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি দূর করার ভিন্ন কোনো পথ নেই। বিষয়টি নিরেট অর্থনৈতিক। আর অর্থনৈতিক এ সমীকরণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (সময় ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায়) 'ধর্ম' অথবা (বর্তমান যুগে) ইসলাম ধর্মকেই ব্যবহার করতে হবে। কারণ পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ মানুষের এ ধর্মের অনুসারীদের (যাদের তুলনীয় সংখ্যা ক্রমবর্ধমান)

হাতে আছে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ "জ্বালানি-তেল-শক্তি-খনিজসম্পদ" এবং একই সাথে তাদের আছে "ভৌগলিক-কৌশলিক অবস্থান"। সুতরাং এক মেরুর সাম্রাজ্যবাদ সিস্টেমেরই প্রয়োজন আল-কায়েদা, আইএসসহ সমধর্মী-সমরূপী বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে তুষ্ট-পুষ্ট করা; প্রয়োজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী প্রধান দেশসমূহে হস্তক্ষেপ, যার মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ (অন্তত বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক ভৌগলিকসহ চীন-ভারত সমীকরণে)।

এতক্ষণ যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করলাম, সেসবের ভিত্তিতে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সূত্রায়নে আমার আপাতত শেষ বক্তব্যটি নিম্নরূপ:

> **বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'রেন্ট-সিকার' মুখ্য বিষয় নয় (অর্থাৎ সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ চলক নয়); পুঁজিবাদ যখন থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অধীনে একক বৈশ্বিক রূপ নিয়েছে (unitarian capitalism headed now by US imperialism), তখন থেকে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদের "অর্থ→পণ্য→আরো বেশি অর্থ" চিরায়ত এ সমীকরণটি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে, যেখানে রেন্ট-সিকাররা সম্পদ-পিরামিড এবং সম্পদ সৃষ্টির রাজনৈতিক পিরামিডের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এই রেন্ট-সিকাররাই বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করছে বৈশ্বিক সম্পদ, যেসব পথ-পদ্ধতি-মাধ্যমের অন্যতম হলো ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব। তাহলে শেষ বিচারে "সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"**-সংশ্লিষ্ট কার্যকারণের রাজনৈতিক অর্থনীতির চক্রাবর্তনের সূত্রটি হবে নিম্নরূপ, যা ছক ৩ ও ৪-এ দেখানো হয়েছে।

ছক ৩: সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বসংশ্লিষ্ট কার্যকারণের রাজনৈতিক অর্থনীতির চক্রাবর্তন সূত্র

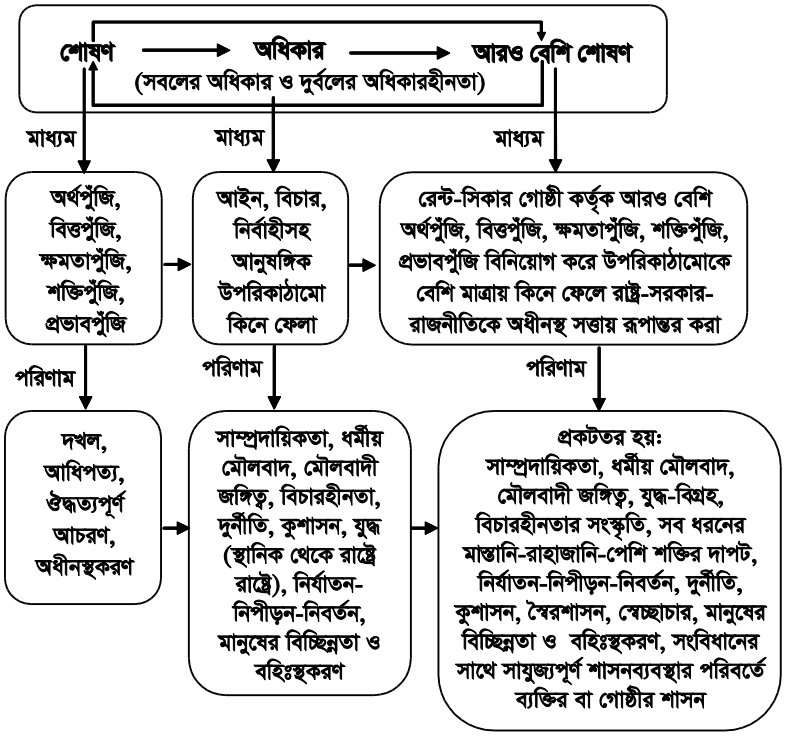

ছক ৪: একক পুঁজিবাদী বৈশ্বিক কাঠামোতে হোতা সাম্রাজ্যবাদ কেন অন্যদের অধীনস্থ করবে? অধীনস্থ বিন্যাসের পিরামিড

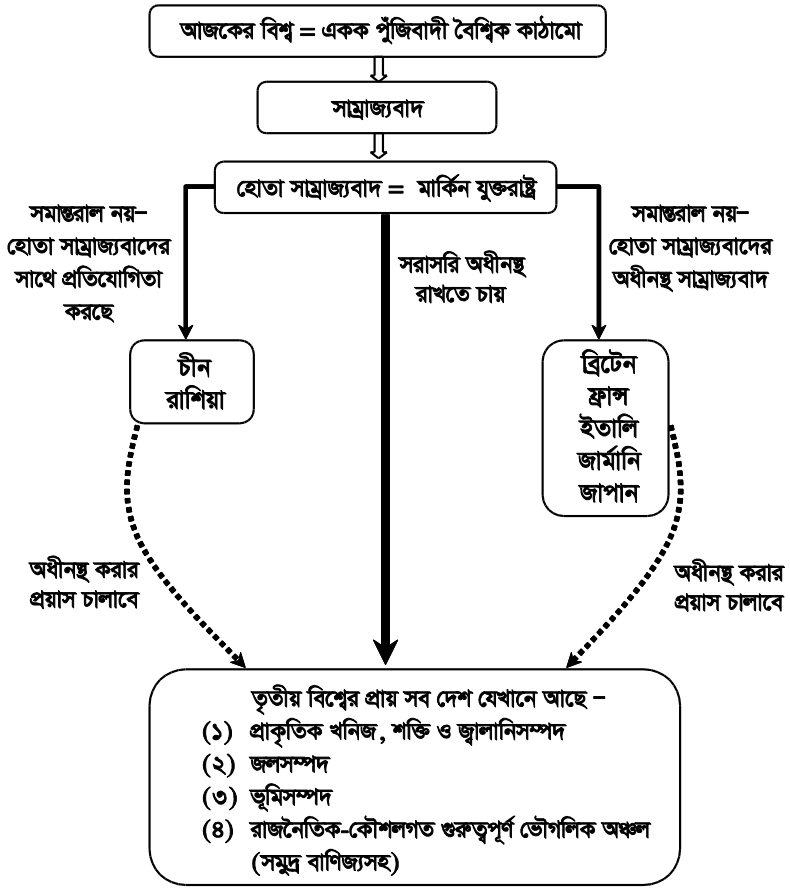

৫৮। বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির

অধ্যায় ৪

মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: সাম্রাজ্যবাদ-সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ

"সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের ফলসমূহ মুনাফার জন্য ভালো, জনগণের জন্য নয়।"
নোয়াম চমস্কি, ১৯২৮-

"মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ"— সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে তুলনামূলক নতুন ধারণা। তবে ইদানীং এ নিয়ে অনেক লেখালেখি ও তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে— যার অধিকাংশই আমার মতে বিষয়ের বাহ্যিক রূপমাত্র (appearance of things) সত্যিকারের মর্মবস্তু (essence of things) নয়।

মৌলবাদের অর্থনীতির কথাই ধরা যাক। "মৌলবাদের অর্থনীতি" ধারণাটি ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক ঘনীভূত প্রকাশ (concentrated expression of religious communal politics)। কিন্তু এ প্রকাশের ভিত্তি কারণটি আসলে কী? বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি। তবে আপাত কথা হলো: মৌলবাদের অর্থনীতি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরুদ্ধ। এককথায় এ অর্থনীতি আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা-উদ্ভূত '৭২-এর সংবিধানের মূল চেতনাবিরুদ্ধ।

কোথা থেকে, কীভাবে, কেন সৃষ্টি হলো ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও তার অর্থনীতি? যদি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ বিবেচনা করি তাহলে বলা যায় যে জনকল্যাণমুখী বিকাশ-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক মানসকাঠামো সৃষ্টির ব্যর্থতা থেকেই পুষ্ট মৌলবাদ ও তার অর্থনীতি ও রাজনীতি। এ ব্যর্থতাই মৌলবাদের অর্থনীতি ও রাজনীতির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এ ব্যর্থতাই ধর্মের নামে জোরজবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে উদ্যত জঙ্গিবাদের সীমাহীন জঙ্গিত্বের প্রধান কারণ। যে জঙ্গিত্বের নৃশংস-অসভ্য বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি

২০০৫-এ; এসবের উত্তরকালীন নবরূপ আমরা দেখেছি হেফাজতে ইসলামের নারীবিদ্বেষী ও প্রগতিবিরোধী ১৩ দফাসহ তাদের সব কর্মকাণ্ডে;[১৩] এসবের নবতর রূপ দেখেছি ২০১৬-এর ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি হত্যাকাণ্ডে; ২০১৭ সালে এসে আপাত সর্বশেষ রূপ দেখলাম স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে হেফাজতে ইসলামের 'নির্দেশে' তাদের ২১ দফা সংযোজন, যার মাধ্যমে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে— দীর্ঘ মেয়াদে এ এক মারাত্মক পরিকল্পনার অংশ, যা আজকের ও আগত শিশুদের ধর্মভীরু থেকে ধর্মান্ধে রূপান্তরিত করবে; আর এখন আমরা প্রায়ই দেখছি বিভিন্ন পথ-পন্থা-পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মুক্তচিন্তার মানুষদের খুন-জখম ও রাষ্ট্রীয়-সরকারি-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাম্প্রদায়িকীকরণসহ আন্তর্জাতিক জঙ্গিদের সাথে সম্পর্ক-উদ্ভূত নতুন নতুন কর্মকাণ্ড। আমার হিসাবে, এসবই ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্বের চূড়ান্ত রূপ নয়। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ইতিমধ্যে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা থেকে আমি সুনিশ্চিতভাবে (যদি আমূল কোনো পরিবর্তন না হয়) এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে, "ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের আচরণে ধর্মাচার যখন ধর্মীয় সংখ্যাস্বল্পদের জন্য ভীতির কারণ হয়, তখন পরিণতিতে এমন কিছু ঘটে যা পূর্বানুমান কঠিন; কিন্তু যেকোনো বিচারেই তা মহাবিপর্যয়কর।"

এখন বৈশ্বিক ও দেশীয় অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে চূড়ান্ত বলে মনে হলেও ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই হয়তো বা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের শেষ কথা নয়; বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ীকরণই সম্ভবত চূড়ান্ত লক্ষ্য। আর ওই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্যান্য অনেক পথ-পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম মাধ্যমই হলো ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিত্ব। অবশ্য এসব বক্তব্য-বিশ্লেষণ থেকে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না যে যা বললাম তা ঘটবেই। কারণ, প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রগতির শক্তিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গতি আছে, যা অস্বীকার করলে মানব ইতিহাসই অস্বীকার করা হবে।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজতন্ত্রের উত্থান আর শেষের দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ভাঙ্গন-পরিবর্তন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ, পৃথিবীর একমেরুতে রূপান্তর, আফগানিস্তান-ইরাক-লিবিয়া-সিরিয়ার বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ ও আগ্রাসন-জবরদখল, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" (War on Terror) নামে বিশ্বব্যাপী

[১৩] হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফার অন্তর্নিহিত সারবস্তু নিয়ে একটা নির্মোহ বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, শরীফ শমশির ২০১৩, "হেফাজতে ইসলামের তের দফা: একটি পর্যালোচনা"। (শরীফ শমশির সম্পাদিত) ধর্মের রাজনীতি ও বাংলাদেশ, ঢাকা: গণ-প্রকাশন। পৃ. ৪৬-৬৪।

অপকর্ম, অন্যায়-অন্যায্য বিশ্বায়নের ডামাডোল— সবকিছুই ভিন্ন ভিন্নভাবে এবং যৌথভাবে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের উত্থানে গতি বৃদ্ধি করেছে। আবার এ কথাও যৌক্তিক যে এসব করা হয়েছে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব পুষ্ট করার স্বার্থে। মৌলবাদের উত্থান ত্বরান্বয়নে সাম্রাজ্যবাদ কোথাও প্রধান ভূমিকা পালন করেছে (যেমন: তালেবানইজম, মোল্লা ওমর, বিন লাদেন, আল-কায়েদা, আইএস কাদের সৃষ্টি?), আবার কোথাও স্বার্থ উদ্ধারের পরে তাদেরই সৃষ্ট ব্যক্তি-সংস্থাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে (ক্ষেত্রবিশেষে নির্মূল করেছে)। আসলে এসবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় মুনাফা সমীকরণ দিয়ে— তা সাধারণ অর্থের মুনাফা হোক অথবা রেন্ট-সিকারদের মুনাফা হোক (ইতিমধ্যে ছক ৩-এ দেখানো হয়েছে)। আর এই মুনাফা সমীকরণের পেছনে আছে "হোতা সাম্রাজ্যবাদ" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পৃথিবীর চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদের (basic strategic resources) উপর তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ (absolute monopoly and control) প্রতিষ্ঠা করা। এই চার সম্পদ হলো: জমিসম্পদ (land resources), পানিসম্পদ (water resources), তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ (oil, gas, mineral resources), আকাশ-মহাকাশসম্পদ (space) (ইতিমধ্যে ছক ৪-এ দেখানো হয়েছে)।

মূল কথাটি হলো সাম্রাজ্যবাদ কখন কোথায় কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, তা নির্ভর করছে তার নিজস্ব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমীকরণে স্বার্থসংশ্লিষ্টতার ওপর— যেখানে আপাতদৃষ্টিতে দেখা না গেলেও শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্বার্থটিই প্রধান। কারণ ৩০০ শতাংশ মুনাফা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে ফাঁসির আশঙ্কা জেনেও এমন কোনো অপরাধ নেই যার ঝুঁকি "পুঁজি" নেবে না। এ হলো কার্ল মার্কসের কথা। আর মার্কসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-উপসংহার নিয়ে "জ্ঞানী"দের সন্দেহ আছে। আর তাই এক্ষেত্রে কার্ল মার্কস নয় নোয়াম চমস্কির (যিনি সমাজতন্ত্রী নন) বিশ্লেষণী উপসংহারটি উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত যেখানে তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের ফলসমূহ মুনাফার জন্য ভালো, জনগণের জন্য নয়"।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সাথে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক-অর্থনীতির উত্থান ও বিকাশ যেমন সাযুজ্যপূর্ণ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর বিকাশের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট ধরনের মৌলবাদ বাধার কারণ হলে তা প্রতিস্থাপিত হবে অন্য রূপের সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে— এটাও লক্ষণীয়। মৌলকৌশলিক সম্পদ— তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পানিসম্পদের ভৌগলিক রাজনৈতিক অর্থনীতি, জমি-কৃষি-খাদ্যসম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বিশ্ববাজারে (তথাকথিত 'অবাধ বাজার' আর 'বিশ্বায়ন'— এসব নামে) আধিপত্য

প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অর্থনীতি, আকাশ-মহাকাশসম্পদের রাজনৈতিক অর্থনীতি— বর্তমান যুগের ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এসবই মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসংশ্লিষ্টতার অন্যতম অনুষঙ্গ।

বহিঃস্থ (external) ও অভ্যন্তরীণ (internal) উভয় উপাদানই ধর্মের উদারনৈতিকতার বিপরীতে সংকীর্ণতা বিকাশে ভূমিকা রাখে। তবে পরিবর্তনশীল বাস্তব জগতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এ কথা ধ্রুব সত্য যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের একমেরুর বিশ্বে অভ্যন্তরীণ উপাদান (অথবা মৌলসমূহ) বহিঃস্থ উপাদানের অধীনস্থ সত্তা হিসেবেই থাকতে বাধ্য। বিজ্ঞান ও যোগাযোগপ্রযুক্তির বিকাশের উচ্চপর্যায় আর সেই সাথে একমেরুর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন-এর বহিঃস্থ (external) এবং অভ্যন্তরীণ (internal) উপাদানসংশ্লিষ্ট বিভাজনটা সম্ভবত যথেষ্ট কৃত্রিম (artificial অথবা non-real অর্থে), অথবা বলা চলে এ দ্বি-বিভাজন বাস্তবে কার্যকর নয় অথবা এ দ্বি-বিভাজন যথেষ্ট দুর্বল। তবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে উন্নয়নের বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ উপাদানের দ্বি-বিভাজন অযৌক্তিক অথবা যথেষ্ট দুর্বল নয় বিধায় নিচে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি উত্থাপন করছি।

যেহেতু এ গ্রন্থে আমি যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি যে দেশে দেশে (ইসলাম) ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের মূল উৎসে আছে একীভূত সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীতে নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি (internal causes) **নয় বহিঃস্থ বিষয়াদি** (external causes), **সেহেতু ওইসব বহিঃস্থ উপাদানসমূহের বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিতে হবে। এসব বহিঃস্থ উপাদানের মৌলিক বিষয় হলো— একদিকে** বিশ্ব অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ডলার অর্থনীতির বিপর্যয়[১৪], বিশ্ববাজারে পেট্রোডলারের বাড়-বাড়ন্ত ও অস্থিরতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণ, ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ভেঙ্গে ফেলা এবং পরবর্তী সময়ে "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নামে সাম্রাজ্যবাদের অযৌক্তিক অতি-প্রতিক্রিয়া, "উন্নত" বিশ্বে মুসলমান নামধারীদের প্রতি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সন্দেহ-অবিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রধানত যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল ভাণ্ডারসমৃদ্ধ দেশ ইরাক আক্রমণ ও দখল, তেলসমৃদ্ধ দেশ লিবিয়ায় আগ্রাসন ও দখল, সিরিয়া দখলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, ইয়েমেনসহ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি, দক্ষিণ চীন সমুদ্রকেন্দ্রিক যুদ্ধাবস্থা (বিষয়টি পরে আলোচনা করা হবে), গোলাকায়নের গোলকধাঁধায় ইলেকট্রনিক

[১৪] জোসেফ স্টিগলিজ, ২০০২, *Globalization and Its Discontents.* New York: Allen Lane, Penguin Press.

মিডিয়ার অপসংস্কৃতি প্রচার; আর **অন্যদিকে** অভ্যন্তরীণ উপাদানের মৌলিক বিষয়াদি হলো— আমাদের দেশে 'রেন্ট-সিকার'-নিয়ন্ত্রিত দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা-বিপন্নতা-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ক্রমবর্ধমান হতাশা-নিরাশা-অসহায়ত্ব-নিরাপত্তাহীনতা, বিচারহীনতার সংস্কৃতির শক্তিশালী অবস্থান এবং রাজনীতিতে গণতন্ত্র চর্চায় ঘাটতি— এ সবকিছুই ধর্মের উদার ধ্যান-ধারণার বিপরীতে (উদারত্বের মাত্রা যাই হোক না কেন) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় অবদান রাখছে। এসবই সেসব সুযোগ সৃষ্টি করে, যা ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়ক— সে চাহিদা বহিঃস্থ এবং/অথবা অভ্যন্তরীণ যেটাই হোক না কেন। আর সে চাহিদা পূরণেই মৌলবাদী অর্থনীতি ও জঙ্গিত্বসহ সংশ্লিষ্ট রাজনীতির উদ্ভব বলা যায়। এ দুটি একে অন্যের পরিপূরক— যৌথভাবে তাদের মূল লক্ষ্য আপাতত "ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল", আর দীর্ঘ মেয়াদে "বৈশ্বিক পুঁজিবাদ চিরস্থায়ীকরণ"। অথবা আরো সঠিকভাবে বললে বলতে হয় "রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈশ্বিক পুঁজিবাদ চিরস্থায়ীকরণের প্রচেষ্টা"।

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের যোগসূত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মার্থ অনুধাবনে ইতিমধ্যে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বহিঃস্থ উপাদানের দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বসহ বিশ্লেষিত হওয়া জরুরি। বিষয় দুটি হলো: (১) "ডলার অর্থনীতির বিপর্যয়" এবং (২) "যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা"। আমার মূল যুক্তি স্পষ্ট করার স্বার্থে বিষয় দুটি একটু খোলাসা করে বলা প্রয়োজন।

ডলার অর্থনীতির বিপর্যয় বিষয়টি বহুমাত্রিক। অর্থনীতির ডলারাইজেশন ল্যাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার বহু উন্নয়নশীল দেশকে সংকটাপন্ন করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর কিন্তু সেই সাথে সবচেয়ে দেনাগ্রস্ত দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি তার রপ্তানির তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। এই ফাঁক পূরণ করতে মার্কিন অর্থনীতিকে অতিমাত্রায় নির্ভর করতে হয় বিদেশি ঋণদাতাদের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের এখন চলতি অ্যাকাউন্ট ঘাটতি (current account deficit) হলো গড়ে বছরে ৫০০ বিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ ৫০ হাজার কোটি ডলার অথবা ৪০ লক্ষ কোটি টাকা)। এ প্রক্রিয়ায় বিদেশি ঋণদাতাদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন পর্যন্ত মোট দেনার পরিমাণ দুই ট্রিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ ২ লক্ষ কোটি ডলার অথবা ১৬০ লক্ষ কোটি টাকা), যা তাদের মোট দেশজ উৎপাদন (অর্থাৎ জিডিপি-এর) ২০ শতাংশের সমপরিমাণ। বার্ষিক ৩ শতাংশ হারের সুদে মার্কিন অর্থনীতিকে

এখনই বছরে গড়ে ২০০ বিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি ডলার অথবা ১৬ লক্ষ কোটি টাকা) দেনা পরিশোধ করতে হয়। এই হারে ঋণ-দেনা চলতে থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ বিদেশি ঋণদাতাদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের দেনার পরিমাণ দাঁড়াবে তাদের জিডিপির ৭৫ শতাংশের সমপরিমাণ। মার্কিন জনগণের ওপর নূতন নূতন করারোপ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি বাড়তেই থাকবে। আবার সেটা করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই বাড়বে অস্থিরতা, গণ-অসন্তোষ। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে বৈষম্য-অসমতা এমনই বেড়েছে যে এখন "সর্বোচ্চ ধনী মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের মালিকানায় আছে দেশের মোট সম্পদের ৩৩ শতাংশ"[১৫]। সুতরাং জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ দখল ও দেশ দখল করা ছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই; বিকল্প নেই সম্পদশালী দুর্বল দেশের সম্পদ জোরদখল করা ছাড়া। এবং এ পথেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই পরিণত হয়েছে বৈশ্বিক রেন্ট-সিকারদের নেতা-হোতা।

যেহেতু মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী-জঙ্গিত্বের সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কটি সরাসরি এবং যথেষ্ট মাত্রায় সংশয় সৃষ্টিকারী ও বিতর্কিত, সেহেতু বিষয়টি যথামাত্রা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ নিয়ে সংশয়-বিভ্রান্তি-বিতর্ক যেসব কারণে হয় তার অন্যতম হলো এ রকম: যদি তালেবান, আল-কায়েদা এবং/অথবা আইএস সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সাম্রাজ্যবাদসহ পুঁজিবাদী দেশসমূহ কেন 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' ("War on terror") নামে তালেবানইজম, আল-কায়েদা ও আইএস-এর বিরুদ্ধে "দৃশ্যত" যুদ্ধ ঘোষণা করছে?

এ গ্রন্থে উত্থাপিত যুক্তি-কাঠামোর সমর্থনে ওপরের বিষয়টি একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এ বিষয়ে আমার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ[১৬]: অর্থনীতি ও রাজনীতির মারপ্যাঁচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে" (imperialistic power) পরিণত হয়েছে গত শতকের (বিংশ শতকের) শুরুর দিকে— বলা চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে। এবং তা অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিতে (imperialistic superpower) রূপান্তরিত হয়েছে গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে (বলা চলে ১৯৪৫ পরবর্তী সময়ে যদিও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব আগ্রাসন পরিকল্পনা আরও অনেক আগে থেকেই শুরু), আর তা "একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তি" (monopolistic imperialistic

[১৫] জোসেফ স্টিগলিজ, ২০১৩, The Price of Inequaility, New York: Penguin Press. পৃ. ২-৩।

[১৬] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, পৃ. ১৮৩-২১২।

power) অর্থাৎ "হোতা সাম্রাজ্যবাদে" (leader of imperialism) রূপান্তরিত হয়েছে গত শতকের ১৯৭০-১৯৮০-এর দশকে (রূপান্তরের ওই সময়কালটা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পতনের সময়কালের সাথে মোটামুটি মিলে যায়)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "হোতা সাম্রাজ্যবাদে" অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভু"-তে পরিণত হওয়ার ইতিহাসটা খুব পুরোনো নয়— এখন পর্যন্ত বড়জোর ৪০-৫০ বছর। কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদের হোতা শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার স্বপ্নটি তুলনামূলক বেশ পুরোনো— কমপক্ষে ১৯৫ বছর— "মন্‌রো মতবাদ"[১৭]

[১৭] "মন্‌রো মতবাদ" ইতিহাসে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে যে সাধারণ শব্দ অভিধানেও তা স্থান পেয়ে গেছে। শব্দ অভিধান লিখছে "মন্‌রো মতবাদ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির অংশ, যা বলছে যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্ব-স্বার্থ রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপর থাকবে।" আর উদ্ভব সূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই মতবাদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস মন্‌রো ১৮২৩ সালে তার দেশের ভবিষ্যৎ নীতি-কৌশল হিসেবে প্রদান করেন, যা ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্র নীতির দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়। (দেখুন Oxford Advanced Learner's Dictionary, New 7th Edition, পৃ. ৯৮৯)। ১৮২৩ সালের মন্‌রোর মতবাদকে বলা হয় ইউরোপীয় দেশসমূহ সম্পর্কে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি। মন্‌রো মতবাদের পটভূমি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। বিষয়সমূহ এ রকম: (ক) নেপোলিয়নের যুদ্ধের (১৮০৩-১৮১৫) দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস মন্‌রো তার মতবাদ বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; (খ) মার্কিন সরকার ভয় পেয়েছিল যে বিজয়ী ইউরোপীয় শক্তি আবারও জোরেশোরে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রচলন করতে পারে; (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভয় পেয়েছিল যে ল্যাতিন আমেরিকার দেশসমূহে যখন ইউরোপীয় শাসনের পতন হলো তখন স্পেন ও ফ্রান্স ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে আবারও উপনিবেশে রূপান্তরিত না করে ফেলে; (ঘ) ফরাসিরা কিউবাকে হাতে পাওয়ার বিনিময়ে স্পেনের রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; (ঙ) নেপোলিয়নের যুদ্ধের শেষে এশিয়া, আফ্রিকা ও রাশিয়া– রাজতন্ত্র রক্ষায় এক হয়ে "পবিত্র জোট" (Holy Alliance) গঠন করে। স্পেন ও স্পেনের উপনিবেশসমূহে "মদ্যপ শাসন" (Bourbon rule) কায়েমের জন্য এই 'পবিত্র জোটকে' সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়, যখন স্পেনের উপনিবেশসমূহে স্বাধিকার আন্দোলন চলছে; (চ) রাশিয়ার জার সম্রাট আলাস্কার দক্ষিণে ওরিগন ভূখণ্ডের দিকে শাসন প্রসারিত করছে; (ছ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন একদিকে চায়নি যে "নয়া দুনিয়ায়" নতুন কোনো ইউরোপীয় উপনিবেশ হোক, অন্যদিকে চেয়েছিল তাদের দক্ষিণে মার্কিনি বাণিজ্য প্রসারের বাধা অপসারিত হোক। এক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একমত ছিল এ কারণে যে তারা চায়নি তারা ছাড়া ইউরোপের অন্য কোনো শক্তি নয়া দুনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে ব্রিটেনের শক্তি হ্রাস করুক (অবশ্য গ্রেট ব্রিটেনই তখন একমাত্র শক্তিধর যার নিয়ন্ত্রণে ছিল পৃথিবীর সবচে শক্তিশালী নৌ-শক্তি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না); (জ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের সরকার যখন মন্‌রো মতবাদের মূল বিষয়– "নয়া দুনিয়া থেকে পুরাতন দুনিয়াকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা"র বিষয়ে নীতিগতভাবে যৌথ স্বাক্ষরে সম্মত হয়, তখন (১৮২৯ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানতে পারে যে ব্রিটেনের বেশ কয়েকজন সমুদ্র-বাণিজ্য ব্যবসায়ী টেক্সাস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) দখলের উদ্দেশ্যে গ্রেট ব্রিটেনের সহায়তায় মেক্সিকোর সাথে ৫ লক্ষ

(১৮২৩ সালের Monroe doctrine) দিয়ে যে স্বপ্নের শুরু। আর পরবর্তীকালে বিশ্বের আর্থরাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে এবং ওই পরিবর্তনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে "কর্তব্য পালনে"(!) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'বিশ্ব প্রভুত্বের' সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ দিতে মন্‌রো মতবাদকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে মাত্র (just extension and expansion of Monroe doctrine)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভু হওয়ার সুপ্ত বাসনা ১৮২৩ সালের 'মন্‌রো মতবাদ' দিয়ে শুরু হয়ে সময়ের বিবর্তনে ২০০২ সালে ডিক চেনি-রোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড-কলিন পাওয়েল রচিত মহাকৌশল (Grand Strategy)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এর আগে ১৮৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "*পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণে আগ্রাসী হতে হবে*"— এ নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হলো 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি' ('*দূর গন্তব্যের ইশতেহার*', Manifest Destiny) মতবাদ।

'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি' মতবাদে স্পষ্ট বলা হচ্ছে— "আমাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) উত্তর আমেরিকা বিজয় এবং তার ওপর কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব ঈশ্বরের আদেশ"। 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি'-তে বলা হচ্ছে যে, "রেড ইন্ডিয়ানদের উচ্ছেদ করা, তাদের জঙ্গল ও গরু-মহিষ-ষাড় ধ্বংস করা, জলাভূমি প্লাবিত করা, নদ-নদীর স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার করা এবং শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিরবচ্ছিন্ন শোষণনির্ভর এক অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়ে তোলা— সব কিছুই মানুষের নয় ঈশ্বরের নির্দেশেই আমাদের করতে হবে"। 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি'-তে ঈশ্বর প্রদত্ত (!) এসব আদেশ-নির্দেশের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, "গোলার্ধের সর্বত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ অধিকার আছে, বিশেষত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেকোনো দেশ দখলের অধিকার আমাদের আছে। তবে যারা মার্কিন নীতির অনুগত হতে অস্বীকার করবে বা অবাধ্য হবে, তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের আগ্রাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আমাদের আছে।"

এরপর ১৮৮০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস গ্যারফিল্ড ও প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন হ্যারিসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস্ ব্লেইন ল্যাতিন আমেরিকার জাতিসমূহকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালন এবং মার্কিন ব্যবসায়ীদের জন্য লাতিন আমেরিকার বাজার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে মন্‌রো মতবাদ সম্প্রসারণ করে 'দাদাগিরি নীতি' (Big Brother Policy) প্রণয়ন করেন। এই নীতির ভিত্তিতেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড ওলনেই ব্রিটেনকে এক সরকারি নোট দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন (২০ জুলাই ১৮৯৫) যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ মহাদেশে কার্যত

ডলারের চুক্তি সম্পাদন করেছে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস মন্‌রোর প্রশাসন এককভাবে "মন্‌রো মতবাদ" নিয়ে বিবৃতি প্রদান করে।

সার্বভৌম। এই মহাদেশে আমাদের শাসন ক্ষমতা ও রায়ই চূড়ান্ত এবং এ ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপনকারী বা ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বলে কোনো কিছুই থাকবে না"। ১৮৯৫-এর এসব ঘটনা অ্যাংলো-আমেরিকান সম্পর্কের ইতিহাসে, বিশেষত ল্যাতিন আমেরিকা নিয়ে অ্যাংলো-আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার (শত্রুভাবাপন্নতার) ইতিহাসে বিশেষ মুহূর্ত বলে বিবেচিত হয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরকারি নোটের ভাষা তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সালিসবারির কাছে আপত্তিকর মনে হওয়াতে ব্রিটিশ সরকার মন্‌রো মতবাদের পরিধি-পরিসর নিয়ে আলোচনার জন্য মার্কিন সরকারের কাছে প্রস্তাব দেয়। মার্কিন সরকার আলোচনার এ প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, "ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্‌রো মতবাদ ও গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে"।[১৮] এরপরেই ঊনবিংশ শতকের শেষে আর বিংশ শতকের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি বিশ্বশক্তি-পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে মন্‌রো মতবাদ তত বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কুইনসি এডামস্ (প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন) মন্‌রো মতবাদের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশবাদবিরোধী ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জবিহীন কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনার প্রথম ধাপ।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে থিওডর রুজভেল্ট ১৮৯৮ সালে মন্‌রো মতবাদের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্পেনের উপনিবেশ কিউবা দখলের পক্ষে যুক্তি দেন। ১৯০৪ সালে ইউরোপের পাওনাদারেরা ল্যাতিন আমেরিকার দেনাদার দেশগুলোকে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে দেনা আদায়ে সামরিক অভিযানের ভয় দেখাতে থাকে। এ অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট মন্‌রো মতবাদকে অধিকতর আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে (যা "রুজভেল্ট অনুসিদ্ধান্ত" হিসেবে পরিচিত) ঘোষণা দেন যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে যে ব্রিটেন ল্যাতিন আমেরিকার যেকোনো দেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে যে ল্যাতিন আমেরিকায় কোনো গর্হিত ও কঠিন ধরনের অন্যায় হচ্ছে সে ক্ষেত্রে তা রোধে মার্কিন সরকার আন্তর্জাতিক পুলিশি ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।" প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর এ অনুসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে ইউরোপীয়দের ক্ষমতাহীন করার লক্ষ্যে ১৯০৪ সালে সান্টো ডোমিংগোতে, ১৯১১ সালে নিকারাগুয়াতে এবং ১৯১৫ সালে হাইতিতে মার্কিন নৌবাহিনী

[১৮] জর্জ হেরিং, ২০০৮, From Colony to Superpower. U.S. Foreign Relations Since 1776. New York: Oxford University Press. পৃ. ৩০৭-৩০৮।

পাঠানো হয়। এভাবেই বিংশ শতকের শুরুর দিকে 'মন্‌রো মতবাদ' ও 'ম্যানিফেস্ট ডেসটিনির' ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট প্রণীত অনুসিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক আগ্রাসী শক্তি দিয়ে মার্কিন গোলার্ধের একক কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণের "মহাদেশীয় পুলিশম্যানে" ('Hemispheric Policeman') রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাগাদ (১৯৩৯ সাল) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের পথ-পদ্ধতি খুঁজতে থাকে। এতকাল ল্যাতিন আমেরিকা নিয়ে ব্যস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ল্যাতিন আমেরিকায় সীমাবদ্ধ না থেকে মন্‌রো মতবাদের মধ্যে যে বিশ্বপ্রভুত্বের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল তা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। এ লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালে (মে মাসে) মার্কিন যুদ্ধমন্ত্রী হেনরি স্টিমসন্ ধারণা দিলেন যে "অন্য যেকোনো পরাশক্তি বিশেষত ব্রিটেন যেসব আঞ্চলিক সিস্টেমে নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে, তা উচ্ছেদ করে সেসব জায়গায় আমাদের বসতে হবে; ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যেসব আঞ্চলিক জোটে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং সেখানে আমাদের পক্ষের আঞ্চলিক জোট সৃষ্টি করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই (১৯৩৯-১৯৪৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র সম্পর্কবিষয়ক কাউন্সিল (Council on Foreign Relations)-এর অন্যতম "যুদ্ধ ও শান্তি স্টাডি প্রজেক্ট" (War and Peace Studies Project) পরিচালন করে, যেখানে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব নিশ্চিত করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ প্রজেক্ট ১৯৪০-এর প্রথম দিকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যের পরিকল্পনা উপস্থাপন করে, যেখানে তারা হিসাবপত্তর কষে দেখায় যে তাদের ফরমুলা বাস্তবায়ন করতে পারলে ১৯৭০-এর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "বিশ্ব সিস্টেমে একক আধিপত্যবাদী প্রভুত্ব কায়েম করতে সক্ষম হবে"। তারা এই ফরমুলার নাম দিল "গ্রান্ড এরিয়া কনসেপ্ট" (Grand Area Concept)। "গ্রান্ড এরিয়া কনসেপ্ট"-এর মূল কথা এ রকম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির স্বার্থরক্ষাকারী অধীনস্থ যে অঞ্চল বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলগতভাবে প্রয়োজন সেসব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হবে পশ্চিম গোলার্ধ, দূরপ্রাচ্য এবং সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বোঝা গেল যে পশ্চিম ইউরোপ এবং তেলসম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য (যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেন) "গ্রান্ড এরিয়া" পরিকল্পনায় যোগ দেবে। 'গ্রান্ড এরিয়া' পরিকল্পনা বিশারদসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা

কাউন্সিল (National Security Council) বুঝেছিল যে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা হবে সেইসব দেশ (ও মতাদর্শ) যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং/অথবা যারা সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা গঠনের পথে আছে এবং/অথবা যেখানে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উত্থান হচ্ছে এবং/অথবা যেখানে এমন ধরনের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে, যার প্রগতিবাদী রূপান্তর ঘটতে পারে এবং/অথবা যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত নয়, অবাধ্য।

১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন কিউবায় মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন শুরু করল, তখন আবারও মন্‌রো মতবাদ প্রয়োগ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কিউবার আশেপাশের দ্বীপসমূহে নৌঘাঁটি ও বিমানবহরের সমাগম করে বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কিউবায় নেতৃত্ব উচ্ছেদ না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন (regime change) না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাসন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হবে"।[১৯] শেষ পর্যন্ত সমস্যার সুরাহা হলো এ রকম: সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র উঠিয়ে নিল এবং স্থাপনা ধ্বংস করল আর বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে তাদের অকেজো মিসাইল ও অকার্যকর স্থাপনা ধ্বংস করল। রাষ্ট্র পরিচালনব্যবস্থায় উদারপন্থী-বিশেষজ্ঞ ডিন অ্যাচেসন কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের সমর্থনে ১৯৬৩ সালে বললেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদী ক্যাম্পেইন করেছে, সেটা ন্যায়সঙ্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা, অবস্থান ও মানসম্মানকে (power, position and prestige) যে-ই চ্যালেঞ্জ করুক না কেন তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা নেই"।[২০] ডিন অ্যাচেসন-এর তাত্ত্বিক নেতৃত্বে ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু হলো মন্‌রো মতবাদের আগ্রাসী রূপান্তর, যার মূল কথা এ রকম: "পচা আপেল ধ্বংস করো"; "আমরা ওদের আমাদের শর্তে 'শান্তি' দেব, আর ওরা তা প্রত্যাখ্যান করলে— তা হবে গোরস্থানের বিজয়"; "ডোমিনো তত্ত্ব প্রয়োগ করো"।

মন্‌রো মতবাদের নবতর এই আগ্রাসী রূপ দেখা গেল ভিয়েতনাম যুদ্ধে (১৯৬২ সাল থেকে)। এ প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের গোপন নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ইন্দোচীনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমে ইন্দোচীনে ফরাসি যোদ্ধাদের

---

[১৯] নোয়াম চমস্কি, ২০০২, Reflections on 9/11, in The Essential Chomsky (Arnove Anthony, ed. New Delhi: Penguin Books India, 2008, পৃ. ৩৪৩।

[২০] এসব "অ্যাচেসন মতবাদ" (Acheson doctrine) হিসেবে খ্যাত। বিস্তারিত দেখুন, নোয়াম চমস্কি, ২০০৪, Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, Penguin Books, পৃ. ১৪-১৬।

সমর্থন করতে হবে, ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর পরে ফরাসিদের উৎখাত করে ইন্দোচীনবিরোধী যুদ্ধকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার ও সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিরা অনেক আগেই ভিয়েতনামে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা তুলেছিলেন, কিন্তু পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পদের জন্য ইন্দোচীন দখলের যুদ্ধ করেনি। এটাও 'মন্‌রো মতবাদ'সহ ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি, 'গ্রান্ড এরিয়া' পরিকল্পনা ও ডিন অ্যাচেসনের নীতি-তত্ত্বের সাথে সাযুজ্য রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্বপ্রভুত্বে রূপান্তরের যুদ্ধ।

'বিশ্ব-প্রভুত্বে' রূপান্তরের উল্লিখিত নীতি-তত্ত্ব প্রয়োগ করেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন ভিয়েতনামে মহা-আগ্রাসী যুদ্ধ করেছেন,[২১] প্রেসিডেন্ট নিক্সন কম্বোডিয়া আক্রমণ করেছেন, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ৯/১১ দেখিয়ে ইরাক দখল করেছেন (আর সহযাত্রী যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সাহেব এখন বলছেন "ভুল করেছি"), প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান আবিষ্কার করেছেন "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" (War on Terror) ফরমুলা, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মহাকাশের সামরিকীকরণে মার্কিন কংগ্রেস থেকে সমর্থনসহ সর্বোচ্চ পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ আদায় করে ছেড়েছেন (অবশ্য তার পরপরই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন), আর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প "আমেরিকা ফার্স্ট" ফর্মুলা প্রয়োগে যা ইচ্ছে তাই করবেন। এসব কিছুই করা হয়েছে (এবং হচ্ছে) সুনির্দিষ্ট একক লক্ষ্যে। লক্ষ্যটি হলো যেকোনো পথ-পন্থা-পদ্ধতিতে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে একচ্ছত্র-অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বপ্রভুতে রূপান্তরিত করতে হবে।"

১৯৬০-এর দিকে নবরূপে শুরু "ডোমিনো তত্ত্বের" যে ভাষ্যটি (এ তত্ত্বের দুটো ভাষ্য আছে) প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করলেন তা বেশ স্থূল; যে ভাষ্যমতে "জনগণকে (নিজের দেশসহ যেকোনো দেশে) ভয় দেখাতে হবে যে ওরা (সে যে দেশই হোক অথবা যে দেশ যখন দরকার) যে বাড় বেড়েছে, তাতে ওদের বিরুদ্ধে দ্রুত সমুচিত ব্যবস্থা না নিলে ওরা দ্রুতই ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসবে এবং আমাদের যা কিছু আছে (যা ওদের নেই) তা ওরা দখল করে ফেলবে। "ওরা" বলতে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন

[২১] এখানে উল্লেখ জরুরি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম যুদ্ধে যত গোলাবারুদ ব্যয় করেছে (ordnance expended) তার মোট পরিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও ইতালিতে সম্মিলিতভাবে যত গোলাবারুদ ব্যবহার করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হবে [এ তথ্যটি মার্কিন কংগ্রেসে ভিয়েতনাম যুদ্ধ সম্পর্কে সিনেটর ম্যানস্‌ফেল্ড তার সাক্ষ্য-প্রমাণে বলেছেন; দেখুন চমস্কি, ১৯৬৭, "On Resistance", in The Essential Chomsky (Arnove Anthony, ed.) New Delhi: Penguin Books India, 2008, পৃ. ৬৫]।

জনসন শুধু ভিয়েতনামকেই বোঝাননি, বুঝিয়েছিলেন ইন্দোচীনের সবাইকে; আর ওদের নাম দিয়েছিলেন "হলুদ বামন" ("yellow dwarves"!)।

ডোমিনো তত্ত্বের 'যৌক্তিক' (!) ভাষ্য অথবা "অপারেটিভ ভাষ্য"-কে বলা হয় "পচা আপেল তত্ত্ব"। মার্কিন নীতি-কৌশল নির্ধারণকারী পরিকল্পকদের গোপন নথিপত্রে এটা "Rotten Apple Theory" বলে পরিচিত। তত্ত্বটি এ রকম: "এক বস্তা আপেল আছে, সব আপেলই 'ভালো' তবে একটা আপেল 'পচা'। ওই পচা আপেল বস্তায় রাখা হলে ভালো আপেলগুলো পচে যাবে। সুতরাং ভালো আপেলগুলো ঠিকঠাক রাখতে হলে পচা আপেল ছুড়ে ফেলে দিতে হবে"। আর এই তত্ত্বের নিহিতার্থ হলো এ রকম: 'ভালো' আপেল মানে সেসব দেশ-রাষ্ট্র, যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ও সদাবাধ্য; আর 'পচা' আপেল মানে সেসব দেশ-রাষ্ট্র, যারা নিজ দেশে জাতীয়তাবাদী অথবা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সঙ্গত কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত নয় এবং অবাধ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পুরো ঊনবিংশ শতকে ল্যাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশ, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ল্যাতিন আমেরিকাসহ দূরপ্রাচ্যের জাপান-কমুনিস্ট চীন-ইন্দোচীন-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া-দক্ষিণ এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসবসহ আফ্রিকা মহাদেশ আর ১৯৬০-এর দশকের ভিয়েতনাম-লাওস-কম্বোডিয়া-কিউবা, ১৯৭০-৮০-র দশকে এল-সালভাদর-চিলি-বাংলাদেশ-নিকারাগুয়া, ১৯৯০-২০১৭ সময়কালে ইরাক-লিবিয়া-সিরিয়া-ইয়েমেন-তুরস্ক-কাতার এসবই "পচা আপেল"। এরা সবাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিতে 'আনুগত্যহীন'-'অবাধ্য'!

উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই (১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে) এই "পচা আপেল" তত্ত্বের ভিত্তিতেই ডিন অ্যাচেসন্ মার্কিন কংগ্রেসকে প্রেসিডেন্ট ট্রুমান-এর মতবাদ বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে গ্রিস, তুরস্ক ও ইরানের ওপর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন চাপ প্রয়োগ করবে; প্রথম "পচা আপেল" হবে গ্রিস, যা ইরানসহ পূর্ব দিকে যারা আছে, সবাইকে "পচাবে", তারপরে এই পচন সংক্রামিত হবে এশিয়া মাইনরসহ, মিসর ও আফ্রিকায়, তারপরে পচন শুরু হবে সেসব দেশে যেসব দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কমুনিস্টদের বেশ প্রভাব আছে অর্থাৎ ইতালি ও ফ্রান্সে। এ তত্ত্বে কাজ হয়েছে। ১৮২৩ সালে মন্‌রো মতবাদ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মহা-প্রভু হওয়ার যে স্বপ্নযাত্রা শুরু তা বিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হয়ে ২০০২ সালে ডিক চেনি-রোনাল্ড র‍্যামসফেল্ড-কলিন পাওয়েলের হাতে বিশ্বসম্পদে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র মালিকানা ও

নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের মহাকৌশল বা Grand Strategy দিয়ে আপাতত শেষ (এ সম্পর্কে পরে আসছি)।

সমাজতান্ত্রিক আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক সিস্টেম যখন পরাশক্তি হিসেবে অনুপস্থিত, যখন মানবমুক্তির আন্দোলন-সংগ্রাম মন্থর অথবা নির্জীব, যখন দেশে-দেশে সার্বভৌমত্বও বিপর্যস্ত, যখন 'ভালো' আপেলের জয়-জয়কার, যখন তথাকথিত বিশ্বায়নের ডামাডোলে তুলনামূলক স্বাধীন দেশও প্রকৃত অর্থে পরাধীন— এহেন পরিবর্তিত পৃথিবীতে "বিশ্বপ্রভু" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের মহা নীতি-কৌশল (Grand Strategy) হিসেবেই চাইবে পৃথিবীর চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদের (fundamental strategic resources) ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) এবং একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব (absolutely unilateral control) প্রতিষ্ঠা করতে। আগেই বলেছি, এই চার সম্পদ হলো: (১) জমিসম্পদ (land resources which is not product of labor), (২) পানিসম্পদ (water resources), (৩) জ্বালানি, শক্তি ও খনিজসম্পদ (fuel, energy, mineral resources) এবং (৪) মহাশূন্য-মহাকাশ (space)। পৃথিবীর এই চার মৌলকৌশলিক সম্পদে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কারও সাথে কোনো ধরনের আপস করবে না (মাঝেমধ্যে সাময়িক "কূটনৈতিক আপস-চালাচালি" ব্যতীত)। মার্কিন মহাপ্রভু-সাম্রাজ্যবাদ উল্লিখিত চার মৌলকৌশলিক সম্পদ কারো সাথে ভাগাভাগিও করবে না। এটাকে বলা চলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "Imperial Grand Strategy"— "সাম্রাজ্য বিস্তারের মহাকৌশল"। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের এই মহাকৌশল চালিয়ে যাবে আর তাদের অধীনস্থ উপ-সাম্রাজ্যবাদ (অধীনস্থ না হয়ে প্রতিযোগীও হতে পারে, যেমন চীন, রাশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি), ধনী পুঁজিবাদী দেশসমূহ, সদ্য জন্মপ্রাপ্ত পুঁজিবাদী দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল-স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশসমূহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওই মহাকৌশল নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে অথবা সহায়তা করতে বাধ্য হবে (বিষয়টি সহজবোধ্যভাবে ইতিমধ্যে ছক ৪ ও ২-এ দেখানো হয়েছে)। অবাধ্য হওয়ার শাস্তি হবে চরম, যা ইতিমধ্যে কুৎসিতভাবে-বীভৎসভাবে-নৃশংসভাবে প্রদর্শিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন 'অবাধ্য' দেশে। তবে অদূর ভবিষ্যতে বাধা হিসেবে দাঁড়াবে গণচীন (হতে পারে রাশিয়া)। আর সে ক্ষেত্রে মৌলবাদ-জঙ্গিবাদসহ অনেক সমীকরণেরই রূপ পরিবর্তিত হবে (গুরুত্বপূর্ণ নতুন এ বিষয়টি সম্পর্কে পরে আসব)।

সাম্রাজ্য-বিস্তার ও "আমরাই বিশ্ব প্রভু"— এ নীতি বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন "অবাধ্য" দেশে "যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার" নামে যা করেছে, তার কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

১. ১৯৬০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক কিউবার বিরুদ্ধে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস-এর সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "ক্ষমতা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড" পরিচালন (International terrorist campaign aimed at "regime change")। উল্লেখ্য যে 'সমাজতন্ত্র' ওই সময়ে পৃথিবীতে অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে উপস্থিত।

২. ১৯৮০-র দশকের শুরুর দিকে সান্দিনিস্ট বিদ্রোহীরা যখন নিকারাগুয়ায় মার্কিন আজ্ঞাবাহী পুতুল সরকার স্বৈরাচারী সামোজাকে উৎখাত করল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করল। আন্তর্জাতিক আদালতসহ জাতিসংঘের বিচারেই এ ছিল মার্কিনদের সংঘটিত "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ"।

৩. ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে এল-সালভাদরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ চালায়। এসব কারণেই গুয়াতেমালার প্রখ্যাত সাংবাদিক জুলিও গোডোই লিখেছেন, "১৯৬০ থেকে ১৯৯০-এর দশকে মধ্য-আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগান আবিষ্কৃত 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' (War on Terror)-এর নামে নিজেরাই যে বীভৎস আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে সে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস অতি সহজেই 'বিশ্ব নিষ্ঠুরতা পুরস্কারে' ভূষিত হতে পারে[২২]।"

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেসব কারণ দেখিয়ে যেভাবে ইরাক দখল করে, তা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী "যুদ্ধাপরাধ" (War Crime)। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-সরকার ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে মার্কিন জনমত উপেক্ষা করে (মার্কিন জনগণের ৯০ শতাংশ ইরাক

[২২] গোডোই, জুলিও (১৯৯০), Latin American Documentation (LADOC), *Torture in Latin America, (Lima, Peru), 1987. Nation,* 5 March, 1990

দখলের বিপক্ষে ছিলেন)। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাদের নয়া মহা-কৌশল (Grand new strategy)-এর অংশ "Doctrine of resort to force at will" অবলম্বন করে ইরাক দখলের পক্ষে যেসব যুক্তির আশ্রয় নেয়, তা হলো: সাদ্দাম হোসেন একজন "খারাপ ডিক্টেটর"; সাদ্দাম হোসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক আসন্ন হুমকি; সাদ্দাম হোসেন টুইন টাওয়ার ভাঙ্গাসহ ৯/১১-এর জন্য দায়ী; সাদ্দাম হোসেন ৯/১১ মতো আরও ক্ষতির সম্ভাব্য কুশীলব; এবং সাদ্দাম হোসেনের হাতে "গণ-বিধ্বংসী সমরাস্ত্র" (Weapon of Mass Destruction, WMD) আছে, যা সে যেকোনো সময় ব্যবহার করবে।[২৩] সাম্রাজ্যবাদের জন্য "সময়" ('time') বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইরাক দখলের সময়কালটা হলো মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের, যখন মার্কিন জনগণের মনমানসিকতা মূল ঘটনা থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাহলে ইরাক দখল করতে হলো কেন? আমার মতে, তা করতে হলো একই সঙ্গে অনেক কারণে— এক ঢিলে অনেক পাখি মারার মতো, যার মধ্যে অন্যতম হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলসমৃদ্ধ দেশ দখল; মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকের ভৌগলিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব যেখানে ভৌগলিকভাবে ইরাককে কেন্দ্র ধরলে তার চারপাশের সীমানারাষ্ট্র হলো তেলসমৃদ্ধ ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব ও কুয়েত, আর সেই সাথে আছে পারস্য বা আরব সাগর— লোহিত সাগর-কৃষ্ণ সাগর-কাসপিয়ান সাগরকেন্দ্রিক জল-রাজনীতি;[২৪] ইরাকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দুই নদী- ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সুপেয় পানির প্রধান উৎস; ইরাক যুদ্ধে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মহা-পুনর্গঠনের মহা-ঠিকাদার হবে মার্কিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ; বিশ্বব্যাপী অস্ত্র-সমরাস্ত্র ব্যবসা বৃদ্ধি,

[২৩] অবশ্য ইরাক দখলের পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ইরাকে "গণ-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র" যখন পাওয়া গেল না, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলল "এমন কিছু যন্ত্রপাতি-যন্ত্রাংশ-মালামাল পাওয়া গেছে, যা দিয়ে এ ধরনের মারণাস্ত্র-সমরাস্ত্র বানানো সম্ভব"।

[২৪] মনে রাখা জরুরি যে পৃথিবীর প্রাথমিক জ্বালানিসম্পদের বড় অংশটিই আছে উত্তর পারস্য সাগর (যে সাগরকে আরব দেশের মানুষ আরব সাগর নামে ডাকতে পছন্দ করেন)-এর আশপাশের দেশগুলোতে, যে দেশগুলো প্রধানত মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়-অধ্যুষিত, যাদের পশ্চিমা সাম্রাজ্য-পরিকল্পনাকারীরা ভয় পায়। আর "The End of Time Narrative"-এর নামে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নিসহ বিভিন্ন ধরনের বিভাজন সাম্রাজ্যবাদেরই মস্তিষ্ক-উদ্ভূত নবসংযোজন।

যার মধ্যে বিশেষভাবে আছে ইরাকসহ ইরাকের পার্শ্ববর্তী সব দেশ; এবং ইরাকের চারপাশের দেশসহ বিশ্বব্যাপী রাজা-বাদশাহ্দের মধ্যে এমন চরম ভীতি সৃষ্টি করা যেন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে "অবাধ্যতার" শাস্তি কত ভয়ঙ্কর হতে পারে (এটা "পচা আপেল তত্ত্বের" অংশ)। আর এ তত্ত্বের ফল ভোগ শুরু করেছে ইতিমধ্যে কাতার ও সৌদি আরব। সামনে আছে অনেকেই!

মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের উত্থানের সাথে সাম্রাজ্যবাদের যোগসূত্র নিরূপণে সন্ত্রাস দমনের নামে "যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা" নিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ জরুরি যে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরাক দখল অনেক কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। ওপরে যা বলেছি তার সাথে আরও কয়েকটি বিষয় যোগ না করলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না এবং তা না বোঝা গেলে এও বোঝা যাবে না যে সাম্রাজ্যবাদের আজকের যুগে আমাদের মতো একক কোনো দেশে কেন বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক মুক্ত-স্বাধীন কাঠামো গড়ে তোলা যাবে না। অথবা সেটা প্রায় অসম্ভব। বিষয়টি এ রকম। আগেই বলেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর কিন্তু একই সাথে সবচেয়ে দেনাগ্রস্ত দেশ। দাতাদের কাছে যুক্তরাষ্টের ক্রমপুঞ্জীভূত দেনার পরিমাণ তাদের জিডিপি-র ৭৩-৭৫ শতাংশের সমপরিমাণ। মার্কিন জনগণের ওপর নতুন নতুন করারোপ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি বাড়তেই থাকবে। আবার সেটা করা হলে বাড়বে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা। সুতরাং জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ দখল করা ছাড়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামনে দ্বিতীয় বিকল্প নেই। সুতরাং সৃষ্টি করতে হবে যুদ্ধাবস্থা; বাঁধাতে হবে যুদ্ধ, অন্যায় যুদ্ধ; চাপিয়ে দিতে হবে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ হবে ধর্মের নাম ব্যবহার করে নাকি ধর্মের নাম ব্যবহার না করে— তাতে ওদের কিছুই যায় আসে না।

যুদ্ধ— যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। তা না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই যে পরিমাণ সামরিক খাতে ব্যয় করে (বছরে প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশি মুদ্রায়

প্রতিদিন ৮,৭২০ কোটি টাকা)[২৫] সারা বিশ্ব সম্মিলিতভাবেও যুদ্ধ-খাতে সে পরিমাণ ব্যয় করে না কেন? অর্থনীতিবিদ নর্ডহাউস সাহেব যতই অংক কষে বলুক না কেন যে ইরাক যুদ্ধে ২০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩,০০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতি (অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি ডলার থেকে ৩ লক্ষ কোটি ডলার) হতে পারে— আসলে এ ক্ষতি সে ক্ষতি নয়। অবশ্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ প্রয়াত মিল্টন ফ্রিডম্যান সাহেব ফর্দ দিয়েছেন— এ যুদ্ধে লাভ হবে, বিশ্ববাজার চাঙ্গা হবে। ফ্রিডম্যান ঠিকই বলেছেন!!! কারণ ইরাক দখলের পর থেকে বৈশ্বিক রেন্ট-সিকারদের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি হচ্ছে; যুদ্ধপরবর্তী ইরাক পুনর্গঠনের ব্যবসা ইতিমধ্যে জমে উঠেছে; ব্যবসা করছে সব সাম্রাজ্যবাদ, সাথে থাকছে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), ভাগ পাচ্ছে জাতিসংঘ। সাধারণত, বড় ধরনের যুদ্ধের পরে তৃতীয় বিশ্বেও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা নতুনভাবে জমজমাট হয়, সেটাও হচ্ছে, আর কোথাও না হোক রাজতন্ত্রীয় ও (বুশের ভাষায়) 'ভালো' স্বৈরতান্ত্রিক দেশসমূহে (লক্ষ করলে কাতার, সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশ)। মনে রাখতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের অধিকাংশই তেলের ক্ষেত্রে চরম বিদেশনির্ভর; আর মধ্য-এশিয়ার তেল, আফগানিস্তানের তেলপথ, ইরাকের তেল, লিবিয়ার তেল, কাতারের তেল-গ্যাস সৌদি আরবের তেল— এসবই তেলের ভূগোলের এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ রুট (জলপথ)। ইরাকে তেলযুদ্ধের মূলে কাজ করেছে বিশ্বে যেখানে যে তেলসম্পদ আছে, তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ মালিকানা (not access but complete ownership) প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। তেলসম্পদের দিক থেকে ইরাকের অবস্থান বিশ্বে শুধু দ্বিতীয় বৃহত্তমই নয় ইরাকের তেল গুণগত উচ্চমানসম্পন্ন, এবং ওই তেল আহরণ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সস্তাও বটে। যুক্তরাষ্ট্র অনুধাবন করতে পেরেছে যে, ইরাককে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থই হচ্ছে তেলের মূল্য নির্ধারণে OPEC-এর উপর খবরদারি করা। সে ক্ষেত্রে সারা বিশ্ব তাকে সমীহ করতে বাধ্য হবে। মোট কথা হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

[২৫] অর্থাৎ ৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় ৩২ লাখ কোটি টাকা (অর্থাৎ বাংলাদেশের গত ৩০ বছরের মোট সরকারি বাজেটের সমপরিমাণ)।

চায় তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যকে কব্জা করতে।[২৬] আর মধ্যপ্রাচ্য ইসলাম ধর্মপ্রধান অঞ্চল।

৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১১ সালে তেলসমৃদ্ধ লিবিয়া দখল করল। মার্কিন সরকারের হিসাবে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মোয়াম্মার গাদ্দাফি ছিলেন "অবিশ্বাসযোগ্য ডিক্টেটর" (unreliable dictator)। লিবিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল "প্রভুভক্ত ডিক্টেটর"। কিন্তু গাদ্দাফি "যথেষ্ট মাত্রায় বেয়াড়া" এবং "কোনো কথাই শোনে না"। লিবিয়া দখল করে প্রভুভক্ত ডিক্টেটর বসালে একই সাথে অনেক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। যেমন: পাওয়া যাবে অফুরন্ত তেল; আফ্রিকার রাজনীতি বিশেষত সাব-সাহারান আফ্রিকার (পশ্চিম সাহারা, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, মালি, নাইজার, চাঁদ, উত্তর সুদান, ইরিত্রিয়া) রাজনীতিতে আরও বেশি ফলপ্রদ অনুপ্রবেশ করা যাবে; গাদ্দাফির "ইউনাইটেড স্টেটস অব আফ্রিকা" (USA) তত্ত্ব বানচাল করা যাবে; আর একই সাথে বানচাল করা যাবে পুরো আফ্রিকায় সাধারণ মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা চালু করার গাদ্দাফির "মারাত্মক" কৌশলিক প্রস্তাব; মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব-কুয়েত-বাহরাইন-কাতার-সংযুক্ত আরব আমিরাত-ওমানসহ যত প্রভুভক্ত রাজা-বাদশাহ-ডিক্টেটর আছে তাদের "প্রভুভক্তিতে" যেন ঘাটতি না হয় তা চিরতরে মুখস্থ করিয়ে রাখা যাবে এবং সেই সাথে বোঝানো যাবে "অবাধ্যতার শাস্তি" কেমন হয়; মিসর, তিউনিসিয়া ও তুরস্ককে ঠিকঠাক রাখার প্রয়াস চালানো যাবে; ভূমধ্যসাগরের আশপাশের ইউরোপীয় ও আফ্রিকার দেশসমূহে ভূ-জল-প্রাকৃতিক রাজনীতি সহজতর হবে ইত্যাদি।

---

[২৬] দেখুন: বারকাত আবুল, ২০১৩, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি; পৃ: ২-৩; নোয়াম চমস্কি; ২০০৫: Imperial Ambitions, London: Penguin Books, পৃ. ৫-৭,। ২৭ বছর বয়সী একজন মার্কিন যুবক যিনি ইরাক যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধপরবর্তীকালে "ওয়াল স্ট্রিট দখল করো" আন্দোলনে (Occupy Wall Street Movement) অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার প্রণিধানযোগ্য ভাষ্যটি এ রকম– "আমি আমেরিকার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে ইরাক যুদ্ধে গিয়েছিলাম। শেষে আবিষ্কার করলাম যে আমি আসলে রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাকটরদের মুনাফা তৈরিতে সহায়তা করলাম।" (দেখুন, চাক কলিন্স, ২০১২, 99 To 1: How Wealth Inequality is Wrecking the World and What We Can Do About It. Noida: Harper Collins Publishers India Ltd, পৃ. ২)।

সুতরাং, ১৯৬০-৭০-৮০-এর দশকে ল্যাতিন আমেরিকা হয়ে ১৯৯০-এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক হয়ে আফ্রিকার (মাথার ওপরের) লিবিয়া দখল ও ওইসব দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশংবৎ পাপেট ডিক্টেটর অথবা 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর মাধ্যমে 'নির্বাচিত' (?) সরকার বসানোর উদ্দেশ্য একটাই— "আমরা বিশ্ব প্রভু— বৈশ্বিক সম্রাট" এটা প্রমাণ করা।

লিবিয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে, তা যেকোনো মাপকাঠিতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও যুদ্ধাপরাধতুল্য। বিষয়টি এ রকম: প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ায় প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির বিরুদ্ধে মার্কিনভক্ত একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী সৃষ্টি করল এবং লিবিয়ার বেনগাজি শহরে গাদ্দাফি বাহিনীর সাথে গাদ্দাফিবিরোধী মার্কিন-সৃষ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহীরা যুদ্ধ করল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব কোনোভাবেই চাইল না যে গাদ্দাফি তার সেনাশক্তি বাড়িয়ে ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে বিদ্রোহীদের দমন করুক। এ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তাদের পশ্চিমা সমস্বার্থ গোষ্ঠী লিবিয়ায় শান্তির (!) কথা বলে তাদেরই অশুভ চতুর্ভুজের এক বাহু জাতিসংঘকে ব্যবহার করল (অন্য তিন ভুজ হলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা)। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে তারা তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে লিবিয়ার জন্য "No fly zone" (অর্থাৎ যে অঞ্চলে কোনো সামরিক বিমান যাতায়াত করতে পারবে না) সিদ্ধান্ত পাস করল এবং একই সাথে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে এটাও পাস করিয়ে নিল যে লিবিয়ার সাধারণ নিরীহ নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে পালন করবে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (অর্থাৎ তিন আদি সাম্রাজ্যবাদ)। কিন্তু বাস্তবে জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত লঙ্ঘন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৃষ্ট বিদ্রোহীরা সরাসরি সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকল আর গাদ্দাফির জন্য নির্ধারিত হলো যুদ্ধবিরতি (cease-fire)। ওই তিন শক্তি— যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য— বিদ্রোহীদের লিবিয়ার পশ্চিমে অগ্রসর হতে সহায়তা দিল এবং স্বল্প সময়েই তারা লিবিয়ার তেল উৎপাদনকারী সব অঞ্চল দখল করে ফেলল; গাদ্দাফিকে হত্যা করা হলো; সৃষ্টি হলো নতুন লিবিয়া— "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট লিবিয়া রাজতন্ত্র"।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ রাজতন্ত্রী দেশসমূহ— সৌদি আরব-কুয়েত-কাতার-ওমান-বাহরাইন-সংযুক্ত আরব আমিরাত যথেষ্ট মাত্রায় প্রভুভক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর সেবাদাসত্বে তাদের তুলনা নেই। সৌদি আরব সরকার ২০১১ সালে (৫ মার্চ) এ বলে আইন জারি করে যে ইসলামি শরিয়াহ্, সৌদি রীতি ও ঐতিহ্য সুরক্ষার

স্বার্থে সৌদি রাজত্বে কোনো ধরনের বিক্ষোভ, মিছিল, পথসভা, পথযাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট জাতীয় কোনো কিছু করা যাবে না। এবং এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রচুরসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়। কুয়েতে ছোট মাপের বিক্ষোভ মিছিল গুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাহরাইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শিয়া গোষ্ঠী ও অন্যান্যরা যখন সংখ্যালঘু সুন্নি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করে, তখন সৌদি সেনাবাহিনী তাতে হস্তক্ষেপ করে। বাহরাইন যথেষ্ট স্পর্শকাতর এলাকা (দেশ)— কারণ ওখানে একদিকে আছে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহর ঘাঁটি আর অন্যদিকে সৌদি আরবের সবচেয়ে তেলসমৃদ্ধ এলাকায় যোগাযোগের সহজতম ও সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী পথ। আর মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে ফায়দা লুটতে মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদ শুধু পারদর্শীই নয়— এ তাদের মূল নীতি-কৌশল বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতিও বটে। তালেবান, আল-কায়েদা, আইএস থেকে শুরু করে স্থানীয় জঙ্গিবাদী ফ্রন্ট সৃষ্টি এসবেরই নমুনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মহা-কৌশলের লক্ষ্যই হলো এ রকম, যা পৃথিবীর কোনো দেশেই "বৈষম্য হ্রাসকারী অসাম্প্রদায়িক উন্নয়ন দর্শন" বাস্তবায়ন হতে দেবে না। দিতে পারে না। সম্পূর্ণ বিষয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতিগত মর্মার্থ অনুধাবনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র বিশ্বপ্রভুত্ব-উদ্দিষ্ট মহা-কৌশলের বৈশিষ্ট্যসূচক রূপসমূহ জানা দরকার, যা নিম্নরূপ:

১. "আমরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) বিশ্বের মালিক" (We own the world)— সুতরাং "বিশ্বের সবকিছুই আমাদের, অন্যদের জন্য কোনো কিছুই নয়" এবং "অন্য দেশ জবরদখল করা আমাদের অধিকার, আর অন্যরা এসব করলে, তা হবে সন্ত্রাস।" [২৭]

২. 'আইনের শাসন' (rule of law) অন্যদের জন্য প্রযোজ্য আর আমাদের জন্য প্রযোজ্য 'শক্তি প্রয়োগের শাসন' (rule of force)।

৩. "যখন যেখানে ইচ্ছে আশঙ্কামূলক যুদ্ধ (preventive war at will not preemptive war) করার অধিকারটা শুধু আমাদেরই আছে"

---

[২৭] এ প্রসঙ্গে জলদস্যু নিয়ে সেইন্ট অগাস্টিনের একটা গল্প প্রণিধানযোগ্য। মহাবীর আলেকজান্দার দ্য গ্রেট একজন জলদস্যুকে সমুদ্রে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন "কোন সাহসে তুমি সমুদ্রকে উত্যক্তবিরক্ত কারছো?" কম্পিত কণ্ঠে জলদস্যুর উত্তর "কোন সাহসে তুমি সমগ্র পৃথিবীকে উত্যক্ত কোরছো?" জলদস্যু নিজ থেকেই উত্তর দিয়ে বলল– "যেহেতু আমি একটা ছোট্ট জাহাজে এসব করছি, সেহেতু আমি একজন ছিঁচকে চোরমাত্র, আর যেহেতু তুমি বিশাল এক নৌবহর নিয়ে এসব কোরেছো, সেহেতু তুমি সম্রাট।"

(আসলে "আশঙ্কামূলক বা প্রতিষেধকমূলক যুদ্ধ" আন্তর্জাতিক আইনে "যুদ্ধাপরাধ"তুল্য)।

৪. "আমাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ক্ষমতা, অবস্থান ও সম্মানহানিকর যেকোনো চ্যালেঞ্জ যেকোনো মূল্যে মোকাবিলার একমাত্র অধিকারী আমরাই; আমরাই যেকোনো দেশে যেকোনো মুহূর্তে শাসকগোষ্ঠী পরিবর্তনে একমাত্র নির্ধারক কর্তা— আমরা বিশ্বপ্রভু।"

৫. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহা-কৌশলিক লক্ষ্যের কেন্দ্রীয় উপাদান হলো— "বৈশ্বিক কাঠামোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক একচ্ছত্র প্রাধান্য-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একাঙ্গীভূত নীতি" (integrated policy to achieve military and economy supremacy of USA)। আর এই ভয়াবহ নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত হলো "অতন্দ্র প্রহরা দাও যেন কোথাও কোনো দেশে কোনো ধরনের স্বাধীন উন্নয়ন না ঘটে যায়; যেন কোনো দেশে এমন কোনো কিছু না ঘটে যায় যার ভাইরাস অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে"। এসবই কারণ, যে কারণে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্‌সের মোত্তাকিকে বলেছিলেন, "আপনাদের সুনির্দিষ্টভাবে যা করতে হবে তা হলো: বিদেশি যোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করুন এবং বিদেশি যোদ্ধাদের সীমান্ত দিয়ে আনাগোনা বন্ধ করুন।" এ ক্ষেত্রে 'বিদেশি' অর্থ 'ইরান'; আর "মার্কিন যোদ্ধা" এবং "মার্কিন সমরাস্ত্র" ইরাকে 'বিদেশি নয়' (কারণ "আমরা বিশ্বের মালিক")।[২৮] আর ঠিক একই ধরনের কথাবার্তা বলছেন রাজতন্ত্রী কাতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদানে এখনকার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন (বিষয়টি পরে বিশ্লেষণ করেছি)।

৬. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মহা-কৌশলিক নীতিটা যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তা 'সন্ত্রাস' (terror, terrorism) বিষয়ে তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃত অভিধান দেখলেই সহজেই অনুমান সম্ভব। 'সন্ত্রাস' বিষয়ে মার্কিন সরকারের অফিসিয়াল মত এ রকম: "আমাদের অথবা আমাদের ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে অন্যদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হলো চূড়ান্ত পাপ, আর অন্যদের বিরুদ্ধে আমাদের সন্ত্রাস বলে কিছু নেই, অথবা, যদি সেটা হয়েও থাকে সে ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ যথোচিত কাজ"। এসব কারণেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ-এর একজন ঊর্ধ্বতন

[২৮] নোয়াম চমস্কি, ২০১২, Making the Future, London: Penguin Books, পৃ: ২৬।

> উপদেষ্টা বলেছেন, "আমরা (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এখন একটা সাম্রাজ্য, এবং আমরা যখন কোনো একটা কিছু করি (act অর্থে), তখন আমরা আমাদের নিজস্ব এক বাস্তবতা সৃষ্টি করি। এবং যখন আপনারা বিচারবোধ থেকে ওই বাস্তবতা বোঝার চেষ্টায় অনুসন্ধানে লিপ্ত হন (study অর্থে), যা আপনারা করেন— তখনই আমরা আবার অন্য কিছু একটা করে ফেলি— অন্য আর একটা নিজস্ব বাস্তবতা সৃষ্টি করি, যা আবার আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন, এবং এভাবেই চলতে থাকে। আমরা হলাম ইতিহাসের নায়ক... আর আপনারা, আপনাদের সবাইকে আমরা কী করছি, তা বোঝার চর্চায় ব্যস্ত রাখি"।[২৯]

ইতিহাস সৃষ্টির নায়ক (!) হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যা ইচ্ছে-যেখানে ইচ্ছে-যখন ইচ্ছে তা-ই করতে পারে— এটাই তাদের মহা-দর্শনের, মহা-কৌশলের মূল নীতি। এ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর চার মৌলকৌশলিক সম্পদের (জমি, পানি, জ্বালানি-শক্তি-খনিজ, মহাকাশ) উপর একক-নিরঙ্কুশ মালিকানা এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৈশ্বিক অর্থনীতি, আর্থিক শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গণমাধ্যম, থিংক ট্যাংক (অধিকাংশই মহাচিন্তা-দুশ্চিন্তার বৃদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতির কারখানা), বৈশ্বিক সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান— এসব কিছুকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন ইচ্ছে, যেমন ইচ্ছে তেমনভাবেই ব্যবহার করবে। আগেই বলেছি এ তাদের অধিকার! একটু আগে লিবিয়া দখলের বাস্তব প্রক্রিয়ায় তারা কীভাবে-কোন কায়দায়-কোন সময়ে পৃথিবীর সব দেশের সংঘ— জাতিসংঘকে (যেখানে 'এক রাষ্ট্র এক ভোট'-এর মতো গণতন্ত্র আছে আবার পাঁচ রাষ্ট্রের "ভেটো" দেওয়ার অধিকারের মতো স্বৈরাচারী ব্যবস্থাও আছে) ব্যবহার করেছে তা বিশ্লেষণ করেছি।

এতক্ষণ যা বললাম, তা মূলত মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব উদ্ভবের বহিঃস্থ (external) কারণ-পরিণাম। বলা চলে ভূপৃষ্ঠে দৃশ্যমান ভূগর্ভস্থ বিষয়াদি। ব্যাপারটি এ রকম: আপনি খালি চোখে যা দেখছেন (অর্থাৎ বাহ্যিকতা) তা দৃশ্যমান বিষয়ের কারণ নয় (অর্থাৎ মর্মবস্তু অথবা মর্মার্থ অথবা সারবস্তু নয়)। আবার এ কথাও ঐতিহাসিক সত্য যে, যা যেভাবে যে অবস্থায় এখন সত্য তা ভবিষ্যতে ভিন্নরূপে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। এসবের নিরিখে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পরবর্তনশীল বহিঃস্থ উপাদানসংশ্লিষ্ট কারণ, স্বরূপ ও পরিণাম প্রক্ষেপণ-এর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। আরো অগ্রসর হওয়ার

---

[২৯] স্টিকানেই, জন, ২০১২, Foreword: Remaking the Future, নোয়াম চমস্কির (গ্রন্থ, ২০১২), Making the Future, London: Penguin Books, পৃ: ১১।

আগে এ বিষয়ে আমার ধারণাটা বলে রাখি ভবিষ্যতে যা নিরঙ্কুশ সত্য বলে প্রতীয়মান নাও হতে পারে।

আমার ধারণায় নিকট ভবিষ্যতে ভৌগলিকভাবে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের হোতা (এবং জঙ্গিত্ব সৃষ্টির উৎস) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ আকর্ষণস্থল হবে এশিয়া। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ববহ হবে পৃথিবীর একমাত্র ঋতু-বায়ুর মহাসমুদ্র যেখানে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে— ভারত মহাসাগর। কারণ ভারত মহাসাগর হলো: পৃথিবীর তৃতীয় জলসম্পদের এলাকা, যার চারপাশ দিয়ে অবস্থিত "গ্যাস-জ্বালানিসম্পদে সমৃদ্ধ দেশসমূহ" যে সমুদ্র দিয়ে বিশ্বের অর্ধেক সমুদ্রবাণিজ্য হয়ে থাকে, এবং যে সমুদ্র দিয়ে পৃথিবীর অর্ধেক জ্বালানি তেল পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ নিকট ভবিষ্যতে "সময়ের বাতাস" এই ভারত মহাসমুদ্রকেন্দ্রিক হতে বাধ্য।[৩০]

এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে ভৌগলিক স্থানান্তর-প্রক্রিয়া চলছে। ওই ভরকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে এশিয়ামুখী। আর বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর-শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে এশিয়ার চীন। এই চীন ফ্যাক্টরই সম্ভবত হবে নিকট ভবিষ্যতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ সব সাম্রাজ্যবাদের মাথাব্যথার অন্যতম প্রধান কারণ।

গত ১৫ বছরে (২০০০-২০১৫) চীন যথেষ্ট পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে (মোট জাতীয় উৎপাদনের মাপকাঠিতে) আবির্ভূত হয়েছে, যার কিছু নমুনা নিম্নরূপ:

১. গত ১৫ বছরের ব্যবধানে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীন বিশ্বের ষষ্ঠ অবস্থান থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছে (তবে চীনে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমবর্ধমান);

২. পূর্ব এশিয়ায় এ সময়ে (২০০০-২০১৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ভাগ ১৯.৫ শতাংশ থেকে কমে ৯.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, আর একই সময়ে চীনের ১০.২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশ (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ বাজার হারিয়েছে চীন ঠিক সে পরিমাণ বাজার সম্প্রসারণ করেছে);

[৩০] রবার্ট ড. কাপলান্, ২০১১, Monsoon. The Indian Ocean and the Future of American Power. NY: Random House Trade Paperback Edition, পৃ. ৫, ৭, ১৪-১৭।

৩. দক্ষিণ চীন সমুদ্র (South China Sea) চীনের দখলে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর মোট সমুদ্রবাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ বাণিজ্যের পথ হলো এই দক্ষিণ চীন সমুদ্র। এ সমুদ্রপথে ২০১৫ সালের হিসাবে বাণিজ্যের পরিমাণ ৫.৩ লক্ষ কোটি ডলার, অর্থাৎ ৪১৬ লক্ষ কোটি টাকার সমপরিমাণ। দক্ষিণ চীন সমুদ্র কৌশলগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ শুধু বিশাল বাণিজ্যের পথ হিসেবেই নয়, আধা ঘেরাও এ সমুদ্রটি ভারত মহাসাগরের সাথে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ স্থাপনকারী সমুদ্রপথও;

৪. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মধ্যবর্তী মালাক্কা চ্যানেল দিয়ে চীনের মোট জ্বালানি তেল আমদানির ৮০ শতাংশ পরিবহন করা হয়; মালাক্কা চ্যানেল কার্যত চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন;

৫. জলপথ, সড়কপথ ও রেলপথ যোগাযোগ উন্নয়নে চীন যা করছে তার অন্যতম হলো: (ক) চীনের সাথে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমারের যোগাযোগের জন্য রেলপথ নির্মাণ, যার ফলে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার সমুদ্রবন্দরগুলোর সাথে চীনের সরাসরি সংযুক্তি ঘটবে। এসবই এ অঞ্চলের বাণিজ্য চেহারা পাল্টে দেবে, (খ) পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের গোয়াদরে আরব সাগরের পারে চীন যে সমুদ্রবন্দর বানাচ্ছে তা এ অঞ্চলে তেল ও গ্যাস পাইপলাইনে চীনের অভিগম্যতা নিশ্চিত করবে, (গ) দক্ষিণ চীন থেকে মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য চীন সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ করছে, (ঘ) চীন নির্মাণ পরিকল্পনা করছে আফগানিস্তান-ইরান হয়ে আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরে পৌঁছার পথ।

সুতরাং বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের এখনকার হোতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সঙ্গত কারণেই চাইবে দক্ষিণ চীন সাগরকেন্দ্রিক সংঘাত সৃষ্টি করা এবং তা জিইয়ে রেখে পুরো ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাসমূহকে অস্থির রাখতে। এহেন সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে এসব অঞ্চলে গণহত্যা (genocide) তো হবেই আর একই সাথে হবে সমাজহত্যা (sociocide)। আর এ লক্ষ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে নীতি গ্রহণ করছে তার নাম "পিভট্-টু-এশিয়া" পলিসি আর যার বাস্তবায়নে সমুদ্রকৌশল হলো "A Creative Strategy for 21st Century Seapower: Forward, Engaged, Ready", সংক্ষেপে CS21R। এই নীতিকৌশলের মূল লক্ষ্য হলো: "ভারত মহাসাগর দিয়ে চীনের আমদানি-রপ্তানি যেকোনো সময়ে আটকে দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করো"— "চীন ঠেকাও"-

"চীনকে ঘেরাও করো"- "চীনকে বন্ধুহীন করো"- "ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাও" (Continue Proxy War)। আর এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দুটো কৌশল হলো: (ক) ২০২০ সাল নাগাদ মার্কিন নৌ ও বিমান শক্তির ৬০ শতাংশই এ অঞ্চলে মোতায়েন করা, এবং (খ) এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ কাজে লাগানো। আর এসব কারণেই আইএস (ইসলামিক স্টেটস) জঙ্গি রিক্রুটমেন্টে যেসব এলাকাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তার মধ্যে আছে: চীনের মুসলিম-অধ্যুষিত উইঘুর এলাকা (সেনজিয়ান প্রদেশের), রাশিয়ার মুসলিমপ্রধান চেচনিয়া (তারখান বাতিয়াশিভিলি ও আখমেদ ছাতিয়ানভ নামক দুজন যুদ্ধবাজ জেনারেলকে সিআইএ "তারকা বালক" খেতাব দিয়ে ইতিমধ্যে আইএস-এর অন্যতম প্রধান যুদ্ধবাজ বানিয়েছে), মুসলিমপ্রধান থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল (যেখানে ২০০৪ থেকে এ পর্যন্ত আনুমানিক ৬ হাজার মুসলমান ধর্মাবলম্বী নিহত হয়েছেন), ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার বিশেষ অঞ্চল, মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য, পাকিস্তান, সিরিয়া, তুরস্ক, লিবিয়া, ইয়েমেন, বাংলাদেশ ইত্যাদি। ভৌগলিক আর্থরাজনৈতিক বিচারে কৌশলগত-ভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এসব এলাকা। আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এ কৌশল থেকে এ ধরনের কোনো উপসংহারে উপনীত হওয়া ভুল হবে যে বিষয়টি "ধর্মসংশ্লিষ্ট" অথবা "ধর্ম-উদ্ভূত"। আসলে 'ধর্ম' এখানে 'কারণ' নয়। এটা মানুষের ধর্মানুভূতিকে সুবিধেমতো ব্যবহার করার কৌশলমাত্র। এ কৌশল যথেষ্ট কার্যকর কৌশল; কারণ রাজনীতিতে মানুষের ধর্মানুভূতি ব্যবহার তুলনামূলক সহজ।

এতক্ষণ যা বললাম এসবের সম্ভাব্য আশু ফল কী দাঁড়াতে পারে? আমার ধারণা, আমরা সামনে যা যা দেখতে পাবো তা হলো সম্ভবত (এসবই 'সম্ভাব্যতা-সংশ্লিষ্ট' যা হুবহু নাও হতে পারে): আইএস (IS বা Islamic States) একটা non-state actor যেটা হয়ে যেতে পারে এসআইএস (SIS) অর্থাৎ State-sponsored IS; প্রয়োজনে আবির্ভূত হতে পারে BS (Buddhist States; চীনসহ পূর্ব এশিয়ায়), HS (Hindu States), CS (Christian States) ইত্যাদি। পাশাপাশি এসবের সম্ভাব্য পরিণতি এমনও হতে পারে যে অনেক দেশে মুসলিম রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথবা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে (যেমন সৌদি আরব, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ব্রুনাই—এক বা একাধিক দেশে) আবার একই সাথে বেশ কিছু দেশে অথবা দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে মুসলিম রাজতন্ত্র (অনুরূপ কোনো শাসনব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অথবা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ জোরদার হতে পারে (যেমন চীনের উইঘুর, রাশিয়ার চেচনিয়া, থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, মিয়ানমার, ভারতের কাশ্মীর প্রভৃতি)।

প্রয়োজনে সৌদি রাজতন্ত্র যে বিলুপ্ত হবে এবং তা ওয়াহাবিজম ব্যবহার করেই হতে পারে— এসব লক্ষণ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। যেমন কয়েক দিন আগেই বাদশাহ্‌র ভ্রাতুষ্পুত্রের জায়গায় বাদশাহ্‌র ছেলেকে 'crown prince' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে; রাজপরিবার এখন দ্বিধাবিভক্ত (এ বিভক্তি "divide and rule" অর্থাৎ "বিভক্ত কর এবং শাসন কর" পদ্ধতিতে করা হয়েছে)। আর ভৌগলিক রাজনৈতিক এবং গ্যাস-তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রী কাতারকে ভালোভাবেই ধরা হয়েছে; কাতারে "সাম্রাজ্যবাদ পরিপুষ্ট" সরকার প্রতিষ্ঠা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। ইতিমধ্যে ২৩ জুন, ২০১৭ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ পরামর্শে কাতারের প্রতিবেশী চারটি দেশ— সৌদি আরব, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন— কাতারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলেছে যে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ১৩টি শর্ত প্রতিপালন না করলে আরো কঠোর-কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মার্থ অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কাতারের ওপর নিষেধাজ্ঞার ১৩টি শর্ত উল্লেখ করছি: (১) আল-জাজিরা টেলিভিশন-এর সম্প্রচার বন্ধ করতে হবে, (২) ইরানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, (৩) কাতারে তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করতে হবে, (৪) ইসলামিক ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, (৫) মার্কিন কালো তালিকাভুক্ত সংগঠনে অর্থায়ন বন্ধ করতে হবে, (৬) সন্ত্রাসের দায়ে পরোয়ানাভুক্ত আসামি হস্তান্তর করতে হবে, (৭) কাতার অর্থ দিয়েছে এমন সরকারবিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠনের তথ্য প্রকাশ করতে হবে, (৮) জিসিসি দেশগুলোর সঙ্গে নীতির মিল রেখে চলতে হবে, (৯) আল-জাজিরা, আরাবিটোয়েন্টিওয়ান এবং মিডল ইস্ট আই-এর মতো সংবাদ প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন বন্ধ করতে হবে, (১০) আইএস যেসব ক্ষতি করেছে, সেসবের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (১১) সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর ও বাহরাইনের সরকারবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে, (১২) শর্ত মেনে চলার বিষয় নিয়ে প্রথম এক বছর প্রতি মাসে নিরীক্ষা করা হবে, এবং (১৩) নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য ১০ দিনের মধ্যে সব শর্ত মানতে হবে। কাতারের প্রতি চার আরব দেশ (সৌদি আরব, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মিসর) কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা-সংবলিত এসব শর্ত প্রদানের আগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন শর্তপ্রদানকারী আরব দেশসমূহকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে "কাতারকে 'যুক্তিসংগত' ও 'বাস্তবায়নযোগ্য' শর্ত দেওয়া উচিত"। আসলে এ ধরনের কথাবার্তা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা দখলের আগে-পরে ইরাককে দিয়েছিল, লিবিয়াকে দিয়েছিল, আফগানিস্তানকেও দিয়েছিল; একই ধরনের শর্ত দিয়েছিল ল্যাতিন আমেরিকায় সরকার পরিবর্তনের আগে-পরে বহু দেশে।

কাতারের প্রতি নিষেধাজ্ঞার ১৩ শর্ত আনুষ্ঠানিকভাবে চার আরব দেশের হলেও আসলে এসব সাম্রাজ্যবাদেরই তৃতীয় বিশ্বের মৌলকৌশলিক সম্পদ দখলের খেলামাত্র। সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাতারে ব্যাপক অস্ত্র ব্যবসা করবে, যদিও কাতারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই অভিযোগ "কাতার আইএস-কে অস্ত্র-অর্থ জোগান দেয়"। এখানে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কাতার নিয়ে হোতা সম্রাজ্যবাদ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে মহা খেলায় উন্মত্ত তা ইতিমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ নম্বর পয়েন্টে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছি।

ওপরে যা বললাম এসব তো গেল সম্ভাবনার এক দিক— হতাশাজনক দিক। এসবের পাশাপাশি আশাব্যঞ্জক দিকও আছে কারণ "ইতিহাস হামাগুড়ি দেয় না, ইতিহাস লাফিয়ে চলে" (History does not crawl, it jumps)। 'হতাশা' থেকে 'আশার' কথা বলছি এ জন্য যে বৈশ্বিক অবস্থা কেমন রূপ নেবে:

১. **যদি** এশিয়ার কোনো কোনো অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ দেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অধিকতর প্রগতিশীল শক্তি রাষ্ট্রপরিচালনে নেতৃত্ব দেয়,
২. **যদি** এ ধরনের প্রগতিশীল নেতৃত্ব জোট বাঁধে,
৩. **যদি** আফ্রিকা এবং/অথবা ল্যাতিন আমরিকায় প্রগতিশীল শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহন করে,
৪. **যদি** এরা সবাই মিলে এমন এক বৈশ্বিক জোট সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যারা বৈশ্বিক অন্যায্যতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়বে, যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে,
৫. **যদি** চীন ও রাশিয়া কোনো একসময় ঐক্যবদ্ধভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নেয়,
৬. **যদি** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রগতিশীল কোনো পরিবর্তন ঘটে।

এতক্ষণ যেসব 'যদি'-র কথা বললাম, এসব "যদি-গুচ্ছ" অযৌক্তিক প্রস্তাব বা অমূলক ভাবনা নয়। আর এসব 'যদি' গুচ্ছের কোনোটি (অথবা একাধিক) যদি সত্যি সত্যিই বাস্তব রূপ নেয়, সে ক্ষেত্রে মার্কিন হোতা সাম্রাজ্যবাদ চুপ করে বসে থাকবে— এ ভাবনাও অমূলক। তারা নীতি-কৌশল পাল্টাবে, যা তারা অতীতে বহুবার করেছে। আর পরিবর্তিত নীতি-কৌশল যা-ই হোক না কেন তার ভিত্তিমূল থাকবে "মনরো মতবাদ" (পরিবর্তিত, সম্প্রসারিত) এবং "থুকোডাইডেস প্রিন্সিপ্যাল" (অর্থাৎ "আমরাই বিশ্বপ্রভু")-এর সম্মিলন। তারপর কী হবে? সে কথা ইতিহাসই বলবে ("History does not crawl, it jumps")। আবার যদি

খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এমন কোনো জনকল্যাণকামী পরিবর্তন ঘটে, যা এ মুহূর্তে আমাদের চিন্তার বাইরে কিন্তু ঘটে গেল— তাহলে কী হবে? পরিবর্তন সম্ভাবনার এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী করার আছে? একদিকে যেমন মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের বহিঃস্থ উপাদান— প্রশমিত করার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক যেসব শক্তি কাজ করে (করছে বা করবে) তার সাথে একাত্ম হওয়া, আর অন্যদিকে অতিগুরুত্বপূর্ণ যা করার আছে এবং অবশ্যই সম্ভব তা হলো অভ্যন্তরীণ উপাদানে হাত দেওয়া— অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান অসমতা-বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে দেশের মধ্যে সক্রিয়-পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানজাগতিক আলোকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। এসবের বিকল্প নেই। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ রাজনৈতিক অর্থনীতির এসব বিষয় পরবর্তী অধ্যায়সমূহে উত্থাপন করেছি।

যেহেতু আমি মনে করি যে, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উদ্ভব ও বিকাশে অভ্যন্তরীণ কারণ ও বিষয়াদি (internal causes and factors) গুরুত্বপূর্ণ; তবে প্রধানতম কারণ নয়— "কারণের বাহ্যিকতা-সদৃশ" (দর্শনের ভাষায় বলা যায় "appearance of things"); আর বহিঃস্থ কারণ (external causes) অর্থাৎ একমেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের হোতা— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্বিক মৌলকৌশলিক চার সম্পদের (জমি, জলা, জ্বালানি-শক্তি-খনিজ, আকাশ-মহাকাশ) ওপর একচ্ছত্র মালিকানা-কর্তৃত্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই মূল কারণ (যাকে দর্শনের ভাষায় বলা চলে "essence of things"); সেহেতু মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উদ্ভব-বিকাশসংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসমূহের বহুমাত্রিক দিক পরবর্তী অধ্যায়সমূহে (অধ্যায় ৫ থেকে ১১ পর্যন্ত) বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি।

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আসার আগে এ গ্রন্থে আমার উপসংহারটি (বলতে পারেন আমার তত্ত্বকথা) স্পষ্ট করে বলে রাখি, কারণ এটাই আমার মূল বক্তব্য এবং যে বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষকেরা হয় একমত নন অথবা যে বক্তব্য তারা এড়িয়ে চলেন অথবা যে বক্তব্য "মনে মনে ধারণ করলেও অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ করেন না"। আমার মূল উপসংহারটি (বলতে পারেন 'অনুসিদ্ধান্ত' অথবা 'তত্ত্বকথা', যে নামেই ডাকেন আমার মূল উপসংহার-এর মর্মকথা অপরিবর্তিত থাকবে) এ রকম:

> **আজকের বিশ্ব (বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পতনের পরবর্তীকালে) মূলত একটি একমেরুর বিশ্ব (unipolar world), যা একটি একক**

সাম্রাজ্যবাদী **(unitarian system of imperialism)** ব্যবস্থার মাধ্যমে চালিত হচ্ছে; যে সাম্রাজ্যবাদের হোতা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদ। এই হোতা সাম্রাজ্যবাদ সব দেশে-সব ধরনের অভ্যন্তরীণ মৌল-উপাদান-কারণসমূহকে তাঁর অধীনস্থ করেছে। আর এসব মিলেমিশে বৈশ্বিক পর্যায়ে এখন এমন একটা ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে বহিঃস্থ **(external)** এবং অভ্যন্তরীণ **(internal)** বলে তেমন কোনো বিভাজন দাঁড় করানো যৌক্তিক নয়; এ হলো একই বৈশ্বিক কাঠামোর অন্তঃস্থ দুটো রূপমাত্র, যেখানে আপাতদৃষ্টির অভ্যন্তরীণ রূপটি **(internal form)** আসলে বহিঃস্থ শক্তির **(external force)** অধীনস্থ-দাসানুগত সত্তামাত্র **(subjugated form)**। আর এ ক্ষেত্রে প্রধানতম শক্তিটি হলো বহিঃস্থ শক্তি— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যার মূল সাম্রাজ্যবিস্তারিক লক্ষ্য হলো বিশ্বের চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদে নিরঙ্কুশ মালিকানা এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা— (১) জমিসম্পদ, (২) জলসম্পদ, (৩) জ্বালানি-শক্তি-খনিজসম্পদ এবং (৪) আকাশ-মহাকাশসম্পদ। আর একক সাম্রাজ্যবাদী বৈশ্বিক এই প্রক্রিয়া জিইয়ে রাখতে ও বিকশিত করতে হোতা সাম্রাজ্যবাদ যত ধরনের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ সম্ভব তা করবে — সেটা হতে পারে 'ধর্ম', হতে পারে "রাষ্ট্রকাঠামোর ও ক্ষমতার পরিবর্তন-উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ড", হতে পারে "আন্তর্জাতিক বিধিবিধান পরিবর্তন", হতে পারে "জাতিসংঘের রিফর্ম", হতে পারে "আঞ্চলিক জোট গঠন অথবা জোট ভেঙ্গে দেওয়া", হতে পারে "গণমাধ্যমে আরো আধিপত্য বিস্তার", হতে পারে কোথাও কোথাও "যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি" অথবা সরাসরি "যুদ্ধ করা", হতে পারে একই সাথে এসবের একাধিক কর্মযজ্ঞ চর্চা। এ তত্ত্বকথা থেকে মনে হতে পারে যে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ এবং সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব বিকাশে অভ্যন্তরীণ উপাদান গৌণ ভূমিকা পালন করে। তা নাও হতে পারে। যেমন ধরুন সৌদি রাজতন্ত্র জিইয়ে রাখতে সৌদি রাষ্ট্রশক্তি শুধু ধর্মকেই নয় প্রয়োজনে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ তোষণ-পোষণ করতে পারে, আবার সেটা নাও করতে পারে; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিরা বৈশ্বিক চার মৌলকৌশলিক সম্পদে তাদের একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যদি মনে করে রাজতন্ত্রের পতন হওয়াটা জরুরি হয়ে পরেছে, তখন

কী হবে? হয়তো বা উভয় পক্ষই একই ধর্মকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহার করবে অথবা দুই পক্ষ দুই ধর্মকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করবে অথবা বড় মাপের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা হবে, অথবা অভ্যুত্থান সংঘটিত করে সরকার উৎখাত করে "ভালো আপেল" প্রতিষ্ঠা করবে ইত্যাদি। একই কথা প্রযোজ্য অন্যান্য অনেক দেশের ক্ষেত্রে, (যেসবের যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়) যখন রাষ্ট্রশক্তি এমনকি আপাতদৃষ্টিতে 'গণতন্ত্রী' এবং 'অসাম্প্রদায়িকতা'র কথা বলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে 'ধর্ম'কে ব্যবহার করে; এসবই তো আমরা এখন খোলা চোখে দেখি যখন ধর্মনির্বিশেষে মানুষের ধর্মানুভূতিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে (যা অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে)। এতক্ষণ যা বললাম সেসব থেকে আমার মূল কথার কোনো ব্যত্যয় হবে না: অর্থাৎ শেকড়ের কারণ হলো শোষণ, মানুষে মানুষে শোষণব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে বিশ্বের চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদের ওপরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে একক নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। আমি খুব ভালোই অবগত আছি যে, যারা ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে কথা বলেন, জ্ঞান চর্চা করেন, তাদের অধিকাংশই আমি এতক্ষণ যা বললাম সেসবের সাথে একমত পোষণ করেন না। কারণ বেশির ভাগই মনে করেন, বিষয়টি একান্তই অভ্যন্তরীণ অথবা মনে করেন বহিঃস্থ বিষয়াদি মুখ্য নয়। আসলে এই "প্রলেপপন্থী"-রা মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মার্থ অনুধাবনে অপারগ।

৯০। বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির

অধ্যায় ৫

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব: ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক

"আপনি যখনই দেখবেন যে আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠের দিকে ঝুঁকছেন, তখনই একটু স্থির হন এবং ভাবুন।"
মার্ক টোয়েন, ১৮৩৫-১৯১০

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি-ইতিহাস নিয়ে ঐতিহাসিকেরা যা কিছু লিখেছেন তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ এবং নয় তা যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক। ভূগোল, নদীর প্রবাহ পরিবর্তন, কৃষিসভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ, ভূমি খাজনার গতি-প্রকৃতি, ঘটনাপঞ্জির কালানুক্রমিক গ্রন্থনা, হিন্দু রাজা ও মুসলমান সম্রাটদের রাজ্যনীতি— পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ইতিহাস রচনায় এসব তথ্যের নির্মোহ বিশ্লেষণ নেই বললেই চলে। সংশ্লিষ্ট ইতিহাস রচনার তত্ত্ব এদিক থেকে যথেষ্ট অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ইতিহাসে মূলত চার ধারার বা চার ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়: (ধারা ১) অভিবাসন (immigration), (ধারা ২) তরবারি (sword), (ধারা ৩) পৃষ্ঠপোষকতা (patronage) ও (ধারা ৪) সামাজিক মুক্তি (social liberation)। পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে প্রথম ধারা বলে যে এসব ঘটেছে প্রধানত অভিবাসীদের মাধ্যমে; দ্বিতীয় ধারার প্রবক্তারা বলেন, এসবে মূল ভূমিকায় ছিল "তরবারি"; তৃতীয় ধারার প্রবক্তারা বলেন, এসবে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন সম্রাটরা-সাম্রাজ্যপতিরা, যারা ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে 'পৃষ্ঠপোষকতা'-র বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন; আর সর্বশেষ চতুর্থ ধারার প্রবক্তারা বলেন, এসবে মূল ভূমিকা পালন করেছে "সামাজিক মুক্তির" বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি-উপায়। কেউ কেউ আবার একাধিক ধারার সমন্বয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আসলে পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশে উল্লিখিত চার ধরনের (বা ধারার) কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ নয়; কারণ অভিবাসিত কারা, কখন-কোন সময়ে-কী কারণে অভিবাসন হলো (?); তরবারির শক্তি কখন কোথায় এ দেশে ইসলামকে গণধর্মে (mass religion) রূপান্তর ঘটাল (?); এমনকি সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবও তো জোরজবরদস্তি উৎসাহ দেননি; আর মুঘল সম্রাট আকবর বৈষম্যমূলক খাজনা বন্ধ করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন আবার দ্বীন-ই-এলাহি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেছিলেন ইত্যাদি।

ওপরে যা বললাম অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভবে 'অভিবাসন', 'তরবারি', 'পৃষ্ঠপোষকতা' অথবা 'সামাজিক মুক্তি'— এসবের কোনোটিই নিয়ামক ভূমিকা রাখেনি; আর নিচে বলার চেষ্টা করেছি যে তাহলে পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্ম কীভাবে গণধর্মে রূপান্তরিত হলো? আমার এসব বক্তব্য থেকে ধরে নেওয়া যাবে না এসব কথা শতভাগ সত্য। কারণ ইতিহাসে দেখা যায় যে ধর্মনির্বিশেষে প্রায় সব ধর্মকেই কখনো না কখনো শক্তি প্রদর্শনে কাজে লাগানো হয়েছে— তা দেশ দখল হোক অথবা ছোট ছোট রাজ্য দখল হোক অথবা অন্যান্য বহুবিধ কারণে। খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী যোদ্ধারা ক্রুসেড করেছে, বৌদ্ধরা ক্ষেত্রমতে নির্মমতা প্রদর্শন করেছে, মুসলমানেরা অন্য দেশ জয়ে সশস্ত্র জিহাদ করেছে, ইহুদিরা হত্যাযজ্ঞ করেছে, হিন্দুরা পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকেনি, আর অন্য প্রায় সব ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী ও নৃগোষ্ঠীর মানুষেরাও পিছিয়ে থাকেনি; তারা তাদের সাথে যারা সহমত পোষণ করে না তাদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নির্মূলের চেষ্টা করেছে। এসবই নির্মোহ ইতিহাস।

ইতিহাস বলে যে ভারতবর্ষে ইসলামে ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে তলোয়ার, ক্রীতদাসকরণ, ধর্মান্তরিত না হওয়ায় কর অথবা বশ্যতা কর ('জিজিয়া' কর) ইত্যাদি; ভারতীয় সুফিদের মধ্যে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া ছিলেন তুলনামূলক অগোঁড়া ও উদারপন্থী; বাংলার সুফি সাধক শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী (মৃত্যু ১২২৬ অথবা ১২৪৪) ও নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য শাহ জালাল (মৃত্যু ১৩৪৭)— এদের সবাই যুদ্ধ করেছেন; তবে এদের দ্বারা অন্যদের ধর্মান্তরকরণ পদ্ধতি হয় "অজ্ঞাত" না হয় "অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ"।[৩১]

[৩১] এসব ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, এম এ খান, ২০০৯, Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery (বঙ্গানুবাদ, ২০১০, জিহাদ: জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার, ঢাকা ব-দ্বীপ প্রকাশন; পৃ. ১১৯-২০২); এন লেভটজিয়ন (সম্পাদিত), ১৯৭৮, Conversion of Islam, পৃ. ১৮, ৩৩; কে এস লাল ১৯৯৪, Muslim Slave System in Medieval India, পৃ. ১৮-২০, ৭৩, ৯৩; Milton. G, 2008, White Gold, পৃ. ১২০; আর্নল্ড টি ডাব্লিউ, ১৮৯৬, The Preaching of Islam, পৃ. ৩৬৫; ট্রিটন

এ ক্ষেত্রে যে সত্য না বললেই নয়, তা হলো ধর্মনির্বিশেষে কোনো ধর্মই একশিলা (monolithic) নয়। যেমন হিন্দু-ধর্মের কথা বললেই বর্ণপ্রথার (caste system) অন্তর্গত বহু স্তরবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈষ্ণব, শূদ্র, নমঃশূদ্রসহ অস্পৃশ্যদের বিষয় এসে যায়; খ্রিস্টান ধর্মের কথা বললেই ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টেসহ বহু ধারা-উপধারার কথা আসে; বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনেক মত-পথসহ স্তরের কথা এসে যায়, তেমনি ইসলাম ধর্মও একশিলা-একীভূত (monolithic) কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম ধর্মে প্রথমেই সুন্নি-শিয়া বিভাজন স্পষ্ট, আর তারপরে আছে বিভিন্ন ধারা-উপধারা। এসব ধারা উপধারার মধ্যে আছে আহমেদিয়া, খারিজি, হানাফি, হানবালি, সাফরি, ইসমাঈলি, জাফরি, নিজারি, মুস্তাফি, তাইয়িবি, আলায়ি, আলেভি, ইবাদায়িহ ইত্যাদি; আবার সুফিরাও বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন না। আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই তা হলো স্পষ্ট করা যে, ইসলামে "কোনো ধর্মভেদ নীতি নেই", ইসলামে "ভাই ভাই নীতি" অথবা "সমমর্যাদার নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত", এবং ইসলাম ধর্মে "বর্ণভিত্তি বলে কিছু নেই"— এসব বক্তব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ। মুসলমানদের মধ্যে আশরাফ বা শারিফ (অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম) এবং আতরাফ বা আজলাফ (অর্থাৎ নিম্নবংশে জন্ম)— এ বিভাজন স্পষ্ট বিরাজমান। এসব ভেদনীতি ইসলাম ধর্মের উদ্ভবসূত্রীয় না কি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে সৃষ্ট— এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে এ কথা সত্য যে আশরাফরা আতরাফদের নিচু শ্রেণির মানুষ মনে করে এবং আতরাফরা আশরাফদের উঁচু শ্রেণির মানুষ মনে করে। মুসলমানদের মধ্যে উঁচু-নিচুর এ ভেদাভেদ যে ছিল তার উদাহরণের কমতি নেই। তবে এ ভেদাভেদের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ঢাকা জেলার মুসলমানদের যে বিভাজন করা হয়েছে সেটি। সেখানে বলা হচ্ছে, ১৮৭২ সালে ঢাকা জেলায় মোট মুসলমানের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ১৩১ জন, যার মধ্যে জোলা ১০,৪৬৪ জন, মোঘল ১৭ জন, পাঠান ১,১৩৪ জন, সৈয়দ ৪৪৫ জন,

---

এ এস, ১৯৭০, The Caliphs and their Non-Muslim subjects, পৃ. ২২৭; ইলিয়ট এইচ এম ও জে ডাওসন, The History of Inida as Told by Its Own Historians, খণ্ড ১-৮; গিব এইচ এ আর, ২০০৪, Ibn Battutah: Travels in Asia and Africa, পৃ. ৩৩-৩৪; কে এ, ১৯৯১, The Life and Times of Shaikh Nizamuddin Auliya, পৃ. ১৩৮; রিজভি কে এ এ, ১৯৭৮, A History of Sufism in India, খণ্ড ১, পৃ. ২০১; শর্মা এস এস ২০০৪, Caliphs and Sultans: Religious Ideology and Political Praxis. New Delhi: Rupa & Co.; দ্য-লাইমা ও লিয়ারি, ১৯২৩, Islam at the Cross Roads, পৃ. ৮।

শেখ ১৩,২৪৭ জন এবং অন্যান্য ১০, ২৪,৮২৪ জন।[৩২] আমার এসব কথা বলার পেছনে দুটো অর্থ আছে; প্রথমত, সমাজ যেখানে শ্রেণিতে বিভক্ত, সেখানে ধর্ম (তা যে ধর্মই হোক না কেন) এই শ্রেণিবিভক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম নয়; দ্বিতীয়ত, "পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক" (যেটা এই অধ্যায়ের শিরোনাম)— বিষয়টি নিঃশর্ত নয়। এবং এ নিয়ে সন্দেহ অমূলক নয়।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের মূল প্রচারকেরা অর্থাৎ সুফি-সাধক-ওলামারা শত শত বছর ধরে কোনো উগ্র ধর্মীয় আচার প্রচার করেননি; এমনকি তারা তা সমর্থনও করেননি। উল্টো তারা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রচারের স্থানটিকে (যেমন মাজার, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি) রেখেছিলেন আয়তনে ছোট, আর বড় করেছিলেন পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজের এলাকা। পশ্চাৎপদ এলাকার এসব বন-জঙ্গল তারা পেয়েছিলেন অনুদান হিসেবে। অর্থাৎ তারা মানুষকে সম্পৃক্ত করেছিলেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে— মূলত কৃষিকাজে। সেই সাথে সুফিরা যত না অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে। "আশরাফুল মাখলুকাতের সেবাই ধর্ম"— এ তাদেরই কথা। আশরাফুল মাখলুকাত-এর অর্থ 'মানুষ'— ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মানুষ। সুফিরা কখনো কোথাও হিন্দুদের মন্দির-উপাসনালয় ভেঙ্গেছেন— এমন কোনো নজির নেই।

> সুফি-ওলামারা ইসলাম ধর্মের মতাদর্শের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন (অবশ্য নগরকেন্দ্রিক আশরাফতত্ত্বের বিশ্লেষণ ভিন্ন)। সুফি সাধকদের লিখিত বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে "আল্লাহ্ আদমকে সন্দ্বীপে প্রেরণ করলেন। জিবরাইল তাকে আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় মূল কাবাঘর নির্মাণের জন্য যেতে বললেন। কাবা নির্মাণের পরে জিবরাইল তাকে একটি লাঙ্গল, একটি জোয়াল, এক জোড়া চাষের বলদ, কিছু শস্যদানা দিয়ে বললেন— আল্লাহর নির্দেশে কৃষিকাজই হবে তোমার নিয়তি (destiny)। আদম শস্যদানা বপন করলেন, শস্য ফলালেন, মাড়াই করলেন, শস্য থেকে রুটি বানালেন"।[৩৩]

[৩২] বিস্তরিত দেখুন, বেভারলি এইচ, ১৮৭২, Report on the Census of Bengal 1872, Calcutta: H. Beverley, 1872; জামান মুহম্মদ শহীদ উজ, ২০১৩, উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ: সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ, ঢাকা: গদ্যপদ্য, পৃ. ৪৯।

[৩৩] রিচার্ড ইটন, ১৯৯৬, "The Rise of Islam and the Bengal Frontier-1206-1760"

অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশে তরবারি, অভিবাসন অথবা পৃষ্ঠপোষকতার তেমন জোরালো ভূমিকা নেই। এখানে ইসলাম বিকশিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে। এ দেশে ইসলাম ধর্মের সুফি সাধকসহ অন্যান্য অনেক ধর্ম প্রচারক সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদবিরোধী লড়াই-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন; এমনকি নেতৃত্বও দিয়েছেন। এবং সুফি-ওলামারা ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক যুক্তি ব্যবহার করেই তা করেছেন। সুতরাং বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে যে উদ্ভবসূত্রে এ দেশে ইসলাম মানবতাবাদী, উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক।

এতক্ষণ যা বললাম তা থেকে আমার ধারণা এ দেশের মুসলমানেরা ঐতিহাসিকভাবেই এক পজিটিভ ডিএনএর বাহক, যা উদ্ভবসূত্রে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়। আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের এই পজিটিভ ডিএনএর কারণেই শুধু অভ্যন্তরীণ শক্তির ভিত্তিতে সশস্ত্র জঙ্গিত্ব ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে না। আমার পজিটিভ ডিএনএ-সংশ্লিষ্ট এ ধারণা আরো বেশি সঠিক হতে পারে এ জন্যও যে প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ মানবতাবাদী; মানবকল্যাণ মানুষ মাত্রেই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য; জন্মসূত্রে মানুষ স্বার্থপর নয়।

অবশ্য ইসলাম ধর্মের উদ্ভবসূত্রের যে পজিটিভ ডিএনএ নিয়ে বললাম বিভিন্ন কারণেই তা নিয়ে আত্মতুষ্ট হওয়া সমীচীন হবে না। এ নিয়ে আত্মতুষ্ট হওয়া সমীচীন নয় এ জন্য যে আফগানিস্তান, ইরান, পাকিস্তান, মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর— এসব অঞ্চলেও তো সুফি-মানবতাবাদ প্রবল শক্তিমান ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব সুফি মানবতাবাদকে নিশ্চিহ্ন করে ক্ষমতা দখল করেছে। ইসলাম ধর্মের উল্লিখিত পজিটিভ ডিএনএ নিয়ে আত্মতুষ্টির কারণ নেই এ জন্যও যে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ বিকশিত হওয়ার পেছনে দেশজ কারণের পাশাপাশি বৈশ্বিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক কারণ বিদ্যমান (যা ইতিমধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং পরেও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হবে)।

অধ্যায় ৬

"উদারনৈতিক ইসলাম" থেকে "রাজনৈতিক ইসলাম": সমকালীন পশ্চাৎমুখী রূপান্তর

"কোনো জাতি যখন মনঃস্তাত্ত্বিক পরাজয়ের শিকার হয়,
তখন ওই জাতির বিলুপ্তি ঘটে।"
ইবনে খালদুন, ১৩৩২-১৪০৬

উদ্ভবসূত্রে যখন পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্ম তুলনামূলক বিচারে উদারনৈতিক, মানবিক, ও অসাম্প্রদায়িক তখন এমন কী ঘটল যার ফলে তা মৌলবাদী জঙ্গিত্বে রূপ নিল? পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের এ পশ্চাৎমুখী রূপান্তর কেন ঘটল? আমার মতে, পশ্চাৎমুখী এ রূপান্তরে পাঁচটি বড় মাপের ঘটনা দায়ী (যা আমি "তিন-বিপর্যয়কাল" হিসেবে দেখি)। পশ্চাৎমুখী রূপান্তরের বড় মাপের ঘটনা পাঁচটি হলো যথাক্রমে:

১. ১৯৪৭-এ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি।

২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে সেনানায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূল স্তম্ভ থেকে "ধর্মনিরপেক্ষতা" (secularism) স্তম্ভটি সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং পরবর্তীকালে সেনাশাসনামলেই "ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম" হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। (১৯৭৭-এ সেনাশাসক জিয়াউর রহমান কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে "ধর্মনিরপেক্ষতা"-সম্পর্কিত ধারা বাতিল, ১৯৮১-তে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ-এর ক্ষমতা দখল এবং ১৯৮৮-তে তারই দ্বারা সংবিধানে "ইসলাম হবে রাষ্ট্রধর্ম" সংযোজন)। ২০১১ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত

'ধর্মনিরপেক্ষতা" ধারা পুনর্বাসন করে (তবে জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ-এর "বিসমিল্লাহ্ হির রাহমানির রাহিম' সহ "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" বহাল রেখে)।

৩. মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক দর্শনভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালন।

৪. ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন-সংস্থা-সমিতি গঠন-এর বৈধতা দেওয়া।

৫. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি না দিতে পারা।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে প্রথম বড় মাপের পশ্চাৎমুখী রূপান্তর (বিপর্যয়) ঘটেছে গত শতাব্দীতে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এল— অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আর হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান। সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজনে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক ধারার সুফি-ওলামারা বাধা দিতে পারলেন না। সাংগঠনিকভাবে এ শক্তি তাদের ছিল না। মূল ধারার বিপরীতে পশ্চাৎমুখী এ রূপান্তর (regressive transformation) হঠাৎ ঘটেনি— এর পেছনে জঙ্গিবাদী সুনির্দিষ্ট ধারা (যেমন ওহাবি ইত্যাদি) কাজ করেছে এবং একই সাথে কাজ করছে ঔপনিবেশিক প্রভুদের "ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত কর ও শাসন-শোষণ করা নীতি"। ফলে পশ্চাৎমুখী রূপান্তরের এ প্রক্রিয়া ইসলাম ধর্মের মানবকল্যাণকামী সুফি-ওলামা চেতনার এক ঋণাত্মক উত্তরণ ঘটল— যা ছিল উদারনৈতিক-মানবতাবাদী, তা রূপান্তরিত হলো সংকীর্ণ জঙ্গিত্বে; উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা এবং ধর্মের নামে ওই ক্ষমতা ব্যবহার করা। অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে এ দেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশে এক নতুন প্রবণতা সৃষ্টি হলো: কৃষি উন্নয়নের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা থেকে ধর্মভিত্তিক সশস্ত্র মৌলবাদ ধারণাপুষ্ট রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রবণতা। পাকিস্তানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার এ ধারা এতই প্রবল হলো যে ১৯৬৫-এ পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সব হিন্দুকে হিন্দুস্থানি বানাতে তৎকালীন সামন্ত-সেনা শাসকদের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও লাগেনি— "জরুরি অবস্থায়" জারি করল "শত্রু সম্পত্তি আইন" (Enemy Property Act under Emergency) যেখানে হিন্দুমাত্রই শত্রু। অর্থাৎ শুরু হয় ইসলাম ধর্মের নামে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ অন্য সব অমুসলিমকে "অ-জনগণকরণ" (unpeopling) প্রক্রিয়া। রাষ্ট্র-পরিতোষিত ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার এমন নমুনা পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

"শত্রু সম্পত্তি আইন" জারির মাধ্যমে রাষ্ট্র-পরিতোষিত ইসলামভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার এ নমুনা সাধারণ এবং সাময়িক কোনো বিষয় ছিল না। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করার পরেও 'ভিন্ন নামে' "শত্রু সম্পত্তি আইন" বলবৎ ছিল। এসব ছিল একদিকে অমুসলিমদের "অ-জনগণকরণ" প্রক্রিয়ার প্রারম্ভকাল আর ভবিষ্যতে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ সৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ। এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যের সাথে সরাসরি যোগসূত্র আছে বিধায় বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

পাকিস্তানের সামন্ত-সেনাশাসকেরা জন্মসূত্রেই ছিলেন বাংলা ভাষা ও বাঙালিবিরোধী। যেকোনো কায়দায় ব্যাপক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্পদচ্যুত, ভূমিচ্যুত, দেশচ্যুত করা গেলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করে শাসন করা সোজা হবে— এ ভাবনা থেকেই পাকিস্তানি সেনা শাসকেরা কালক্ষেপণ না করে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে "শত্রু সম্পত্তি আইন" (Enemy Property Act) জারি করে। যে আইনের মূল মন্ত্র ছিল: হিন্দুস্থান = শত্রুস্থান, ও হিন্দু = শত্রু। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান, মানবাধিকার, জন্মসূত্রে মালিকানার বিধান— এসবের পরিপন্থী হলেও শত্রু সম্পত্তি আইনটি কিন্তু স্বাধীনতাপরবর্তীকালে বাতিল ঘোষিত হয়নি; নাম পরিবর্তন হয়েছে মাত্র— নতুন নাম, "অর্পিত সম্পত্তি আইন" (Vested Property Act)। বিষয়টি অন্যের জমি-সম্পত্তি বেদখলের চেয়েও অনেক গভীরের— একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ১২ লক্ষ হিন্দুখানার ৫০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মোট হিন্দুখানার ৪০ শতাংশ)[৩৪]। এই আইনে ভূমিচ্যুতির পরিমাণ ২৬ লক্ষ একর, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার (আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগের তুলনায়) ৫৩ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত খানার ৭৮ শতাংশ হারিয়েছেন কৃষি জমি, ৬০ শতাংশ হারিয়েছেন বসতভিটা ও ২০ শতাংশ হারিয়েছেন অন্যান্য ভূসম্পত্তি। অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে ভূমিচ্যুতির পাশাপাশি ব্যাপক হারে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদচ্যুতিও (movable assets) ঘটেছে। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগের তুলনায় বর্তমানে

[৩৪] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত ও অন্যান্য, (২০০৮a). Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property. Dhaka: Pathak Shamabesh. আবুল বারকাত ও অন্যান্য, (২০০০c), An Inquiry into the Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act: Framework for a Realistic Solution, PRIP Trust: Dhaka.

এ সম্পদ প্রায় ৬.৫ গুণ হ্রাস পেয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি আইনে ভূমি-জলা ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ হারানোর আর্থিক ক্ষতির মোট মূল্যমান ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজার মূল্য হবে কমপক্ষে ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট জাতীয় উৎপাদনের আনুমানিক ৬৩ শতাংশের সমান অথবা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৪ গুণেরও বেশি। আর্থিক এ ক্ষতি মোট প্রকৃত ক্ষতির একটি অংশমাত্র। আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারীরিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন, মায়ের পুত্রশোক আর সন্তানের মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, মানবসম্পদ বিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা— এসব ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান অসীম, যা নির্ধারণ করা কোনো হিসাববিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয়।

অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে ১২ লক্ষ হিন্দুখানা ২৬ লক্ষ একর ভূসম্পত্তি হারিয়েছে— এ কথা সত্য। তবে তা আংশিক সত্য। আসল ক্ষতি অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত এবং গভীর। আসলে সৃষ্টি হয়েছে নিরন্তর বঞ্চনার এক ফাঁদ বা চক্র (deprivation- trap, deprivation-cycle)। যে বঞ্চনা প্রধানত পাঁচ ধরনের বঞ্চনার জটিল এক মিথস্ক্রিয়া যা ক্রমবর্ধমান। পাঁচ ধরনের এ বঞ্চনা হলো ক্ষমতাহীনতা (powerlessness), ভঙ্গুরতা/মর্মাঘাত (vulnerability), শারীরিক দুর্দশা (physical weaknesses), দারিদ্র্য (poverty), এবং নিঃসঙ্গতা/বিচ্ছিন্নতা (isolation)।

প্রধানত শত্রু সম্পত্তি আইন বলবৎ করা এবং সংশ্লিষ্ট সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষসহ বহু ধরনের বঞ্চনা-বিপর্যয়ের কারণে এবং পরবর্তীকালে ওই একই আইন ভিন্ন নামে (অর্পিত সম্পত্তি নামে) কার্যকর থাকার ফলে বিপুলসংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ অনিচ্ছায় দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে "নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা" (missing hindu population)। এই "নিরুদ্দিষ্ট হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষেরা" হলেন সরাসরি "অ-জনগণ" (un-people), আর যারা এখনো নিরুদ্দিষ্ট হননি— তারা 'অ-জনগণ' হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছেন মাত্র। আমার হিসেবে প্রায় পাঁচ দশকে (১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত) আনুমানিক ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ গড়ে বছরে বাধ্য হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন। অন্য কথায়, শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন-উদ্ভূত বঞ্চনার মাত্রা এমনই যে ১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষকে

দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়কালে প্রতিদিন গড়ে নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু-ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা সমান নয়: যেমন ১৯৬৪-১৯৭১ (পাকিস্তানের শেষ ৭ বছর) সময়কালে প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৭০৫ জন, ১৯৭১-১৯৮১-এ প্রতিদিন ৫২১ জন, ১৯৮১-১৯৯১-এ প্রতিদিন ৪৩৮ জন, ১৯৯১-২০০১-এ প্রতিদিন ৭৬৭ জন, আর ২০০১-২০১২-এ প্রতিদিন ৬৭৪ জন। অর্থাৎ শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন-উদ্ভূত এ নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে এখন থেকে দুই-তিন দশক পরে এ দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনুষ্য-বঞ্চনার অথবা মানুষের "হারিয়ে যাওয়ার" অথবা মানুষের "বাষ্পীভূত হওয়ার" ('unpeopling', অথবা 'vaporization' অথবা 'extermination' অর্থে) এর চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ আর কি হতে পারে? এসবই কিন্তু সমাজের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকীকরণের রূপমাত্র, যা ক্রমবর্ধমান, এবং যারই ভিত্তিতে "মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ" ভেতর থেকে প্রভাবক শক্তির জোগান পেয়ে থাকে।

গত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) বিভিন্ন সরকারের আমলে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা ছিল বিভিন্ন। এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৬০ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ৭৫ শতাংশ হয়েছে ১৯৬৫-৭১ এর মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনাশাসনামলে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২০.৬ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ১৩.৬ শতাংশ ঘটেছে ১৯৭৬-৯০-এর মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশে সেনাশাসনামলে ও স্বৈরশাসক পরিচালিত সাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রামলে। এ তথ্য নির্দেশ করে যে সেনাশাসন ও স্বৈরাচারী শাসনের সাথে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষতিমাত্রা প্রত্যক্ষভাবেই সম্পর্কিত— বিগত ৪০ বছরে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে যেসব হিন্দু ধর্মাবলম্বী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের ৭২ শতাংশ এবং মোট ভূমিচ্যুতির ৮৮ শতাংশই ঘটেছে সেনাশাসন-স্বৈরশাসনামলের ২১ বছরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৭১, ১৯৭৬-৯০ কালপর্বে।[৩৫]

'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টি কোনো অর্থেই হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা নয়। যারা বিষয়টিকে এভাবে দেখাতে চান তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত হীন ও সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল করার একটি

---

[৩৫] আবুল বারকাত. (২০১৪b). "A Treatise on Political Economy of Unpeopling of Religious Minorities in Bangladesh through the Enemy Property Act and Vested Property Act in Bangladesh", Journal of Political Economy, Vol. 30, No 1, পৃ. ১-৬২।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ামাত্র, যে প্রক্রিয়ায় লুটপাটের ভাগীদার হয় গুটিকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি/শ্রেণি/গোষ্ঠী। সম্পত্তি হিন্দুর না-কি মুসলমানের না-কি সাঁওতালদের তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। সম্পত্তি সম্পত্তি কি না, কার সম্পত্তি এবং কোন অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজে বেদখল করা যায় সেগুলোই জোরদখলকারী দুর্বৃত্তদের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এদিক থেকে সমস্যাটি হলো একদিকে (সর্বশেষ ২০০৬-এর মাঠ জরিপভিত্তিক গবেষণা অনুযায়ী) ক্ষতিগ্রস্ত ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার (যারা ২৬ লক্ষ একর ভূমিসহ বহু ধরনের সম্পদ খুইয়েছেন) আর অন্যদিকে ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫০ জন ভূমি-দস্যু সম্পদ-জবরদখলকারীর একটি গোষ্ঠী– যারা নিঃসন্দেহে 'রেন্ট-সিকার' অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সহচর। কারণ-পরিণাম সম্পর্কের বিচারে এই ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫০ জন জবরদখলকারী দুর্বৃত্তের "ধর্মীয় পরিচিতি" আপাতদৃষ্টিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যদি ধরেও নেই যে, এই ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৫০ জন জোরদখলকারীর সবাই মুসলমান নামধারী, সেক্ষেত্রে তারা এ দেশের মোট মুসলমান জনগোষ্ঠীর মাত্র ০.৪ ভাগ। অর্থাৎ আমাদের দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর ৯৯.৬ ভাগ যাদের অধিকাংশই দরিদ্র থেকে মধ্যশ্রেণিভুক্ত; তারা অন্যের সম্পদ জোরদখলের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়। "জবরদখলকারী দুবৃত্তরা যে সংখ্যাগুরু মানুষের ধর্মের অনুসারী"–এ পরিচয়টা মুখোশমাত্র, যে মুখোশ ব্যবহার কৌশলগতভাবে খুবই সুবিধাজনক। এবং সম্ভবত রাষ্ট্র ওই জোর-জবরদখলকারীদের ধর্মপরিচয়কে গুরুত্ব দেয়, কারণ এখন "ইসলাম হলো রাষ্ট্রধর্ম"। বিষয়টি এ দেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব পুনরুৎপাদনের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এখন ওদের অনেকেই প্রকাশ্যেই মিছিল করে বলছে "সংবিধানে ইসলাম নয়, ইসলামই হবে সংবিধান"।

১৯৪৭-এ আমরা ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্ত হয়েছি। তবে ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগ ঘটেছে সাধারণ মানুষকে (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান যে ধর্মই হোক না কেন) জিজ্ঞাসা না করে; তাদের দেশ বিভাগ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত না করে, তাদের মতামত উপেক্ষা করে। এসব কারণেই সমসাময়িক সময়ে একদিকে যেমন ধোঁকাবাজি স্লোগান ছিল "*হাত মে বিড়ি মু মে পান লাড়কে ল্যঙ্গে পাকিস্তান*"; আর অন্যদিকে সুদূরপ্রসারী চিন্তার মানুষেরা বলেছিলেন, "*ইয়ে আজাদি ঝুটা হায় লাখো ইনসান ভুখা হায়*"।

শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগটা হয়েই গেল (তাতে মানুষের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি)। মোটামুটি এক ধর্মের মানুষের সংখ্যাধিক্য আর রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতান্ত্রিক চেতনার বিপরীতে ধর্ম ব্যবহারের আধিক্যহেতু

সামন্তচেতনার পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট মানসিকতা যত প্রবল রূপ নিল ভারতে ঠিক ততটা হলো না। কারণ বিশাল ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমাহার এবং সেই সাথে শুরু থেকেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিকাশে সাম্য-সমতাধর্মী বিষয়াদিকে সংবিধানিকভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তবে ভারতে ধর্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার শক্ত ভিত ও মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদের সুদৃঢ় অস্তিত্বের কারণে ভারতের ভবিষ্যৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন যে যথেষ্ট মাত্রায় বাধাগ্রস্ত হবে এ কথা অনস্বীকার্য। বিষয়টি যে অত্যন্ত জটিল তা অনুধাবনের জন্য 'ধর্ম' ও 'ব্রেইন'-এর আন্তসম্পর্ক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন— বিষয়টি এ গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো সময়টা (১৯৪৭-৭১) রাষ্ট্রপরিচালন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেকোনো রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট উত্তরণে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে— বিপদাপন্ন হলেই বলা হয়েছে "ইসলাম বিপন্ন" ("*ইসলাম খতরে মে হ্যায়*"); মিলিটারি শাসন ও স্বৈরাচার বলবৎ রাখতে প্রায় সবসময়ই "ইসলামের বিপন্নতা" ছিল একমাত্র স্লোগান। সব শেষে এটাই ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে— "ইসলামের বিপন্নতা" ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন পাঞ্জাবি-সিন্ধি-বেলুচ সৈন্য আনা হয়েছে, তখন (অবশ্য তাদের অনেকেই এ দেশে এসে ভিন্ন চিত্র দেখেছেন এবং শাসকগোষ্ঠীর ধোঁকাবাজি বুঝতে পেরেছিলেন); একই স্লোগান ব্যবহৃত হয়েছে এ দেশে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী গুটিকয়েক বাঙ্গালি মুসলমান নিয়ে শান্তি কমিটি, আল-বদর, আল-শামস, রাজাকার ইত্যাদি বাহিনী গঠন প্রক্রিয়ায়। এরা নিশ্চিত ছিল যে মুক্তি-স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালিরা পরাক্রমশালী পাক সেনাবাহিনী ও রাজাকার-আল-বদরদের কাছে পরাজিত হবে। কিন্তু ঘটেছে উল্টোটা।

এ দেশে ঐতিহাসিক উদ্ভবসূত্রে সব ধর্মই দেশের মাটি উত্থিত এবং উদ্ভবসূত্রে উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী। ইসলাম ধর্মও ব্যতিক্রম নয়। আগেই বলেছি ঐতিহাসিকভাবেই পূর্ব বাংলায় উদ্ভবসূত্রে ইসলাম ধর্ম ছিল উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থরাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতার ফাঁদে পড়ে কালানুক্রমে তা "রাজনৈতিক ইসলামে" (Political Islam) রূপান্তরিত হয় ('ধর্মের রাজনীতি'-সংশ্লিষ্ট 'রাজনৈতিক-ইসলাম' এর মর্মার্থ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি)।

এ দেশে ইসলাম ধর্মের বড় মাপের পশ্চাৎমুখী রূপান্তর (regressive transformation) ঘটে তিন দফায়। প্রথমটি ঘটে "দ্বি-জাতি তত্ত্বের" ভিত্তিতে

ব্রিটিশ ঔপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে যখন ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন হলো তখন (অর্থাৎ ১৯৪০-এর দশকে শুরু হয়ে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত), আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পশ্চাৎমুখী বিপর্যয় ঘটে মুক্তিযুদ্ধপরবর্তীকালে, যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলকে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধের জন্য শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলাম এবং প্রায় একই সময়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম গণ-আকাঙ্ক্ষা "ধর্মনিরপেক্ষতা" (যা ছিল আমাদের প্রথম সংবিধান— ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূল নীতি)-কে সেনা শাসক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন (দেখুন, Second Proclamation Order No. VI of 1978)।

ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার উত্থান কাজটি সেনাশাসক জিয়াউর রহমান শুরু করেন ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত "দালাল আইন"টি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৭২-এর সংবিধানে যেখানে যতটুকু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ ছিল সবকিছুই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭-৭৮ সালে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন। আর তার জায়গায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" সংযোজন করে ইসলামভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পথ সচেতনভাবেই সুপ্রশস্ত করলেন। আর এ ক্ষেত্রে যেসব বহিঃস্থ শক্তি বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত এবং যারাই জিয়াউর রহমান-মোস্তাককে ক্ষমতায় বসিয়েছিল তাদের সম্পৃক্ততা অযৌক্তিক নয়।

উল্লেখ্য, ১৯৭২-এর বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত মূল সংবিধানের সাথে সেনা শাসক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ঘোষিত দ্বিতীয় ঘোষণা (সংশাধনী) অর্ডার ১৯৭৮ [Second Proclamation (Amendment) Order, 1978] তুলনা করলেই বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না যে জিয়াউর রহমানই ছিলেন ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পুরোধা ব্যক্তি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে অবৈধ যেসব পরিবর্তন এনে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির পথ প্রশস্ত করলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো নিম্নরূপ:

১. সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে "জাতীয় মুক্তি" শব্দের জায়গায় বসালেন "জাতীয় স্বাধীনতা", আর "ঐতিহাসিক সংগ্রামের" জায়গায় বসালেন "ঐতিহাসিক যুদ্ধের" শব্দ।

২. সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "ধর্মনিরপেক্ষতার" পরিবর্তে লিখলেন "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"; শুধু তা-ই নয় ১৯৭২-এর সংবিধানে যেখানে সংবিধানের চার মূল নীতির (বা স্তম্ভের) মধ্যে চতুর্থ স্থানে ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতা" সেখানে পরিবর্তিত সংবিধানে "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দ বিলুপ্ত করে চার মূল নীতির প্রথম স্থানে বসালেন "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" শব্দসমূহ।

৩. মূল সংবিধানের ৮ (১) অনুচ্ছেদে "ধর্মনিরপেক্ষতাকে" প্রতিস্থাপিত করা হলো "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" শব্দসমূহ দিয়ে; আর ৮ (২) অনুচ্ছেদে "এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হইবে"-র জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করলেন নতুন বাক্য "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি"।

৪. মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০ যেখানে শোষণমুক্ত, ন্যায়ানুগ, সাম্যবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ ছিল তা সম্পূর্ণ বাতিল করলেন।

৫. সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২, যেখানে বলা হয়েছিল "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধর্মের অপব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে"।

৬. মূল সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ যেখানে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না"— জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে এসব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে দিলেন।

উল্লিখিত এসবই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আজ যে ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, মৌলবাদের অর্থনীতি, মৌলবাদের রাজনীতি, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আমরা দেখছি — এই সবকিছুরই মূলে ছিল অবৈধ ক্ষমতায় স্বৈরাচারী সেনাশাসক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। এসব করে জিয়াউর রহমান আসলে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সংবিধানের মৌলিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই পাল্টে দিলেন এবং

অসাম্প্রদায়িক চেতনা উল্টে দিয়ে ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করলেন। আর এসবের পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করলেন। এহেন অবস্থায় যে কেউই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারেন যে জিয়াউর রহমানের মতাদর্শে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল কি না, নাকি তিনি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় ইসলাম ধর্ম ব্যবহারসহ পাকিস্তান পন্থা চালু করলেন? প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতেই পারে যে জিয়াউর রহমান প্রজাতন্ত্রের মূল সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে স্পষ্ট আঁতাত করলেন কি না? এ প্রশ্নও উত্থাপন আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানের চার মূল নীতির অন্যতম নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে দেশকে ইসলামি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন কি না? খুব যৌক্তিক হবে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উচ্ছেদ করে জিয়াউর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে "ইসলামি বাংলাদেশে" অথবা "বাংলাদেশের পাকিস্তানীকরণের" অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন কি না? আরও মারাত্মক প্রশ্ন হতে পারে এমন যে, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উচ্ছেদকারী জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধার আবরণে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহচর ছিলেন কি না?

এতক্ষণ যা বললাম তার চেয়ে আরও মারাত্মক ও আরও ভয়াবহ উপসংহারে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক হবে না যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বপ্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে তার মহাকৌশলের (grand strategy) অংশ হিসেবে বিশ্বের তেল ভাণ্ডার (যা প্রধানত মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে কেন্দ্রীভূত) জবরদখলের উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিল এবং যারই অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছিল; যে হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছিল তাদের নেতৃত্বে ছিলেন জিয়াউর রহমান। যে জিয়াউর রহমানকে দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে গায়ের জোরে (একে বলে "থুকোডাইডিস নীতি" ও "মন্‌রো মতবাদ") সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করে সাম্প্রদায়িকতা— ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল এবং একই সময়ে অসংখ্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছিল; আর সেটা করেছিল মৌলবাদী জঙ্গিত্ব উত্থানের পূর্বশর্ত হিসেবে; যার ফলে ঘটনার শুরুর ২৫-৩০ বছর পরে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে "মডারেট মুসলিম দেশের" তকমা জুড়ে দিয়ে পরবর্তী কোনো একসময়ে রাষ্ট্রক্ষমতাটাই জঙ্গিদের হাতে তুলে দিয়ে ইসলামি জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র খেতাব দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ এবং ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশকে দখল

করা যায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরপরই জিয়াউর রহমান-মোস্তাকের প্রয়োজন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি, আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশে থেকে সমাজতন্ত্র অথবা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ উচ্ছেদ। এখানে উভয়েরই স্বার্থ সম্মিলন ঘটে গেল। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পশ্চাৎমুখী বিপর্যয়সংশ্লিষ্ট আমার এসব কথা যদি ঐতিহাসিক সত্য হয়, তাহলে মুক্তিযোদ্ধা (?) জিয়াউর রহমান আসলে কে? কী তার প্রকৃত পরিচয়? ইতিহাস কীভাবে তাকে ক্ষমা করবে? তার দলই বা এ ফাঁদ থেকে কীভাবে বেরোবে?

অনেক রক্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তবে মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী দীর্ঘ ৪০ বছর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যুদ্ধাপরাধী জাতীয় শত্রুদের কোনো ধরনের শাস্তির বিধান আমরা করতে পারিনি। এটাও পরবর্তীকালে তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ওই ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী (যারা কোনো অর্থেই সাধারণভাবে "ধার্মিক", "ধর্মভীরু", "ধর্মপ্রাণ", বা "ধর্মবিশ্বাসী" নয়)। এবং উগ্র-সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের কিছু অনুসারীরাই (যারা "ধর্ম নিয়ে রাজনীতি" করেছে, "ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ" করেছে, এবং ইসলামকে "রাজনৈতিক ধর্মে" রূপান্তরিত করেছে) বাংলাদেশে মৌলবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের প্রতিভু। এ দেশে ধর্মের ইতিহাসে এ এক চরম বিকৃতিকাল— বলা যায় পশ্চাৎমুখী রূপান্তরের তৃতীয় কালপর্ব। আর বলা যায় ইসলাম ধর্মের পশ্চাৎমুখী রূপান্তরে "হেফাজতে ইসলাম" হলো তৃতীয় কালপর্বের মোটামুটি চূড়ান্ত রূপের অন্যতম বহিঃপ্রকাশমাত্র।

এ দেশে ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক মূল ধারার (সুফিবাদ) বিকাশের সাথে বর্তমান মৌলবাদী রাজনীতি-অর্থনীতির বিপরীতধর্মী পার্থক্যটা এখন স্পষ্ট। ইসলাম ধর্মের পশ্চাৎমুখী রূপান্তর ও ধর্মের রাজনৈতিকীকরণের নিট ফল হলো এই যে তা আলোকিত মানুষ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। বলা চলে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সামনের দিকটা হবে নিঃসন্দেহে বিপর্যয়কর, যেখানে ধর্মভীরু মানুষের ব্যাপকাংশ ধর্মান্ধতার ফাঁদে পড়তে পারে। এ ফাঁদে "এককালীন অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতি"-র ধর্মপ্রীতি এমন মাত্রায় পৌঁছে যেতে পারে যখন তারা নিজেরাই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দেবে, আর এসবের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে অবস্থাটা এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় যখন সে ক্ষেত্রে ইসলামভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন অনিবার্য হয়ে যেতে পারে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এসব আশঙ্কা অমূলক নয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা শুধু রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবেই কাজ করেনি তা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই অর্থনীতির বৈষম্যের[৩৬] যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন জনকল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্রের— যে রাষ্ট্রে নিশ্চিত হবে চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice): অবারিত হবে অর্থনৈতিক সুযোগ, উন্মোচিত হবে সামাজিক সুবিধাদি, পাওয়া যাবে রাজনৈতিক মুক্তি, থাকবে স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা, পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো বিনির্মাণের পরিবেশ, প্রস্ফুটিত হবে ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ। স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান (১৯৭২) এসবের অঙ্গীকার করে, প্রকাশ্যে; করে মৌলিক চাহিদা মেটানো থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠীনির্বিশেষে সমানাধিকারের অঙ্গীকারও। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ অঙ্গীকার, আর বাস্তবের ফারাক এতই বেশি যার ভেতরে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদী রাজনীতির বিস্তৃতি সম্ভব। আমার ধারণা "শুভ অঙ্গীকার" আর "অশুভ বাস্তবতা"— এ দুয়ের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান-ফারাকই মানুষের মধ্যে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব সৃষ্টির চাহিদা সম্প্রসারিত করেছে। আর বহিঃস্থ উপাদান— সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন এ ব্যবধান-ফারাক সৃষ্টিতে অনুঘটকের কাজ করছে আর অন্যদিকে এটাকেই তাদের বৈশ্বিক আধিপত্য বিস্তারে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে।

[৩৬] পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে দুই অর্থনীতির এই বৈষম্যের সাধারণ রূপ নিয়ে ১৯৬৬ সালে "সোনার বাংলা শ্মশান কেন"(?) শিরোনামে যে প্রচারপত্র পূর্ব পাকিস্তানে বিলি করা হয়েছিল সেখানে স্পষ্ট লেখা ছিল: রাজস্ব খাতের মোট বার্ষিক ব্যয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ৫,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ১,৫০০ কোটি টাকা, উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ ছিল ৬,০০০ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানে ৩,০০০ কোটি টাকা, মোট বৈদেশিক সাহায্যের ৮০ শতাংশ পেত পশ্চিম পাকিস্তান আর বাকি মাত্র ২০ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তান, বৈদেশিক মুদ্রা আমদানিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল ৭৫ শতাংশ আর পূর্ব পাকিস্তানের ২৫ শতাংশ, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অংশ ছিল ৮৫ শতাংশ আর বাদবাকি ১৫ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের, আর সামরিক বিভাগের চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অংশ ছিল ৯০ শতাংশ আর বাদবাকি মাত্র ১০ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য।

অধ্যায় ৭

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অর্থনীতি: ভিত্তি, প্রকৃতি, মাত্রা

"সত্য হলো সমগ্রক।... সত্যানুসন্ধানের
সাহস হলো দর্শন চর্চার প্রথম শর্ত।"
জর্জ হেগেল, ১৭৭০-১৮৩১

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত যথেষ্টমাত্রায় সবল। আর মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত আদৌ দুর্বল নয় (অন্যথা ভাবনা হবে আত্মঘাতি)। তার কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু একদিকে যেমন চিরাচরিত সামন্তবাদী মানসকাঠামো বিলুপ্ত হয়নি, তেমনি অন্যদিকে চিরায়ত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কও বিকশিত হয়নি; বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি, যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ভূমিকা রাখে না; সৃষ্টি হয়েছে নিজেরা সম্পদ সৃষ্টি না করে অন্যদের সম্পদ দখল-বেদখল-জবরদখলকারী ফাও-খাওয়া-লুটেরা-পরজীবী এক সংখ্যা-স্বল্প রেন্ট-সিকার (rent-seeker) গোষ্ঠী যারাই আবার বিভিন্ন পথ-পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার ও রাজনীতিকেও তাদের অধীন সত্তায় রূপান্তরিত করে ফেলেছে। উল্লেখ্য যে এসব রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী সৃষ্টিসহ "ব্রিফকেস পুঁজিবাদ" বিকাশে শিল্পভিত্তিক চিরায়ত পুঁজিবাদের তুলনায় "শকুন পুঁজিবাদ" (vulture capitalism) ও "স্বজনতুষ্টিবাদী পুঁজিবাদ" (crony capitalism) অনেক বেশি অনুকূল। এই পুঁজিবাদ উৎপাদনশীল শিল্পনির্ভর অর্থনীতির চেয়ে নগরভিত্তিক ভূমি-ব্যবসা এবং দোকানদারী অর্থনীতি বিকাশে অনেক বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ কাঠামোগতভাবেই এই পদ্ধতি উদ্বৃত্ত শ্রমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা

রাখতে পারছে না। হচ্ছে না প্রকৃত অর্থের দারিদ্র্য বিমোচন[৩৭], আর বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান। অবশ্য এ ধরনের মুক্তবাজার অর্থনীতি কখনোই দরিদ্রবান্ধব নয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুক্তবাজার এ দেশের জাতীয় পুঁজিভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বদলে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তাও মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা পুষ্টিতে সহায়ক।

কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে স্বাধীনতা-উত্তর গত চার দশকে (১৯৭৫-২০১৬) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ ভেদহীন মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। এ দূরত্ব মানুষের মধ্যে হতাশা-নিরাশা বাড়ায়, বাড়ায় বিচ্ছিন্নতা বোধ, সৃষ্টি করে পরিচয় সংকট। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার ক্রমবর্ধমান এ ফারাকটা মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব তোষণে যথেষ্ট মাত্রায় সহায়ক।

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে গত চার দশকের (১৯৭৫-২০১৬) বিকাশের ধারা ১৬ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দুই ভাগে বিভাজিত করেছে: প্রথম ভাগে আছে সংখ্যাস্বল্প ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লক্ষ; আর দ্বিতীয় ভাগে আছে সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ। রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাঁচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লক্ষ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছে ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত, বৈষম্য-জর্জরিত, হতাশাগ্রস্ত মানুষ। আর এই ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ ক্ষমতাহীন-বঞ্চিত-বৈষম্য জর্জরিত মানুষের ৯০

[৩৭] দারিদ্র্য বিষয়ে অর্থনীতিবাদীদের ধারণা যথেষ্ট সংকীর্ণ। অর্থনীতিবাদীরা দারিদ্র্য সংজ্ঞায়ন করেন সাধারণত আয় অথবা খাদ্য পরিভোগের নিরিখে। যে দারিদ্র্য মৌলবাদ বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তার মর্ম অনুধাবন করতে হলে দারিদ্র্যকে দেখতে হবে দারিদ্র্যের সব পরস্পর-সম্পর্কিত জটিল রূপ-সমষ্টির সমগ্রকতা দিয়ে। দারিদ্র্যের ওইসব রূপ হলো: আয়ভিত্তিক দারিদ্র্য, ক্ষুধাজনিত দারিদ্র্য, স্বল্প মজুরির কারণে দারিদ্র্য, বেকারত্বজনিত দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, আশ্রয়হীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিকতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য (যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ, আদিবাসী মানুষ, দরিদ্র নারী, বস্তিবাসী, চরের মানুষ, রিকশা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ি চালক, অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষ ইত্যাদি), সর্বোপরি মানসকাঠামোর দারিদ্র্যসহ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দারিদ্র্য (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০০৬, একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা; আবুল বারকাত, ২০১৬ বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)।

শতাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। প্রকৃত অর্থে এই বিশালসংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা inclusion of the excluded— এ বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনো প্রয়াস কখনো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো, ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ তা-ই নির্দেশ করে। আর ভারসাম্যহীন বিকাশ সমীকরণে এ ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী "মুক্তির পথে" সুইসাইড বোমারু হিসেবে 'বেহেশতবাসী' হওয়ার জন্য আত্মাহুতি দেয় তা অযৌক্তিক হবে কেন? এ কথা শুধু ইসলাম ধর্ম নয় অন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং শুধু আমাদের দেশের জন্যই নয় অপেক্ষাকৃত উন্নত-ধনী দেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জন্যও প্রযোজ্য।

এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ (কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যান যা-ই বলুক না কেন) অতিকষ্টে জীবন যাপন করছে— "পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি (statistical economy) যা-ই বলুক না কেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ দেশে মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হিস্যা উত্তরোত্তর কমেছে, আর রেন্ট-সিকার ধনীদের বেড়েছে— ধনী-দরিদ্র ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের এ কথা সরকারিভাবেই স্বীকৃত। অর্থাৎ সহজ কথায়— বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান।[৩৮] মনে রাখা প্রয়োজন যে গত ৪০ বছরে এ দেশে বিভিন্ন মানদণ্ডে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে বেড়ে এখন ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে; আর সেই সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় নিকট অতীতের দরিদ্ররা দরিদ্রই থাকছে, আর নিম্নবিত্ত হচ্ছে দরিদ্র, সেই সাথে মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। একই সময়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, আর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি (self destructing culture of plundering) জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হলো কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি। এসবই ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মৌলবাদের অর্থনীতি

[৩৮] এসব নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

গঠনের সহায়ক উপাদান। আর এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ পাকিস্তান ফ্যাক্টর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ উপাদান সক্রিয় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে (বিষয়টি ইতিমধ্যে চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি)।

গত চার দশকে এ দেশে আর্থসামাজিক বিকাশে মূল প্রবণতা হলো: ১০ লক্ষ দুর্বৃত্ত (রেন্ট-সিকার) ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোর মধ্যে জিম্মি করে রেখেছে। ক্ষমতাধর সংখ্যালঘিষ্ঠ রেন্ট-সিকার দুর্বৃত্ত ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার ক্ষমতাহীন সংখ্যাগুরু এ দুটি ধারার অস্তিত্ব এখন সন্দেহাতীত বাস্তবতা। **আর অন্যায়-অন্যায্য-ভারসাম্যহীন এ বাস্তবতা যে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনোজগৎকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিতে পারে তা অনস্বীকার্য। মানুষের মনোজাগতিক এ ঝাকুনির স্বল্প অথবা দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল কী হতে পারে তা নিয়ে মানুষ আপাতত চিন্তিত নাও হতে পারে (এ কথা ঐতিহাসিক সত্য)। আসলে 'বর্তমানে' বাস করা মানুষ অনেক বিষয়েরই 'বর্তমান' নিয়েই তেমন কিছু জানে না; 'ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে খুব কমই ভাবে অথবা খুব কমই জানে; আর 'ভবিষ্যতে' যখন কিছু একটা ঘটে যায়, তখন বড়জোর পোস্ট মর্টেম (ময়নাতদন্ত জাতীয়) করে। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওই পোস্ট মর্টেম-এর ফলাফল হা-পিত্যেশ করা ছাড়া তেমন কোনো কার্যকর ফল দেয় না।**

মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির উদ্ভব ও বিকাশ-সহায়ক গত চার দশকের খেরোখাতা বা Balance sheet (সারণি ১ দ্রষ্টব্য) যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও মানব উন্নয়নবিরোধী অর্থাৎ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সেগুলো উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থসামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। উন্নয়নের খেরোখাতা দেখাচ্ছে যে, যা বৃদ্ধি পেলে সবার জন্যই মঙ্গল হতো, তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে; আর যা হ্রাস পেলে ভালো হতো, তা দ্রুত হারে বেড়েছে। উন্নয়নের খেরোখাতা যা দেখাচ্ছে তা হলো গত চার দশকে —

- কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে, আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়েছে, হয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত (আর নিঃস্ব-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ আশ্রয় খোঁজে);
- সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে;

- কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে;
- উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি; সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে;
- বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি (বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অশুভ-আঁতাত গোষ্ঠীর), কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ;
- বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে জনগণের সঙ্গে জনগণের সেবকদের দূরত্ব;
- বেড়েছে নির্বাচনী ব্যয়, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত কার্যকারিতা;
- বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ;
- বেড়েছে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য আর শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ আর শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা;
- বেড়েছে দারিদ্র্য-উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভূত নিঃস্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা;
- বেড়েছে ধর্ম-ব্যবসা, পীর-ফকিরের সংখ্যা, জ্যোতিষির সংখ্যা, ভাগ্যবিশ্বাস, হতাশা-নিরাশা, ধর্মের নামে সহিংসতা, আর কমেছে এক ধর্মের মানুষের অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, কমেছে বিজ্ঞানচর্চা, কমেছে ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো। অর্থাৎ এক কথায় গত চার দশকে একদিকে সুপ্রশস্ত হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোজাগতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভিত্তি। আর অন্যদিকে অশুভ এ লক্ষণ প্রশমিত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সারণি ১: মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্ভব-সহায়ক গত চার দশকের খেরোখাতা, ১৯৭৫-২০১৬

বৃদ্ধির প্রবণতা	হ্রাসের প্রবণতা
কালো অর্থনীতি/কালো টাকা এবং সংশ্লিষ্ট লুণ্ঠন, অপরাধ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশিশক্তি, দুর্নীতি, ঘুষ, হুন্ডি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-নিপীড়ন, খুন, জখম, রাহাজানি	শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত; জাতীয় পুঁজির বিকাশ; শিল্পায়ন; সাধারণ মানুষের মানবিক জীবন পরিচালন-সক্ষমতা; কর্মসংস্থান; কালো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরুৎসাহিত করার প্রতিষ্ঠান-সমূহের কার্যকারিতা
কোটিপতি ও ভিক্ষুক/নিঃস্বায়িত মানুষ; জোরপূর্বক ভূমি-জলাশয় দখল; নতুন গাড়ি-ফ্লাট ও ভিক্ষাবৃত্তির নবতর কৌশল; জাকাতের কাপড় সংগ্রহে মৃতের সংখ্যা; শৈত্যপ্রবাহ ও গ্রীষ্মদাহে অসুস্থ ও মৃতের সংখ্যা	অর্থনৈতিক সুযোগ; কর্মসংস্থানের সুযোগ (মানব উন্নয়নের প্রথম শর্ত); সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা/ মালিকানা
গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষ; বস্তিবাসীর সংখ্যা; ইনফর্মাল সেক্টর; নিউক্লিয়ার পরিবার; শিশু-মহিলা ও প্রবীণদের দুর্দশা-বঞ্চনা	ভূমিহীনতা ও গ্রামে কর্মসংস্থান; প্রকৃত আয়/মজুরি; সম্প্রসারিত (বর্ধিত) একান্নবর্তী পরিবার
বৈধ-অবৈধ আমদানি ও রপ্তানি; অনুপার্জিত আয়; ভারসাম্যহীন অর্থনেতিক উন্নয়ন	মানবশক্তি ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার; জাতীয় পুঁজির শিল্পখাতে বিকাশ; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ
বৈদেশিক ঋণ-অনুদান প্রকল্প; এনজিও কার্যক্রম	দেশজ ও স্থানীয় উদ্যোগ; স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রণোদনা ও আগ্রহ; সামাজিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ
তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ও যোগাযোগ; কম্পিউটার ও ব্যবসা শাস্ত্রের ছাত্র সংখ্যা	সাধারণ বিজ্ঞান চর্চা; প্রযুক্তিগত ভিত্তি; বিজ্ঞান-দর্শনের ছাত্রসংখ্যা
ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা (ইংরেজি মিডিয়ামসহ); শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ইসলামি শিক্ষার বাড়-বাড়ন্ত; শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য	সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার গুণগতমান; শিক্ষা ব্যবস্থার ফলপ্রদতা; শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অসাম্প্রদায়িক বিষয়াদি; মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয়-বরাদ্দ
ধর্ম ব্যবসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পীর-ফকিরের সংখ্যা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মের নামে সহিংসতা, ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রকাশ; ভাগ্য বিশ্বাস; জ্যোতিষির সংখ্যা	ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি সম-শ্রদ্ধাবোধ; বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান; বিজ্ঞানমনস্কতা; বিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক সাধারণ আলোচনাসভা; সুস্থ জীবনবোধ; ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ ও মানসকাঠামো
ব্যয়বহুল বেসরকারি ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার; দুশ্চিন্তা ও দারিদ্র্য-উদ্ভূত অসুখ-বিসুখ; চিকিৎসা ব্যয়; চিকিৎসা ব্যয়-উদ্ভূত নিঃস্বায়ন	প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো; সরকারি স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসার মান; স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়; সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা
অপসংস্কৃতি চর্চা; অপসংস্কৃতি শ্রবণ-দর্শনে সময়ের অপচয়; মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস	দেশজ সংস্কৃতির চর্চা; সংহতি বোধ; পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ; মানবিক মূল্যবোধ
রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; রাজনীতিবিদদের দালালি; রাজনীতিকে ব্যবসায়-পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা; স্বৈরশাসন; জনকল্যাণকামী ধারার রাজনৈতিক চেতনার চাহিদা	জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ; জ্ঞান ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতি; রাজনীতিবিদদের দেশপ্রেম; গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক বিনির্মিত।

এতক্ষণ বিগত চার দশকের উন্নয়নের (!) খেরোখাতা নিয়ে যা উল্লেখ করলাম এসবের পাশাপাশি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ মৌলবাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিষয়টি মারাত্মক এক প্রবণতা নির্দেশ করে। গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীর মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩ হাজার টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫ হাজার টাকা। আর এখন শিক্ষার ইসলামিকীকরণের লক্ষ্যে আপাতত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে হেফাজতে ইসলামের ২১ দফা এবং একই সাথে বর্জিত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিনির্মাণ-উদ্দিষ্ট বিষয়াদি। বলা যায় শিক্ষার "ইসলামীকরণের" এসব শুরুমাত্র। এখন "জ্ঞানজগতের ইসলামীকরণ" (Islamization of Knowledge, IOK) নিয়ে দেশে-বিদেশে সংগঠিতভাবেই অনেক লেখাজোখা হচ্ছে। অবস্থা যা তাতে এসবের শেষ কোথায় বলা দুষ্কর।

মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে, বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র (এখন যার মোট সংখ্যা ৯৮ লক্ষ); দেশে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৫ হাজারের বেশি, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশ কওমি মাদ্রাসা; এসব মাদ্রাসা পরিচালনে বছরে ব্যয় হয় আনুমানিক ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, আর মাদ্রাসা পাসদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭৫ শতাংশ।[৩৯] শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি আত্মঘাতী বোমাবাজদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ধারণা-কাঠামো প্রযোজ্য: এটা "স্বতঃসিদ্ধ" মনে করা হয়।

ইসলাম ধর্মের শিক্ষালয় মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করলেই মৌলবাদী এবং/অথবা জঙ্গি হয় অথবা মসজিদে নামাজ পড়লেই মৌলবাদী এবং/অথবা জঙ্গি হয়— এ ধারণা ভ্রান্ত। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে এর ভিতের (foundation বা basic structure) ওপর, যা দৃশ্যমান নয়, যে ভিত হলো উৎপাদন সম্পর্ক, যা প্রধানত উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর মালিকানার ধরন

---

[৩৯] আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০০৮, Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth and Impact. ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স। (একই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, দেখুন ২০১৭, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস, বিকাশ ও প্রভাব, ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স)।

দিয়ে নির্ধারিত হয়। আর এই ভিতের (বা ভিত্তির) ওপরে থাকে উপরিকাঠামো (superstructure) বা সমগ্র সমাজ-দালান। এই উপরিকাঠামো হলো বিভিন্ন মতাদর্শ ও মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানের সমাহার। সমাজদেহের অস্তিত্ব ও বিকাশের সাধারণ সূত্র হলো: ভিত্তিকাঠামোর (বা ভিতের) প্রকৃতি ও স্বরূপের ওপরেই নির্ভর করে উপরিকাঠামোর প্রকৃতি ও স্বরূপ। সমাজদেহের এ সমীকরণে "ধর্ম" (যেকোনো ধর্মই) হলো মতাদর্শ (ideology) আর "ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান" (মাদ্রাসা, মসজিদ, চার্চ, মন্দির, প্যাগোডা) হলো মতাদর্শিক প্রতিষ্ঠান (ideological institutions), যা অনুঘটক বা প্রভাবক-এর ভূমিকা পালন করে (reagent/accelerator)। আবারও বলে রাখি 'ধর্ম' অথবা 'ধর্মসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান' মৌলবাদ অথবা সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব সৃষ্টির কারণ নয়, প্রভাবক বা অনুঘটকমাত্র। সংশ্লিষ্ট 'প্রভাবক' অথবা "ত্বরান্বয়ণকারী" উপাদান হিসেবে শর্তাধীনে এসবের অন্তর্নিহিত (inherent) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ('ধর্ম' ও 'রাজনীতি' ৭ ধরনের যোগসূত্রসংশ্লিষ্ট এসব বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি)। বৈশ্বিক এবং/অথবা আঞ্চলিক এবং/অথবা দেশজ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হলে এসবের প্রভাবনা-মাত্রা বা ত্বরান্বয়ন-মাত্রা বাড়ে।

যা বললাম তারপরে যৌক্তিক কারণেই বলা প্রয়োজন যে বিগত সময়ে এ দেশে 'মূলধারার শিক্ষার' পাশাপাশি 'মাদ্রাসা শিক্ষা' এবং ধর্মপালনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদ-এর সংখ্যাগত ও আনুষঙ্গিক বিকাশ কেমন হয়েছে এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কারা এবং কেন? একই সাথে বলা উচিত যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এসবের ভবিষ্যৎ কী অথবা প্রক্ষেপণটা (Projection) কেমন হতে পারে? ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব বিকাশে এসব প্রসঙ্গ 'প্রভাবক' অথবা 'ত্বরান্বয়ক' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট এসব হিসাব করা (ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণসহ) এবং হিসাবের পেছনের কার্যকারণ নিয়ে কিছু বলা যৌক্তিক। সংশ্লিষ্ট এসব হিসাবপত্তর সারণি ২-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২: বাংলাদেশে মাদ্রাসা (ধর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান), মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মসজিদ-এর সংখ্যা ও এসবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা (অতীত, বর্তমান ও প্রক্ষেপিত ভবিষ্যৎ): ১৯৫০-২০৫০

প্রতিষ্ঠান / সাল	'মূল ধারার' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়)		মাদ্রাসা		মসজিদ (সংখ্যা)
	সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা	সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা	
১৯৫০	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৪,৩৩০	১,১০,০০০	তথ্য নেই
১৯৭০	৩৫,২৭০	৭০,০০,০০০	১০,২৩১	২,৬০,০০০	তথ্য নেই
১৯৮০	৫৩,০২০	১,১০,০০,০০০	১৮,০৭৯	৫,১০,০০০	তথ্য নেই
১৯৯০	৯৪,৯৫৩	১,৫৮,০০,০০০	২৮,৯০৫	৮,০০,০০০	তথ্য নেই
২০০৮	১,০৩,৬১৮	২,৪৯,৯১,৪৫৬	৫১,১৩০	৯৮,২৭,৭৪২	১,৯১,৯৮৬
প্রক্ষেপণ (Projection)					
২০২০	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	৭১,৬৬৬	১,১৯,০০,০০০	৩,৩৮,৬৪৭
২০৩০	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	৯২,২৪৬	১,৪২,০০,০০০	প্রক্ষেপণ করা হয়নি
২০৪০	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	১,২০,০৮৫	১,৬৯,০০,০০০	প্রক্ষেপণ করা হয়নি
২০৫০	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	প্রক্ষেপণ করা হয়নি	১,৫৫,১০৮	২,০৯,০০,০০০	প্রক্ষেপণ করা হয়নি

উৎস: সারণিতে প্রদত্ত সব তথ্যের মূল উৎস আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৭, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস, বিকাশ ও প্রভাব, পৃ. ১১৩, ১১৭, ১২১-১২২, ১৭৫, ১৭৯, ৩২৮, ৩৩৩, ৩৫৪।

'মূল ধারার শিক্ষা', 'মাদ্রাসা শিক্ষা' ও 'মসজিদ'-সংশ্লিষ্ট হিসাবপত্তর থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়, যা মাদ্রাসা শিক্ষা (বিশেষত কওমি শিক্ষা), ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কার্যকারণসহ অনুঘটক-প্রভাবক ভূমিকার সম্ভাব্য মাত্রা নির্দেশ করে। সারণি ২-এর হিসাবপত্তর থেকে দেখা যাচ্ছে যে,

১. বাংলাদেশে মোট মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি (২০০৮ সালে ৯৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৪৮) আর 'মূলধারার' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ (২০০৫ সালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৫৬)। অর্থাৎ দেশের মোট শিক্ষার্থীদের ২৮ শতাংশই মাদ্রাসাগামী। এসব মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর দুই-তৃতীয়াংশ কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে যাদের একক কোনো পাঠ্যসূচি নেই; তাদের পাঠ্যসূচিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের বিষয়াদি তেমন নেই, আছে 'ফতোয়া' ও 'শরিয়াহ'-র বিষয়াদি; এবং এসবে নেই কোনো ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ। এসব মাদ্রাসার একাংশের সাথে মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সংশ্রব পাওয়া গেছে।[৪০] কওমি

[৪০] "কওমি মাদ্রাসার অধিকাংশ (৬৫%) শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছে। তাদের সিংহভাগ (৮৬%) শিক্ষার্থী গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত।... শতকরা ৬৫.৫ ভাগ কওমি

মাদ্রাসার সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক বিষয়ে মুফতি আবদুল হান্নানকে একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে (দেখুন প্রদর্শ ১)।

প্রদর্শ ১: কওমি মাদ্রাসা-সৃষ্ট জঙ্গি মুফতি আবদুল হান্নান

হরকত-উল জিহাদের নেতা মুফতি আবদুল হান্নান ঢাকা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে স্বীকার করেন যে তিনি ২০০১ সালে উদীচী ও ছায়ানটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দেন। ওই জবানবন্দিতে তিনি তার শিক্ষাগত অতীত প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি ১৯৭৫ সালে গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন, তারপর কিছুদিন শরশিনা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেন। অতপর তিনি উপমহাদেশের নামকরা কওমি মাদ্রাসা ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়ালেখা চালিয়ে যান। দেওবন্দে যখন তিনি দাওড়া হাদিস পড়ছিলেন, তখন অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের দিকে তিনি ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি শিক্ষায় এমএ পাস করেন।

১৯৮৭ সালে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং পাকিস্তানে পড়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। ১৯৮৮ সালে তিনি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্ শাস্ত্র পড়ার জন্য করাচির জামিয়া ইউসুফ বিন নুরীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এই মাদ্রাসায় তিন বছর পড়াশোনার ফাঁকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য তিনি আফগানিস্তান যান। তখন আফগানিস্তানের পাখতিয়া প্রদেশের খোস্ত শহরে যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি ১ রমজান-এ স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দেন। ১৫ রমজানে আহত হলে তাকে পেশোয়ার-এ অবস্থিত কুয়েত আল-হেলাল হসপিটালে পাঠানো হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কুমিল্লার মওলানা ওবাইদুল্লাহ ও মওলানা আবু মুসা এবং চট্টগ্রামের হাসেম ও সালাহউদ্দিনের সাথে পরিচিত হন। তিনি ১০ মাস ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার দুই মাস পর তিনি করাচি ফিরে পড়ালেখা শেষ করে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে চলে আসেন।

শিক্ষার্থী হাদিস শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়।... কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য 'নিম্ন বেতন' একটি প্রধান সমস্যা।... আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের তুলনায় কওমি শিক্ষকেরা অধিক মাত্রায় দরিদ্র।...শিক্ষার্থীদের প্রায় সবাই (৯৬%) স্বীকার করেছে যে সরকারি স্বীকৃতি পেলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।... কওমি শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ (৭০%) এ শিক্ষাকে মৃত্যুর পর বেহেশত লাভের একটি সহজ উপায় হিসেবে বিবেচনা করে।... আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মনে করে যে, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনুপযোগী, বাংলা শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমে প্রবৃত্তমুখী।...ধারণা করা হয় যে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় পুস্তক পঠনের মাধ্যমে "আল্লাহর যোদ্ধাতে পরিণত হয় এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে" (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৭, পৃ. ৩০৭-৩০৮, ৩১০, ৩১২-৩১৩, ৩১৫-৩১৬)। এখন থেকে এক দশক আগেই মাদ্রাসা শিক্ষালয়ের সাথে জঙ্গি প্রশিক্ষণের যোগসূত্র সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ২০০৬ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় মাদ্রাসার নাম-ঠিকানাসহ দেখানো হয়েছে যে দেশের ৬২টি জেলায় ১৭৫টি মাদ্রাসায় মোট ২০৭টি জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আছে (দেখুন, এ এম এ মুহিত, মালিক খসরু ও নুহ-উল-আলম লেলিন সম্পাদিত, ২০০৬, Rise of Fanatic Extremism in Bangladesh, পৃ. ৫৮-৬০)।

১৯৮৯ সালে আফগান যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৮৯-৯০ সালের দিকে বাংলাদেশি মুজাহিদরা হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী, বাংলাদেশ গঠন করেন। আফগানিস্তানে শহিদ হওয়া আবদুর রহমান ফারুকী ছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা।

মুফতি আবদুল হান্নান তার গ্রামে মাদ্রাসা শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় ঘাঘরা বাজার কোটালিপাড়া আদর্শ ক্যাডেট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৯৪ সালে গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার হরকতুল জিহাদের নেতা মুফতি শফিকুর রহমান ও মুফতি আবদুল হাই, মাওলানা আবদুর রউফ, মাওলানা সাইদুর রহমান একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুফতি আবদুল হান্নানও ওই সভায় যোগ দেন। তিনি হরকতুল জিহাদে যোগ দেন এবং উপজেলা কমিটির প্রচার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সংস্থাটির উদ্দেশ্য হলো দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের বাইরে নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করা। ধারণা করা হয় ২ লক্ষ লোক বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ নেন।

মুফতি আবদুল হান্নান ১৯৯৫ সালে যশোর শহরে খুরশেদিয়া মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১ বছর পর তিনি পুনরায় গ্রামে ফিরে এসে তার ক্যাডেট মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। একই সময়ে তিনি আল-ফারুক ইসলামি ফাউন্ডেশন নামে একটি বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তালতলা, খিলগাঁওসহ ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি সভায় যোগ দেওয়া শুরু করেন। তাদের সংগঠনের পত্রিকা ছিল যার নাম 'জাগো মুজাহীদ'। সভা-সম্মেলনে কোরআন ও হাদিস হতে এমন আয়াতগুলো পড়ানো হতো যাতে শ্রোতারা জিহাদি হতে আগ্রহী হয়। তারা রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন এবং আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অরগানাইজেশন-এ জিহাদি যোদ্ধা পাঠাতে শুরু করে।

১৯৯৯ সালে ইসলাম বহির্ভূত-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য যশোর উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করা হয়। আওয়ামী লীগ-এর ওপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কারণ তারা ফতোয়াবিরোধী প্রচারণা চালাত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হরকতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় নেতা মুফতি শফিকুল ইসলাম উদীচী এবং আওয়ামী লীগের সভায় বোমা হামলায় তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন ১৯৯৮ সালে মুফতি আবদুল হান্নান হরকাতুল জিহাদ হতে বহিষ্কৃত হন এবং মুফতি হান্নান একই নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

উৎস: আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৭, পৃ. ২৮৯-২৯০

২. ১৯৭০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে (অর্থাৎ আনুমানিক বিগত ৪০ বছরে) দেশে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ২.৯৪ গুণ কিন্তু একই সময়ে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়েছে ৫.২৯ গুণ। আর শিক্ষার্থীর সংখ্যার নিরিখে বিগত ৪০ বছরে মূলধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী

বেড়েছে ৩.৫৭ গুণ অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বেড়েছে ৩৭ গুণ। সহজ কথায় এসবই নির্দেশ করে যে, এ দেশে দরিদ্র ঘরের সন্তানদের (মাদ্রাসাগামীদের প্রায় ৮৫ শতাংশই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত ঘরের সন্তান) "বিজ্ঞানসম্মত একমুখী বাধ্যতামূলক শিক্ষা" প্রদানের সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে।

৩. মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামরিক স্বৈরশাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষণীয় (১৯৫৮-৬৯ আইয়ুব খানের শাসন; ১৯৭৬-৮১ জিয়াউর রহমানের শাসন, ১৯৮২-৯০ এএইচএম এরশাদ-এর শাসন)। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে ১৯৮০-এর দশকে মাদ্রাসার সংখ্যার আকস্মিক বৃদ্ধি একদিকে দুদেশেই সামরিক স্বৈরশাসকের প্রবল ইসলামিকরণের সাথে সম্পৃক্ত এবং একই সাথে পশ্চিমা ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত (দেখুন, বারকাত ও অন্যান্য, ২০১৭, পৃ. ৩১৪)।

৪. যেভাবে চলছে সেভাবে চলতে থাকলে আমাদের দেশে ২০৫০ সাল নাগাদ মোট মাদ্রাসার সংখ্যা হবে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ১০৮টি এবং মোট মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ২ কোটি ৯০ লক্ষ। মাদ্রাসা শিক্ষা যদি ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের অনুঘটক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এ এক বড় ধরনের অশনিসংকেত।

৫. আমাদের হিসাবে (সারণি ২ দ্রষ্টব্য) ২০০৮ সালে বাংলাদেশে মোট মসজিদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৮৬। ২০২০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা হবে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৪৭টি। মসজিদের সংখ্যার এ প্রবৃদ্ধি জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। আমার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০০৮ সালের তুলনায় ২০২০ সালে দেশে মোট মাদ্রাসা সংখ্যা বাড়বে ১.৩২ গুণ আর মসজিদের সংখ্যা বাড়বে ১.৭৬ গুণ।

সুতরাং সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে আমাদের দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা এবং মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যার বৃদ্ধির গতিটা হবে "মূলধারার" শিক্ষার চেয়ে বেশি, এবং 'মসজিদের' সংখ্যা (এবং সম্ভবত: মুসুল্লির সংখ্যা) বৃদ্ধির গতি হবে আরো বেশি। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ-এর উত্থান ও বিকাশে যদি মাদ্রাসা ও মসজিদ-এর প্রভাবকীয় বা অনুঘটকীয় ভূমিকা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে এসব তথ্য যথেষ্ট মাত্রায় দুর্ভাবনা উদ্রেগকারী। অশুভ এ প্রবণতা রোধে দায়িত্বটা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে এবং একই সাথে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের শর্তাবলী

সৃষ্টি করতে হবে। শিল্প-সংস্কৃতিসহ অর্থনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক বঞ্চনা-বৈষম্য দূর করে এসব শর্ত সৃষ্টি সম্ভব।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকীকরণের ক্ষেত্রে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে মাদ্রাসা শিক্ষাই এ সাম্প্রদায়িকীকরণের একমাত্র মাধ্যম বা প্রভাবক নয়। তথাকথিত মূলধারার বাংলা-মাধ্যম শিক্ষা ও ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষা এখন যেভাবে চলছে, বৈশ্বিক পর্যায়ে দেশে-দেশে সাম্রাজ্যবাদ যে ধরনের অন্যায়-অন্যায্য আচরণ ও কর্মকাণ্ড করছে, দেশে-বিদেশে পরিচয়-সংকট (identity crisis) যেভাবে বাড়ছে, বৈশ্বিক বৈষম্য-অসমতা যেভাবে বাড়ছে এবং তথ্য-বিশ্বায়ন-উদ্ভূত ঋণাত্মক উপাদানসমূহ যেভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অতি সহজেই অনুপ্রবেশ করছে— এসব কিছুই তথাকথিত বাংলা-মাধ্যম (অর্থাৎ যাকে বলা হয় 'মূলধারা'র শিক্ষা) এবং ইংরেজি-মাধ্যম (অর্থাৎ যা 'এলিট' শিক্ষা বলে পরিচিত) শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন হতাশ-নিরাশ করে, তেমনি অন্যদিকে তাদের নৈতিক-মানসিক-মনস্তাত্ত্বিকভাবে অসাম্প্রদায়িক করে না। আমার ধারণা এসব তাদের শেষবিচারে সাম্প্রদায়িকই করে।

এ অবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নকারী ও শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারীদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে এ কথা অতি গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করতে হবে যে শিক্ষার যে ধারাই হোক না কেন (বাংলা মাধ্যম, আরবি মাধ্যম, অথবা ইংরেজি মাধ্যম— যেসব এখন প্রচলিত আছে) শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে শিক্ষার্থীকে "মানুষ হিসেবে— সামাজিক কল্যাণচিন্তক" এবং "বিজ্ঞান আর যুক্তিসম্মত ভাবনায় মানুষ" হিসেবে গড়ে তোলা। আর যে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান, বস্তুনিষ্ঠ দর্শন, নির্মোহ ইতিহাসহ নীতি-নৈতিকতার বিষয়াদি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করানো হয় না, সে শিক্ষাক্রম যারা পেরিয়ে আসবে তারা যে অসাম্প্রদায়িক নয় সাম্প্রদায়িক হবে— এ প্রবণতা স্বাভাবিক। আর এ কথা যদি সত্যি না হবে তাহলে দেশে-বিদেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র জঙ্গিদের ব্যাপক অংশ কেন তথাকথিত মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রোডাক্ট। কেনই বা আইএসসহ দেশ-বিদেশের জঙ্গিদের রিক্রুটমেন্ট পলিসিতে এখন আর মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রসঙ্গ তেমন উল্লেখ করা হয় না? এসব নিয়ে ব্যাপক ভাবনা-চিন্তা-গবেষণা ও করণীয় নির্ধারণ জরুরি।

শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতার নিরিখে আমাদের প্রচলিত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায়— শিক্ষার মাধ্যম ও স্তরনির্বিশেষে— যে বড় মাপের গলদ আছে তা নির্দেশে আরো একটি উপেক্ষিত অথবা স্বল্প-গবেষিত বিষয় সম্পর্কে বলা দরকার। আর তা হলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে এখন (২০১৬ সালের হিসাবে) মোট

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৪টি— যার ৩৪টি অনুমোদন পেয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক সরকার— আওয়ামী লীগের আমলে আর তার আগের সরকাররা অনুমোদন দিয়ে গেছে ৬০টি। আওয়ামী লীগ সরকারপূর্ব ৬০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই প্রাথমিক বিনিয়োগকারীরা মূলত জামায়াতে ইসলামী এবং/অথবা মৌলবাদের অর্থনীতির প্রতিভূ; এবং একই সাথে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপকদের অধিকাংশই পাকিস্তান-মানসিকতার ধারক (অনেকেই সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ)। আর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যেসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে (৩৪টি) সেক্ষেত্রে অবস্থাটা "মিশ্র"— দলমতনির্বিশেষে 'এরা' মিলেমিশে আছে। আর একই সাথে এ কথাও ধ্রুব সত্য যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যত না জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে। এসবই স্পষ্ট লক্ষ করা যায় যদি ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিভাগ-এর নাম/বিষয় এবং একই সাথে শিক্ষার ব্যয়-এর পরিমাণ ও ধরন দেখা যায়। সুতরাং এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাস করে বেরুবেন তাদের অধিকাংশেরই অসাম্প্রদায়িক নৈতিক উচ্চমানসম্পন্ন মানুষ হওয়ার কথা নয়।

এখন আসা যাক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির অন্যতম প্রধান অভ্যন্তরীণ উপাদান নিয়ে। বিষয়টি সমাজের শ্রেণি-কাঠামো ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতাসংশ্লিষ্ট। বিষয়টি প্রধানত এ রকম: অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং গরিব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতিনির্ভর উন্নয়নধারা বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শ্রেণিকাঠামো বদলে দিয়েছে। আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো যেভাবে বদলেছে তা সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদ বিকাশের অনুকূল। বাংলাদেশে চলমান আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তনের এ ধারাটি গুটিকয়েক ধনিক শ্রেণির হাতে সম্পদ ও ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হওয়ার বিষয়টিও স্পষ্টতর করে। আবার এই ধনিক শ্রেণির মূল বৈশিষ্ট্য হলো তারা একই সাথে রেন্ট-সিকার এবং ধর্ম ব্যবসায়ী (রাজনৈতিক দলগত পরিচিতি এ ক্ষেত্রে গৌণ বিষয়)। নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো পরিবর্তন প্রবণতার সে চিত্রটিই তুলে ধরে যা দিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব (সারণি ৩):

১. আমার হিসাবে বাংলাদেশে এখন ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ মানুষ দরিদ্র (মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ), ৫ কোটি ১ লক্ষ মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির (মোট জনসংখ্যার ৩১.৩ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৪৪ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ) ধনী। গত ৩০ বছরে (আসলে ৩২ বছর; ১৯৮৪-২০১৬) দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ (১৯৮৪ সালে ৬ কোটি থেকে ২০১৪ সালে ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ)। দরিদ্র জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নের ব্যর্থতারই বহিঃপ্রকাশ, যা বাংলাদেশে ধর্মের প্রভাব এবং ধর্মীয় উগ্রতাকে উৎসাহিত করার ভিত্তি মজবুত করেছে।

সারণি ৩: বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণির গতি প্রবণতা, ১৯৮৪-২০১৬

গ্রাম/শহর	দরিদ্র		মধ্যবিত্ত								ধনী		সর্বমোট	
			নিম্ন		মধ্য		উচ্চ		মোট					
	১৯৮৪	২০১৬	১৯৮৪	২০১৬	১৯৮৪	২০১৬	১৯৮৪	২০১৬	১৯৮৪	২০১৬	১৯৮৪	২০১৬	১৯৮৪	২০১৬
গ্রাম (ভূমি মালিকানাভিত্তিক)														
% গ্রামীণ জনসংখ্যা	৬৩	৭১	১৬.৯	১৬	১১.৬	৮	৪.৭	৩	৩৩.২	২৭	৩.৮	২.০	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৫৩	৮৬.৩	১৪	১৯.৫	১০	৯.৭	৪	৩.৬	২.৮	৩২.৮	৩	২.৪৩	৮৪	১২১.৬
শহর (সম্পদ মূল্যভিত্তিক)														
% শহরের জনসংখ্যা	৪৫	৫০	৩০	২০	২০	১৫	৩	১০	৫৩	৪৫	২	৫	১০০	১০০
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭	১৯.২	৫	৭.৭	৩	৫.৮	০.৫	৩.৮	৮.৫	১৭.৩	০.৩	১.৯২	১৬	৩৮.৪
মোট (গ্রাম+শহর)														
% মোট জনসংখ্যা	৬০	৬৬	১৯	১৬.৯	১৩	৯.৭	৪.৫	৪.৭	৩৬.৫	৩১.৩	৩.৩	২.৭	১০০	১০০
জনসংখ্যা(মিলিয়ন)	৬০	১০৫.৫	১৯	২৭.১	১৩	১৫.৬	৪.৫	৭.৫	৩৬.৫	৫০.১	৩.৩	৪.৪	১০০	১৬০

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসাবকৃত। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে আমার একটি প্রবন্ধে ১৯৮৪-২০১২ সময়কালের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো নিয়ে যে পরিসংখ্যানিক হিসাব-পত্তর উল্লেখ করেছি ১৯৮৪-২০১৬ সময়কালের ক্ষেত্রেও হিসাবটি অনুরূপ (দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh, পৃ. ১৩)। বলা দরকার যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মর্মবস্তুর নিরিখে এসব তেমন কোনো ব্যত্যয় নয়। কারণ প্রবণতা একই আছে।

পদ্ধতিগত ধারণা: বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোকে চিহ্নিত করার জন্য সরকারিভাবে কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই। এ ক্ষেত্রে লেখক দেশের সমাজকাঠামোর গতি পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য বিভিন্ন আর্থসামাজিক শ্রেণির জনসংখ্যা পরিমাণ নির্ধারণে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। মানদণ্ড হিসাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বসতভিটার মালিকানা ও শহরের মানুষের সম্পদের মূল্যমানকে ধরা হয়েছে। শ্রেণিকরণের এই পদ্ধতি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে: গ্রামীণ এলাকায় বিত্তহীন অথবা কম সম্পদশালী শ্রেণি– যাদের জমির পরিমাণ ১০০ শতক পর্যন্ত এবং শহরের যেসব মানুষের মোট সম্পদের দাম ৫ লক্ষ টাকার কম, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে তাদের ধরা হয়েছে যেসব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জমির মালিকানা ১০১ থেকে ২৪৯ শতক এবং শহরের মানুষের ক্ষেত্রে যাদের সম্পদের দাম ৫ লক্ষ থেকে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত; গ্রামের মধ্য-মধ্যবিত্ত বিবেচিত হয়েছে ২৫০-৪৯৯ শতক জমির মালিকেরা এবং শহরে ধরা হয়েছে যাদের সম্পদের মূল্য ১০ থেকে ২৯ লক্ষ টাকা; গ্রামের যেসব জনগোষ্ঠীর সম্পদের পরিমাণ জমির মালিকানা ৫০০ থেকে ৭৪৯ শতক তারা উচ্চমধ্যবিত্ত এবং শহরের ক্ষেত্রে উচ্চমধ্যবিত্ত ধরা হয়েছে তাদের, যাদের সম্পদের মূল্য ৩০ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ধনী (উচ্চবিত্ত) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে গ্রামের ক্ষেত্রে ৭৫০ শতক বা তার বেশি জমির মালিকেরা এবং শহরের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব সম্পদশালীদের।

২. দেশের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ গ্রামে আর ২৮ শতাংশ শহরে বাস করে। কিন্তু শহরের তুলনায় গ্রামে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের সংখ্যা অনেক গুণ বেশি। দেশের মোট দরিদ্র মানুষের ৮২ শতাংশ গ্রামে এবং ১৮ শতাংশ শহরে বাস করে। গ্রামে বসবাসকারী ৬০ শতাংশ খানা ভূমিহীন। ৫০ ভাগ খানাতে কার্যত এখন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই (মনে রাখা দরকার বিদ্যুৎ মানে বালবের আলো নয়, বিদ্যুৎ মানে আলোকিত মানুষ গড়ার অন্যতম মাধ্যম)। দেশের শতকরা ৬৫ জন মানুষ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা থেকে কার্যত বঞ্চিত।

৩. বাংলাদেশে নগরায়ণ মূলত বস্তিয়ায়ন অথবা শহুরে জীবনের গ্রামায়ণ। এ নগরায়ণের পাশাপাশি শিল্পায়ন হয়নি বললেই চলে; যা হয়েছে তা হলো অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দুর্দশা-বঞ্চনা-উদ্ভূত হতাশা-নিরাশা। গ্রাম ও শহরের এই প্রকৃতির দারিদ্র্য ধর্মীয় উগ্রতাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সৃষ্টির জন্য সহায়ক ভিত্তিভূমি।

৪. বিগত ৩০ বছরে (১৯৮৪-২০১৬) দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ। অথচ বিত্তহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৬ শতাংশ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দারিদ্র্যতাড়িত মৌলবাদের বৃদ্ধির পরিমাণও গত ৩০ বছরে আনুপাতিক হারে বেশি।

৫. মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধারক বর্তমানে ৫ কোটি ৭১ লক্ষ মানুষ, যার মধ্যে ২ কোটি ৭১ লক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত (যারা মোট মধ্যবিত্তের ৫৪ শতাংশ), ১ কোটি ৫৬ লক্ষ মধ্য-মধ্যবিত্ত (মোট মধ্যবিত্তের ৩১ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। মধ্যবিত্তদের মধ্যে অস্থির-অস্থিতিশীল নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ আর মোট মধ্যবিত্তের ৮৫ শতাংশ মানুষ— এখান থেকেই গঠিত হয় মৌলবাদের মেধাশক্তি। ধর্মীয় মৌলবাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠিও এদের কব্জায়। সম্ভবত এ কারণেই ধর্মীয় মৌলবাদসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অধুনা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান যাদের ধরছে তাদের অধিকাংশই এই শ্রেণিভুক্ত।

এ দেশে বিগত ৩০ বছরে (১৯৮৪-২০১৬) শ্রেণিকাঠামোর পরিবর্তন যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি করেছে তা মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক। বিশ্লেষণ যা বলছে তা হলো নিম্নরূপ:

ক. বিগত ৩০ বছরে বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ৭৬ শতাংশই দরিদ্র আর ১৪ শতাংশ মূলত অতীতের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত।

খ. গ্রামের তুলনায় শহরে মধ্যবিত্তের পুঞ্জিভবন (concentration) বেশি। তবে নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসেবে দেশের মোট মধ্যবিত্তের প্রায় ৬৬ শতাংশের আবাস এখনো গ্রামে (যাদের ৫৯ শতাংশ নিম্নমধ্যবিত্ত)।

গ. বিগত ৩০ বছরে মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ বেড়েছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ: ১৯৮৪ সালে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ২০১৬ সালে ৫ কোটি ১ লক্ষ। মধ্যবিত্তে বর্ধমান শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা গঠিত হয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রুপে বৃদ্ধির কারণে। এই প্রবণতা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ওপরে উঠতে দেয় না আর মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্তের দিকে তাড়িত করে। হতাশা-নিরাশা সৃষ্টির জন্য এসবই যথেষ্ট সহায়ক প্রভাবক।

ঘ. বিগত ৩০ বছরে যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ শতাংশ ঠিক একই সময়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বৃদ্ধির হার ৪৩ শতাংশ আর অতীতের নিম্ন-মধ্যবিত্তদের এক বৃহৎ অংশ দরিদ্র গ্রুপে যোগ দিয়েছে। বিত্তের এ অধোঃগতি নিঃসন্দেহে মানুষকে করেছে, হতাশ, নিরাশ, অদৃষ্টবাদী। আর অদৃষ্টবাদী মানুষ

"ধর্মপ্রবণ" থেকে ধীরে ধীরে 'ধর্মান্ধ' হতে পারে— এ প্রবণতা অসম্ভব নয়।

ঙ. ২০১৬ সালে ধনী (উচ্চ শ্রেণি) জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষ। বিগত ৩০ বছরে নবসংযোজিত ধনীর সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ। অর্থাৎ ১৯৮৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধনিক শ্রেণির বৃদ্ধি হয়েছে ৩৩ শতাংশ। সম্পদ যে পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু হাতে এবং বৈষম্য বেড়েছে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মোট জনসংখ্যায় ধনীর সংখ্যা হ্রাস: ১৯৮৪ সালে ৩.৩ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে ২.৭ শতাংশে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, দেশে সম্পদ বৈষম্য কমেছে। এ কথার প্রকৃত অর্থ হলো ধনীদের হাতে অতীতের তুলনায় বেশি হারে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং কালো অর্থনীতির গবেষণায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধনীর মধ্যে একটা সংখ্যালঘু দল সৃষ্টি হয়েছে যারা "সুপার ধনী' (super-duper rich) অথবা অন্যভাবে বলা যায়, এদের মধ্যে ২০ শতাংশ ধনী সমগ্র ধনিক শ্রেণির সম্পদের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থাৎ বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের যে ব্যবধান ক্রমবর্ধমান তাতে করে অতি-ধনী (যাদের বলে super-duper rich) রেন্ট-সিকারদের যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তা থেকে বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রকে "For the 1%, of the 1%, by the 1%" নামে আখ্যায়িত করা যায়।

সবকিছু মিলে সম্পদ-সম্পত্তিতে মালিকানার বৈষম্য-অসমতাজনিত যে কাঠামো গড়ে উঠেছে তা শুধু দারিদ্র্য-অসমতা-বৈষম্যকে চিরস্থায়ী করেছে তা-ই নয় তা ধর্মীয় মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ চিরস্থায়ীকরণের উর্বর ভূমি প্রস্তুত করছে— এ বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই। আর এ সন্দেহ একেবারেই নেই এ কারণেও যে মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ-এর বহিঃস্থ প্রধান ফ্যাক্টর হোতা সাম্রাজ্যবাদ— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বৈশ্বিক মৌল-কৌশলিক চার সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য সমীকরণে কোনোই পরিবর্তন হয়নি এবং নিকট ভবিষ্যতে সে পরিবর্তন সম্ভাবনাও তেমন নেই। সাম্রাজ্যবাদের এই মহাকৌশল বাস্তবায়িত করতে হলেও আমাদের মতো দেশে বৈষম্য-অসমতা জিইয়ে রাখতে হবে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য-বৈষম্য অবস্থার অধোঃগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে (যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আবার যাদের ২০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের ৮০ শতাংশ সম্পদ)। একদিকে এই প্রকট গণ-দারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা-বৈষম্য আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্যসংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ— এসবই বাংলাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাসহ উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শক্তিশালী অনুকূল পরিসর সৃষ্টি করেছে। আর এসবের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান গতিতে চলছে সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈকল্য এবং শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ।

সুতরাং প্রাথমিক বিশ্লেষণে আমি এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে যদিও কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত প্রায় ৭ দশকের (১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) মানবকল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সব শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন তার স্বার্থবাহী বিশ্বায়নসহ বহিঃস্থ অনেক উপাদানই (external factors) এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করছে। উপসংহারিক এই থিসিসটি (পাঠকের মনে) আপাতদৃষ্টিতে একধরনের ভ্রান্ত ধারণা অথবা ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে যে, তাহলে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব সৃষ্টিতে অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি (internal factors) 'মুখ্য'; আর বহিঃস্থ বিষয়াদি (external factors) 'গৌণ'। এ নিয়ে আমার যুক্তি হলো পৃথিবী যখন দুই মেরুতে বিশ্বে (অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ) বিভক্ত এ কথা যুক্তিসঙ্গত হলেও হতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবেষ্টিত এক মেরুর বিশ্বে সম্ভবত উল্টোটাই সত্য। আর বিগত সাত দশকের উন্নয়নধারা আপেক্ষিক বিবেচনায় দুই মেরুর বিশ্বসমীকরণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী মেরুর দ্বারাই অধিকতর প্রভাবান্বিত এবং এ সমীকরণ দ্বারাই পরিচালিত। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে– সাম্রাজ্যবাদই (অর্থাৎ বহিঃস্থ উপাদান) আমাদের দেশসহ অনেক দেশেই ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের নিয়ামক নিয়ন্ত্রক।

অধ্যায় ৮

মৌলবাদের অর্থনীতি: গঠনপ্রক্রিয়া, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা

"সব সত্য তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে।
প্রথম পর্যায়ে তা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ঠাট্টা-মশকারা করা হয়।
দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে হিংস্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।
তৃতীয় পর্যায়ে তাকে স্বতঃপ্রমাণিত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"
আর্থার শোপেনহাউয়ের, ১৭৮৮-১৮৬০

আগেই বলেছি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরেফিরে এসেছে ইসলাম ধর্ম তোষণকারী স্বৈরতন্ত্র এবং/অথবা কালো টাকার স্বার্থবাহী সংসদ। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির এ দুর্বৃত্তায়নের হোতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পরসম্পদ লুণ্ঠনকারী-পরজীবীদের দল— Rent Seekers, যারা আবার সরকার ও রাজনীতিকে তাদের অধীন দাস-সত্তায় পরিণত করেছে। এসবই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তু। গুরুত্বের কারণে বিষয়টির একটু সবিস্তারে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আমরা ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম। আর সে লক্ষ্যে চার স্তম্ভবিশিষ্ট ১৯৭২-এর সংবিধানে অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে "অসাম্প্রদায়িকতা" অথবা "ধর্মনিরপেক্ষতা" (Secularism)-এর কথা বলেছিলাম যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে অন্যতম করণীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে বলা হয়েছিল, "ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার

উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে" [দেখুন ১৯৭২-এর সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১২ (ক), (খ), (গ), (ঘ)]। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও দেশীয় চক্রান্তে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো পথে— সাম্প্রদায়িকতার পথে পরিচালিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দুর্বৃত্তায়িত হয় অর্থনীতি, যা রাজনীতি দুর্বৃত্তায়নের কার্যকর চাহিদা (effective demand for criminalization of politics) বৃদ্ধি করে। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের সুযোগ নেয় ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব। এসবের ফলে তথাকথিত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কাঠামোর অধীন সত্তা হিসেবে আমাদের দেশে বিকৃত মুক্তবাজার অর্থনীতির মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এমন একধরনের কাঠামো যে কাঠামো উৎপাদনশীল পুঁজি বিকাশে সহায়ক নয়। সৃষ্টি হয় অন্যের সম্পদ জোরদখলকারী, দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাওখাওয়া শ্রেণি, মহাদুর্নীতিবাজ, মানুষের উপর অত্যাচারকারী, ফাটকাবাজ গোষ্ঠী— এক কথায় যাদের নাম "রেন্ট-সিকার" (rent-seeker), যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না অন্যের সম্পদ বেদখল-জোরদখল করে।

এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটিই এখন এমন এক সম-স্বার্থের ত্রিভুজাকৃতির রূপ নিয়েছে যেখানে ত্রিভুজের উপরের বাহুতে আছে ওই রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী আর নিচের দুই বাহুর একদিকে আছে রাষ্ট্র ও সরকার; এবং অন্য (তৃতীয়) বাহুতে আছে রাজনীতি; যে রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা এখন প্রবল। রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনীতি এখন 'রেন্ট-সিকার' গোষ্ঠীর অনুগত, অধীন, দাসসত্তা বলা চলে (দেখুন ছক ৫)।[৪১]

[৪১] বাংলাদেশে অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং রেন্ট-সিকিং সিস্টেমের উত্থান-বিকাশ এবং স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, আবুল (২০১৫ক), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ; বারকাত আবুল (২০১৬ক), বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা; এবং Barkat Abul (২০১৬b), Understanding Dynamics of a Third World Economy: An Interdisciplinary Approach following New Pragmatism.

ছক ৫: রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী, রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সম-স্বার্থের ত্রিভুজ

আমাদের দেশে 'রেন্ট সিকিং' পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নিচুতলার মানুষের দুর্দশা-বঞ্চনার উৎস— বিত্তের সৃষ্টি নয় বিত্তের হস্তান্তরমাত্র। অর্থাৎ কাঠামোগত বিষয়টি এ রকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থসম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না—কীভাবে কী হয়ে গেল! এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র আর্থসামাজিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে "For the 1%, Of the 1%, By the 1%"। এ অবস্থায় "বৈষম্যহীন রাজনীতি ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ" বিনির্মাণ-এর প্রশ্নটি এখন আর কার্যকর প্রশ্ন নয়। কারণ সেক্ষেত্রে 'রেন্ট সিকিং' কাঠামো-উদ্ভূত সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে যাবে অথবা তা মহাবিপদে পড়বে; 'রেন্ট-সিকার'-দের অধীনস্থ রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি তা হতে দিতে পারে না।

আমাদের দেশে রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের নির্দেশকসমূহ নিম্নরূপ: গত চার দশকে (১৯৭৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ অনুদান এসেছে তার ৭৫ শতাংশই লুট করেছে দুর্বৃত্তরা (এসব লুটেরার সংখ্যা আসলে ২ লক্ষ; আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লক্ষ মানুষ); এরা এখন বছরে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করে (যার ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ হবে ৬-৭ লক্ষ কোটি টাকা[৪২]), এরাই বছরে ৪০-৫০

[৪২] আমার হিসাবে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে মোট ২৫ থেকে ৩০টি পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব (কারণ পদ্মা সেতুর মতো সেতুর নির্মাণ ব্যয় ৫ বছরে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার কোটি টাকা); অথবা এ অর্থের মাত্র ২০ শতাংশ ব্যয় করে বাংলাদেশ থেকে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দূর করা সম্ভব; অথবা এ অর্থের মাত্র ১০ শতাংশ ব্যয় করে আমাদের দেশ থেকে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগ চিরতরে উচ্ছেদ করা সম্ভব; অথবা এ

হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের/পাচারের (money laundering) সাথে সম্পৃক্ত; এরাই বছরে ২০-২৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত; এরাই কমপক্ষে ১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণখেলাপি; এরাই সবধরনের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে দেড় কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে;[৪৩] এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যেকোনো সরকারি কেনাকাটায় (মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়) অথবা বড় ধরনের বিনিয়োগে এদের কমপক্ষে ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি।

রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী— অর্থনীতির দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করে যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপরিচালন অসম্ভব। তারা মূলধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তিকে ফান্ড করে; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করে; তারা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ ও তা ভোগ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করে; তারা লুট করে সবকিছু— জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; এবং তারাই বিচারহীনতার সংস্কৃতির ধারক-বাহক-প্রভাবক-ত্বরান্বয়ক-উজ্জীবক। তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করে— স্বধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা তারা করে না; তারা অর্থ-প্রতিপত্তি দিয়ে জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলে— তারা জানে স্থানভেদে ৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদের একটি আসন ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব এবং সেটা তারা রীতিমতো চর্চা করে[৪৪]। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে; মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে তেমন কিছু নেই— এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে, সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সংগঠন বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান।[৪৫]

অর্থের ৪০ শতাংশ ব্যয় করে সারা দেশে সরকারিভাবে উচ্চতর গুণগত মানসম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও প্রাথমিক (দ্বিতীয় স্তরসহ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব।

[৪৩] বারকাত আবুল, ২০১৬, বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

[৪৪] এখানে আমাদের জাতীয় সংসদের সদস্যদের পেশা-সংশ্লিষ্ট একটা বিষয় বলা প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারে সংসদ সদস্যদের মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ ছিলেন "ব্যবসায়ী", আর এখনকার সংসদে "ব্যবসায়ীরা" হলেন মোট সংসদ সদস্যের ৮৮ শতাংশ। অবশ্য সম্মানিত ওইসব সংসদ সদস্যের "ব্যবসাটা" যে কী তা নির্বাচন কমিশনও জানে না।

[৪৫] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৫, "Criminalization of Politics in Bangladesh", SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March 2005;

প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে-হারিয়েছে, আর প্রগতির ধারাও সেই সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি-হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকে, হতে থাকে হতাশ ও নিরাশ, মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা হারায় এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয়, তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তিনির্ভর— ভাগ্যনির্ভর হতে বাধ্য হয়। আর এ নিয়তিনির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ শতাংশ কৃষকই এখন কার্যত ভূমিহীন, যে কৃষিভিত্তির ওপরই এ দেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়ামটাই ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি। তারা অতীতে চোখের সামনে দেখেছে কেমন করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এমনকি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল গণতন্ত্র চর্চার স্থান ভারতেও দু-চারটে সংসদ আসন দখল করে ১০/১৫ বছর পরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল এবং মানুষ এখনো অনুরূপ দৃশ্য লক্ষ করছে। অন্যান্য অনেক উদাহরণসহ এটাও বাংলাদেশে রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণে তাদের স্বপ্নকে বাস্তব করবে বলে তারা মনে করে। আর তারা স্পষ্ট জানে যে দলীয় রাজনীতিকে স্বয়ম্ভর করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত প্রয়োজন। অন্যথায় ক্যাডারভিত্তিক দল গঠন ও পরিচালন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মডেল চর্চা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে এখন ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির সহায়তায় মৌলবাদ যেসব আর্থরাজনৈতিক মডেলের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তার মধ্যে ১২টি বৃহৎ বর্গ হলো নিম্নরূপ:

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বিমা, লিজিং, পুঁজি বাজারসংশ্লিষ্ট
২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদ্রাসা, স্কুল (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক), কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার, বিভিন্ন ভোকেশনাল (কারিগরি) প্রশিক্ষণকেন্দ্র।
৩. ঔষধ শিল্প ও স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান: ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হাসপাতাল।
৪. ধর্মপ্রতিষ্ঠান: মসজিদসহ মাদ্রাসা, মসজিদ।
৫. ব্যবসায়িক-বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান: খুচরা ব্যবসা, পাইকারি ব্যবসা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর।

আবুল বারকাত, ২০০৫, "Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh", Lecture Session organized by SIDA and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March 2005.

৬. যোগাযোগ-পরিবহনব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান: রিকশা, ভ্যান, তিন চাকার সিএনজি, কার, ট্রাক, বাস, লঞ্চ, ট্রলার, স্টিমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজ।

৭. জমি ও রিয়েল এস্টেট: জমি কেনা-বেচা, দালানকোঠা, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি।

৮. সংবাদমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি: প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বিভিন্ন ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

৯. স্থানীয় সরকার: তৃণমূল থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায়ের স্থানীয় সরকার।

১০. বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন: বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংস্থা (২৩২টি), ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন (যেমন ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন), বিভিন্ন ধরনের ইসলামিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান (যেমন সাইমুম শিল্প গোষ্ঠী, হেফাজতে ইসলাম ইত্যাদি)।

১১. ইসলামি জঙ্গি সংগঠন (যেমন বাংলাভাই, জেএমবি, হুজি-বি এবং অনুরূপ কর্মসূচিভিত্তিক সংগঠন/সংস্থা/গ্রপ)।

১২. কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান (ছক ৬ দ্রষ্টব্য)।

ছক ৬: মৌলবাদের আর্থরাজনৈতিক সাংগঠনিক মডেল

এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই আনুষ্ঠানিক অর্থে মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় (যেমন স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবী সমিতি) এ ক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেওয়া হয় এবং সেই সাথে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন (যেমন বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্প[৪৬] যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয়)। মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ব্যবহার করে আপাতদৃষ্টিতে মুনাফা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মুনাফা সৃষ্টির নিরঙ্কুশ তুলনামূলক সুবিধা (absolute comparative advantage) তাদের আছে (বিষয়টি ধর্ম ও ব্রেইন: স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন বা "neurotheology" শিরোনামক একাদশ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

মৌলবাদের অর্থনীতির উল্লিখিত মডেলসমূহের ব্যবস্থাপনা-পরিচালন কৌশল সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতিকৌশল থেকে অনেক দিক থেকে ভিন্ন। তাদের অর্থনৈতিক মডেল পরিচালন কৌশলের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. প্রতিটি মডেলই রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ উচ্চমানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত।

২. প্রতিটি মডেলে বহু স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যেখানে নির্দিষ্ট স্তরের মূল নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনস্থ।

৩. বিভিন্ন মডেলের মধ্যে সমন্বয় (কো-অর্ডিনেশন) থাকলেও উচ্চস্তরের পরস্পর পরিচিতি যথেষ্ট গোপন রাখা হয় (একধরনের গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি বলা চলে)।

---

[৪৬] এসব কর্মকাণ্ডভিত্তিক ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনগুলো আপাতদৃষ্টিতে মূলধারার ইসলামপন্থী দলের থেকে আলাদা— জঙ্গিরূপ। এটা আসলে প্রকৃত সত্যের বাহ্যিক রূপ (appearance), প্রকৃত সত্য হলো ঠিক উল্টোটা– মৌলবাদী জঙ্গিরা মূলধারার ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশে এই রকম জঙ্গি-মৌলবাদী গ্রুপের সংখ্যা ১৩৩টি। এসব ধর্মভিত্তিক জঙ্গি গ্রুপের তালিকা পরিশিষ্ট ১-এ এবং তাদের মূল বক্তব্য পরিশিষ্ট ৩, ৪, ৫-এ দেখুন। এসব জঙ্গি সংগঠন বিদেশি উৎস এবং/অথবা দেশের মৌলবাদের অর্থনীতি থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ প্রাথমিক তালিকার জন্য বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ২০০৭, "Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the basis of 30 Case Studies", in Berger MS and A Barkat" (2007), Radical Islam and Development AID in Bangladesh, Netherlands Institute for International Relations, "Clingendael"। জঙ্গিরা যে ব্যাপক হারে চাঁদাবাজি করে তার একটা নমুনা এ রকম: বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জেএমবি মাত্র তিন মাসে আনুমানিক ৯০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ চাঁদাবাজি করেছে (দেখুন, মুহিত এএমএ, মালিক খসরু ও নূহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, ২০০৬, Rise of Fanatic Extremism in Bangladesh, পৃ. ৬২)।

৪. প্রতিটি মডেলই সামরিক শৃঙ্খলার আদলে পরিচালিত সুসংবদ্ধ-সুশৃঙ্খল ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান।

৫. কোনো মডেল যখনই আর্থরাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অন্য মডেলের তুলনায় অধিক ফলপ্রদ মনে করা হয়, তখনই তা যথাসাধ্য দ্রুত অন্য স্থানে বাস্তবায়িত (replicate) করা হয়।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে" রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বিজ্ঞানপ্রযুক্তিকে তারা তাদের মতো করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট।[৪৭] এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে মৌলবাদীর মূলে আছে ভীতি ও আবেগ। আর এ আবেগ আসে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা থেকে তথাপি এসব আবেগানুভূতি কেবল সেকেলে এবং পিছুটান নয় বরং তারা সৃজনশীল এবং 'আধুনিকতা'র ধারক-বাহকও।

অনেকেই মনে করেন এ দেশে সশস্ত্র জঙ্গি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে সব অর্থ বিদেশ থেকেই পেয়ে থাকে। এ ধারণা বহুলাংশে মিথ্যা হতে পারে যদিও সমমতাদর্শী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে তাদের যৌথ উদ্যোগের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। আর সেই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুদানের বড় অংশ বিদেশ থেকেই আসে

[৪৭] মৌলবাদ বিশ্বায়নের সৃষ্টি এক নবজাত অথচ বেপরোয়া সন্তানের মতো যার বিরূপ প্রতিফল এবং সময়মতো সীমাহীন খারাপ ব্যবহার বিশ্বায়ন ভোগ করছে। মৌলবাদী দল বিশ্বের সব জায়গায় অত্যাধুনিক যোগাযোগপ্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইরানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার আগে তার উপদেশ-নির্দেশনার বিষয়গুলো ভিডিও এবং ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করেন। হিন্দু জঙ্গিরাও মানুষের মধ্যে হিন্দু ধর্মের স্বরূপের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য ব্যাপকভাবে ই-মেইল এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে (এন্থনি গিডেনস্, ২০০৩, Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, 50-51)। মিসরের আরব বসন্ত আন্দোলনে ইসলামিক ব্রাদারহুডের সদস্যরা ব্যাপক হারে এসএমএস, ফেসবুক, ই-মেইল, টুইটারসহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। করছে। বাংলাদেশে গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিপক্ষ মৌলবাদী শক্তি ব্লগসহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। করছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, মৌলবাদী জঙ্গিরা সামাজিক যোগাযোগপ্রযুক্তির 'real time' ব্যবহারে তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের (social-media platforms) যেগুলোতে তাদের নিরঙ্কুশ দক্ষতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে তার মধ্যে আছে websites, chat forums (chat), online videos, blog site (blog), mobile communications, information networks, popular daily updates on social-networking site, daily updates on photo-specific social-networking site (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন, The International Institute for Strategic Studies, 2016, Asia-Pacific Regional Security Assessment 2016, পৃ. ২০৫)।

(প্রদর্শ ২ দেখুন)। উল্লিখিত ধারণা বহুলাংশে সত্য নয় এ জন্য যে মৌলবাদ ইতিমধ্যে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

আর এসব ঘটনা যে প্রক্রিয়ায় যেভাবে ঘটেছে এবং ঘটছে তা হলো এ রকম— উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বাহক শক্তিটি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের সম্পদ হরিলুট করেছে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে ১৯৭০-৮০-র দশকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ সরবরাহ পেয়েছে; এসব অর্থ-সম্পদ তারা সংশ্লিষ্ট আর্থরাজনৈতিক

প্রদর্শ ২: মূলধারার 'ইসলামি' দল এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের মধ্যে সম্পর্ক: অর্থের উৎস

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত 'জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) নামে একটি ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠন ৬৩টি জেলা প্রশাসন কার্যালয় এবং আদালত প্রাঙ্গণে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে একসঙ্গে ৫০০ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এ ঘটনার পর একশ্রেণির সুচতুর ব্যক্তি হঠাৎ করেই মূলধারার 'ইসলামি' দলের সাথে ধর্মীয় জঙ্গিবাদীদের সম্পর্ক অস্বীকার করার অপচেষ্টা চালায়। হঠাৎ সম্পর্কহীন করার তাদের এই অপচেষ্টা এবং 'পৃথক' করে ভাববার অপপ্রয়াস কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকন্তু মূল 'ইসলামি' দলের সাথে উগ্রবাদীদের সম্পর্ক আরও যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা হওয়ার কারণ হলো: শুধু সশস্ত্র জিহাদীরাই নয়, মূল ধারার 'ইসলামি' দলও তাদের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'রাষ্ট্রক্ষমতা দখল', দলীয়প্রধান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, 'ইসলামি আইন খুব শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে' এবং অপেক্ষা করুন এবং দেখুন'... নির্দেশনা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।' এ দেশের প্রধান ইসলামি দল প্রকাশ্যে এখনো নাম উল্লেখ করে বোমা বিস্ফোরণ কর্মকাণ্ড এবং বোমা নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা জ্ঞাপন বা বাতিল (জেএমবি) করার কথা বলেনি। যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, জেএমবির গ্রেফতার হওয়া সব নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামী অথবা তাদের ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল। বোমা হামলা কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হতো তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে এবং জঙ্গিদের প্রায় সব মামলাতেই তাদের প্রশাসনিক প্রভাব সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে গ্রেফতারকৃত জঙ্গিদের মুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অধিকাংশ মামলার ক্ষেত্রেই তাদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছে। কিন্তু যেখানেই তারা ব্যর্থ হয়েছে, তারা তাড়াতাড়ি করে গ্রেফতার হওয়া সংশ্লিষ্ট জঙ্গিকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। এসব বিষয়ে বিভিন্ন খবর খুব দ্রুত বাংলাদেশের সব প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরগুলো হচ্ছে: প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫; শিরোনাম– 'চট্টগ্রামে জামায়াতে-ইসলামী'র সাথে জড়িত পাঁচ জেএমবি নেতা গ্রেফতার; ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন; দ্য ডেইলি স্টার ৩১ আগস্ট, ২০০৫– 'এক বছরে দাতাদের কাছে থেকে ৩৪টি ইসলামি এনজিও দুইশত কোটি টাকার বেশি সাহায্য পেয়েছে; দ্য ডেইলি স্টার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ 'জামায়াত জঙ্গি সম্পর্ক এখন স্পষ্ট'; ইত্তেফাক ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ 'এক হাজারের অধিক জঙ্গির মুক্তি, এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ জামায়াতে ইসলামী দলের; দ্য ডেইলি স্টার ৫ ডিসেম্বর, ২০০৫'। ২৯ নভেম্বরের দু'টি আদালত প্রাঙ্গণে হত্যাকাণ্ড ঘটার মাত্র কদিন আগেই সরকার কুয়েতি এনজিও রিভাইভাল ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস) নামের একটি শীর্ষস্থানীয় দাতা সংস্থা জঙ্গিদের জন্য দেওয়া প্রায় ২ কোটি টাকার সাহায্য ছাড় দেওয়ার জন্য

সম্মতি দেয়। এ ছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে জঙ্গি-সংশ্লিষ্ট অর্থায়নের শাস্তিস্বরূপ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশকে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (বাংলাদেশ ব্যাংক) এ পর্যন্ত কমপক্ষে তিনবার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছে (দেখুন, ফ্রান্সেস হ্যারিসন, ২০১৩, Political Islam & the Elections in Bangladesh, পৃ. ৭১)।

মডেল গঠনে বিনিয়োগ করেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা করছে; আর এ মুনাফার একাংশ তারা ব্যয় করছে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে[৪৮], একাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রসারে, আর (কখনো কখনো) একাংশ নতুন খাত-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে। এখানে উল্লেখ জরুরি যে তারা তাদের মোট মুনাফার (অপারেটিং প্রফিট) একাংশ সরকারের কাছে কর্পোরেট কর প্রদানের আগেই তাদেরই সৃষ্ট আপাতদৃষ্টিতে জনকল্যাণমূলক কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদেরই মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠান—বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করছে।

আমার ২০১৬ সালের হিসাবে বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক নিট মুনাফা আনুমানিক ৩,১৬২ কোটি টাকা (৪০ কোটি মার্কিন ডলার; যেখানে ২০১৬ সালের শেষের দিকের বিনিময় হার ধরা হয়েছে ১ ডলার = ৭৯.০০ টাকা)। এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭.৮ শতাংশ আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (যার মধ্যে আছে ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানিসহ পুঁজিবাজার); দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯.৪ শতাংশ আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে[৪৯]; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৭

[৪৮] রাজনৈতিক কর্মীদের বেতন ভাতা; দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনে ব্যয়; "হেফাজতে ইসলাম" জাতীয় কর্মকাণ্ডে ব্যয়; অস্ত্র প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা (ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় অভিযোগ তুলেছে যে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ১৪৮টি অস্ত্র প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে— এ অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে খণ্ডন করা হয়নি। অনুরূপ অভিযোগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও।)

[৪৯] এ দেশে মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আছে আনুমানিক ২৩১টি বেসরকারি সংস্থা। এদের মধ্যে মধ্যে ১০টি সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামি এনজিও উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত— যেমন: রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস), রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামী, সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্মস, কাতার চ্যারিটেবল সোসাইটি, আল-মুনতাদা আল-ইসলামী, ইসলামিক রিলিফ এজেন্সি, আল-ফরকাল ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ অর্গানাইজেশন, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, মুসলিম এইড বাংলাদেশ। বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের অধিকাংশই এসব সংগঠন পায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এদের অনেকেই এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশের দাতা সংস্থার অর্থ পেয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা তা সরাসরি পেয়ে থাকে, যার হিসাবপত্তর সরকারি নথিপত্রে অনুপস্থিত। মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারি সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য সংস্থার প্লাটফর্মকে ব্যবহার করা এবং পরবর্তী সময়ে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্মিলন ঘটানো। এ দেশে মূল ধারায় বেসরকারি সংস্থারা যখন নারীর ক্ষমতায়ন-সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন মৌলবাদী বেসরকারি সংস্কৃতি পিছিয়ে নেই, তবে তারা বলছে, "নারীর ক্ষমতায়ন হতে হবে পর্দার অন্তরালে"।

শতাংশ; ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.০ শতাংশ; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.৪ শতাংশ; জমিসহ রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.০ শতাংশ, সংবাদমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তি থেকে আসে ৭.৪ শতাংশ, আর পরিবহন-যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৪ শতাংশ (সারণি ৪ দেখুন)। নিট মুনাফার এ প্যাটার্ন কিছুটা অনুমাননির্ভর হলেও যথেষ্ট দিকনির্দেশনামূলক— অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মৌলবাদের অর্থনীতির বিকাশধারা নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ক। সেই সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি নিট মুনাফার যে ধারা দেখা যায় তা মূল স্রোতের অর্থনীতির সাথেও যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ যেখানে ইতিমধ্যেই রেন্ট সিকিং-উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি যদি বছরে ৩,১৬২ কোটি টাকা নিট মুনাফা সৃষ্টি করে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ মাত্রা (degree of communalization of economy)— যা মৌলবাদের অর্থনীতির শক্তি-মাত্রা নির্দেশ করে— হবে নিম্নরূপ:

১. দেশের মোট বার্ষিক জাতীয় বিনিয়োগের (চলতি মূল্যে) ১.০৩ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

২. দেশের মোট বার্ষিক বেসরকারি বিনিয়োগের ১.৩৩ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৩. সরকারের মোট বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২.২ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৪. দেশের বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১.৫৫ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৫. সরকারের মোট বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৫.৫৯ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৬. সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ৮.৬৩ শতাংশের সমপরিমাণ, অথবা

৭. বিগত ৪০ বছরে (১৯৭৫-২০১৬) মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্ট ক্রমপুঞ্জীভূত নিট মুনাফার মোট পরিমাণ (total cumulative net profit) হবে বর্তমান বাজারমূল্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ কোটি টাকা (যে পরিমাণ অর্থ সরকারের গত অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের দ্বিগুণ অথবা সরকারের মোট রাজস্ব আয়ের সমপরিমাণ)।

সারণি ৪: বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক নিট মুনাফা*, ২০১৬ সাল

	অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক নিট মুনাফা (কোটি টাকায়)	মোট নিট মুনাফার শতাংশ
১.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি	৮৭৮	২৭.৮
২.	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: খুচরা, পাইকারি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	৩৩৭	১০.৭
৩.	ঔষধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	৩১৬	১০.০
৪.	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়	২৯৮	৯.৪
৫.	যোগাযোগ-পরিবহন: রিকশা, ভ্যান, তিন চাকার সিএনজি, কার, ট্রাক, বাস, লঞ্চ, ট্রলার, স্টিমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজ	২৩৪	৭.৪
৬.	জমি, দালান (রিয়েল এস্টেট)	২৫৩	৮.০
৭.	সংবাদমাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম	২৩৩	৭.৪
৮.	বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন	৬১৩	১৯.৪
	মোট	৩,১৬২	১০০

উৎস: গ্রন্থকার কর্তৃক হিসাবকৃত। এ হিসাবটি গ্রন্থকার ২০০৫ সাল থেকে প্রতিবছরই প্রণয়ন করেন। এ হিসাবের পদ্ধতিগত বিষয়াদি "পরিমাপ পদ্ধতি প্রসঙ্গে" শিরোনামে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

* পরিমাপ পদ্ধতি প্রসঙ্গে: অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মুনাফা পরিমাপে "হিউরিস্টিক পদ্ধতি" প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে বেশি মাত্রায় অনুমাননির্ভরতা থাকলেও অনুমানের ভিত্তি যথেষ্ট মাত্রায় বিজ্ঞানসম্মত। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে হিসাবপত্তর প্রকৃত সত্যের কমবেশি হতে পারে (প্রকৃত সত্য কেউ জানে না; তা প্রকাশিত নয়)। কয়েকটি খাত-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগসংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া গেলেও (যা সঠিক নয়) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে তথ্য অনুপস্থিত/অপ্রকাশিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশিত অডিট রিপোর্ট এবং/অথবা বার্ষিক রিপোর্ট থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পূর্ণাঙ্গ সত্য/সঠিক নয়। এ হিসাব প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে (দেখুন, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি, ড. আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা, ২১ এপ্রিল, ২০০৫)।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির আসলে নিট মুনাফা নিয়ে ওপরে যা বলা হলো তা অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ মাত্রা অথবা মৌলবাদের অর্থনীতির শক্তি-মাত্রার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশক নয়, তা আংশিক মাত্র। মোট মুনাফা অথবা মোট অপারেটিং মুনাফা (total operating profit) থেকে প্রভিশন ও কর্পোরেট ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দিয়ে নিট মুনাফা হিসাব করা হয়। মৌলবাদের অর্থনীতির অনেক সেক্টরেই মোট মুনাফার একাংশ সরকারের কাছে কর্পোরেট ট্যাক্স দেওয়ার আগেই তাদেরই সৃষ্ট বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনে হস্তান্তর করা হয় (বলা যায় 'পাচার' করা হয়), যে পরিমাণ অর্থের ওপর কর্পোরেট কর দিতে হয় না। আর ওইসব ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণভাবেই মৌলবাদীদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান শুধু ব্যানারটা জনকল্যাণমূলক (ওই 'কল্যাণ' করা হয় মূলত তাদেরই রাজনৈতিক কর্মী ও সহকর্মীদের প্রতি)। এটাকে বলা চলে মৌলবাদের অর্থনীতি পরিচালিত "রাজনৈতিক কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি" (Political CSR)। আমার এসব কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বিবিধ: (১) নিট মুনাফা দিয়ে বিচার করলে মৌলবাদের অর্থনীতির শক্তি-মাত্রা পুরোপুরি বোঝা যায় না; বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে হলে 'প্রকৃত' অপারেটিং প্রফিট-এর হিসাবপত্তর জানতে হবে, (২) বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে হলে অপারেটিং প্রফিট-এর যে অংশ বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্টে পাচার করা হচ্ছে সেসব কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পুরোপুরি জানতে হবে।

ওপরে যা বললাম, এসবের পাশাপাশি বিকাশ-বিস্তৃতির সম্ভাবনা নির্দেশে আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে যেহেতু মৌলবাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (গত ২০ বছরের হিসাবে বার্ষিক গড়ে ১০-১১ শতাংশ) মূল স্রোতের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (গত ২০ বছরের হিসেবে বার্ষিক গড়ে ৫-৬ শতাংশ)-এর তুলনায় অধিক (শুধু অধিক নয় দ্বিগুণ বেশি), সেহেতু অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ— অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে— যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই।

আমার হিসাবে মৌলবাদের অর্থনীতির মধ্যে প্রধান খাত-ক্ষেত্র হলো ব্যাংক, বিমা ও লিজিং কোম্পানি। বিষয়টির গুরুত্বের কারণে মৌলবাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত ব্যাংকিং খাত (অর্থাৎ প্রধানত ইসলামী ব্যাংক) সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা দেওয়া সঙ্গত, যা আমার নিজস্ব বক্তব্য নয়। এসব বক্তব্য বর্তমান সরকার কর্তৃক 'স্বাধীন পরিচালক' (Independent Director)-দের একজনের বক্তব্য যিনি পরিচালক হিসেবে লিখিত পাঁচটি বক্তব্য পেশ করেছেন। বক্তব্যসমূহ অনেক দিক থেকে গুরুত্ববহ বিধায় হুবহু উল্লেখ করছি, "(আগামী জাতীয় নির্বাচনে)

এরাই সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র, বোমা ক্রয় করে আন্দোলনে যাবে এবং সরকারকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে।...Annual Report 2015, page no. 125 অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪৩৩ কোটি টাকা ১ কোটি ৩৮ লক্ষ লোকের জন্য সিএসআর খাতে খরচ করা হয়েছে। কারা ঐ সমস্ত লোক? তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি কি?... ১৯৮৪ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট doubtful income হলো ৭৪১ কোটি টাকা।... আর charitable খাতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ১,৩১৭ কোটি টাকা।... উক্ত টাকা কোথায় খরচ করা হয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।... খোঁজ নিয়ে জানা গেছে— এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং গ্রাম-বাংলার দরিদ্র ও অসহায় মানুষদেরকে টার্গেটে রেখে গ্রামীণ ব্যাংকের মডেলকে ইসলামী টার্ম ও ভাষা ব্যবহার করে RDS (Rural Development Scheme) এবং UPDS (Urban Poor Development Scheme) নামক প্রকল্প তৈরি করে এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী জামাত-শিবিরের ত্যাগী নেতাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।...RDS এবং UPDS এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে জামাত-শিবিরের কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ইসলামী ব্যাংক সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামের লোকদেরকে জামাত-শিবিরের কর্মী বানিয়ে তাদের মাধ্যমে জামাতের ভোটের বিপ্লব ঘটিয়ে এ দেশকে একটি জঙ্গি রাষ্ট্র বানানোর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।...এ ধরনের বিনিয়োগের নামে পল্লী অঞ্চলে ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে ... জামাত ও মওদুদী দর্শনের কর্মীদেরকে আর্থিকভাবে সুবিধা প্রদান এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।...জামাত আদর্শের সার্ভেয়ার কোম্পানী এবং প্যানেল ল'ইয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ ভেলুয়েশন এবং লিগ্যাল ওপিনিয়ন করানো হচ্ছে, ফলে জামাত আদর্শের গ্রাহকদের জমি অতি মূল্যায়ন করে এবং লিগ্যাল ওপিনিয়ন দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লোন দেয়া হচ্ছে।...মাইক্রোক্রেডিটের সকল ফিল্ড অফিসার, ক্লায়েন্ট ও মেম্বারদের (RDS, UPDS ও CSR-এর উপকারভোগীদের) নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে জঙ্গি তৎপরতা...দমন সম্ভব নয়...। ব্যাংকের শরীয়াহ সুপারভাইজারী কমিটিতে বর্তমানে কর্মরত ৮ জনের মধ্যে ৬ জন জামায়াতে ইসলামের রোকন পর্যায়ে ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন। ... ইসলামী ব্যাংকে সারা দেশের শিবির কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে কামিল ডিগ্রিধারীদেরকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।... Aim and objective of IBTRA এর Sl. No. 3 Topics এর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তাকে জামাতের রাজনীতি করার দাওয়াত এবং দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর কৌশল গোপনে শিক্ষা দেয়া হয়।...বহির্বিশ্বে পদায়নের

ক্ষেত্রে জামায়াতের রোকন পর্যায়ের কমকর্তা ছাড়া কাউকে নিয়োগ দেয়া হয় না।" [৫০]

মৌলবাদের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হলো মোট ৮টি বৃহৎ বর্গের খাত-প্রতিষ্ঠান (সারণি ৪ দেখুন), যার মধ্যে প্রথম বৃহৎ বর্গ হলো "আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে আছে ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি, পুঁজিবাজার"। 'ব্যাংক' হলো প্রথম এই বৃহৎবর্গের অন্তর্ভুক্ত মাত্র একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আর ব্যাংক নামক এ প্রতিষ্ঠানের মাত্র একটি হলো "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ"। সুতরাং "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ" নিয়ে যা বলব তা মৌলবাদের অর্থনীতি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতি ও জঙ্গিত্বের অংশমাত্র। উপরে "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ"-এর একজন স্বাধীন পরিচালককে উদ্ধৃত করে যা বলেছি, তা যথেষ্ট মাত্রায় দিকনির্দেশনামূলক হলেও সেটা মৌলবাদের অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতি ও জঙ্গিত্বের গভীরতা অনুধাবনে পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয় না। আর সে কারণেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ নিয়ে আরো কয়েকটি তথ্য দিলে (যা অধিকাংশেরই অজানা) সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ কিছুটা পূর্ণতা পেতে পারে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো এ রকম: (২০১৭ সালে এ ব্যাংকের) মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১৩,৬০০ জন, যাদের কমপক্ষে ৯০ শতাংশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা-ক্যাডার; ব্যাংক ব্যবস্থাপকদের প্রথম সারির ৫০০ জন কর্মকর্তাই ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতৃবৃন্দ; ব্যাংকের মোট ৩২৩টি শাখার শাখাপ্রধান হিসেবে পদায়নের ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতি করাকে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়; পদোন্নতির ক্ষেত্রে ছাত্রজীবনে শিবিরের রাজনীতি (অথবা বর্তমানে জামায়াতের রাজনীতি) করাকে আবশ্যিক যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়; ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যেককেই প্রতি মাসে বেতন পাওয়ামাত্রই ৫০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত 'ইয়ানত' (চাঁদা) প্রদান করতে হয়, যা সরাসরি জামায়াতে ইসলামীর কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। আর 'ইয়ানত'-এর পাশাপাশি আছে ঋণগ্রহীতাদের মাসিক চাঁদা, জাকাতের টাকা এবং ডাউটফুল আয়ের অংশ

[৫০] ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম সদস্য সামীম মোহাম্মদ আফজাল সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে বেশ লেখালেখি করেছেন। তার মতে, "ইসলামী ব্যাংক: জামায়াতীদের আলাদ্দীনের এক আশ্চর্য প্রদীপ"। এ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে উপরে যা লেখা হয়েছে সেসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ২০১৬, (তৃতীয় প্রকাশ) জঙ্গিবাদের উৎস: মওদুদীপন্থীদের ভ্রান্ত শিক্ষা, রাজনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবসা, পৃ. ১৬-৩৬, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ২০১৬, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৪-২৮; সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ২০১৬ (চতুর্থ প্রকাশ), গবেষণার ধারণাপত্র, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২২-২৪, ১৭১-১৯১।

প্রদান; বিদেশে অবস্থানরত জামায়াতি আদর্শের ব্যক্তিদের প্রদত্ত 'ইয়ানত'-এর মাধ্যমে হুন্ডি প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর কয়েক শত কোটি টাকা দেশে আসে; ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মওদুদী ও জামায়াতিদের বই-পুস্তক ক্রয়ে বাধ্য; জামায়াতি উকিল (প্যানেল অ্যাডভোকেট) ৭৯১ জন, জামায়াতি সার্ভেয়ার কোম্পানি মোট ৪৮টি ও জামায়াতি বিমা কোম্পানি মোট ৪৩টি— এদের পেছনে ব্যাংকের বার্ষিক ব্যয় কমপক্ষে ৩ হাজার কোটি টাকা; ইসলামী ব্যাংকে এক কোটির বেশি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আমানতের পরিমাণ ৬৭ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা (২০১৬ সালে), এ আমানত থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৬১ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৫,৭০০ জন (মোট ঋণ ৩,৮৩৪ কোটি টাকা)। আর ১ কোটি টাকার উপর ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৪,২৭০ জন (মোট ঋণ ৫০,৫০৯ কোটি টাকা)— এদের মধ্যে প্রায় ৯,০০০ জন ঋণগ্রহীতাই জামায়াত আদর্শের ব্যক্তি; ব্যাংকে ক্ষুদ্রঋণ মডেলের ব্যবসার আদলে আরডিএস ও ইউপিডিএস প্রকল্প পরিচালিত হয় ২৮০টি শাখায় (মোট ৩২৩টি শাখার মধ্যে); এ প্রকল্পের ২,৭০০ জন কর্মচারী-কর্মকর্তার সবাই ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা-ক্যাডার; এ প্রকল্পের সদস্যসংখ্যা ১০ লক্ষের ওপরে, যাদের প্রায় সবাই হতদরিদ্র-দরিদ্র মানুষ; এসব দরিদ্র মানুষকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির আগেই জামায়াতের সদস্য বানানো হয়; এক্ষেত্রে প্রতি ৫ জন সদস্য নিয়ে ১টি গ্রুপ তৈরি করা হয় এবং এ ধরনের ৮টি গ্রুপের ৪০ জন সদস্য নিয়ে ১টি কেন্দ্র পরিচালনা করা হয় (কেন্দ্রের সভাপতি-সম্পাদককে অবশ্যই জামায়াত কর্মী হতে হয়), প্রতি কেন্দ্রের ৪০ জন সদস্য বছরে ৫২ সপ্তাহের মধ্যে ৪৬ সপ্তাহে ৪৮টি সভা অনুষ্ঠান করতে বাধ্য; এ হিসাবে সারা দেশে বছরে ১৩ লক্ষ ৭৪ হাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়— এসব সভার মূল উদ্দেশ্য ইসলাম শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। এসব সভার 'মূল' বক্তব্য প্রত্যেকে যদি বছরে কমপক্ষে ১৫ জনের মধ্যে প্রচার করে (পরিবারের সদস্যসহ), তাহলে তাদের এসব বক্তব্য বছরে ২ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। আর এসব কর্মসূচির বয়স ২০ বছর হলে জামায়াতি এ বক্তব্য তো বাংলাদেশের প্রায় ৮৮ হাজার গ্রামের সবার কাছেই পৌঁছে যাওয়ার কথা! আমার ধারণা এসব সত্য কথা বলার পরে মাত্র একটি কথা বলা ছাড়া নতুন আর কিছুই বলার প্রয়োজন পড়ে না। আর কথাটি হলো— উপরে যা বললাম তা মৌলবাদের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত ৮টি বৃহৎ বর্গের খাত-প্রতিষ্ঠানের "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" নামক একটি বৃহৎ বর্গের প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত 'ব্যাংক' নামক মাত্র একটি খাত-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র একটি ব্যাংকের (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ) হিসাবপত্তর। সুতরাং মৌলবাদের অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনীতি ও জঙ্গিত্বের

যোগসূত্র ও ব্যাপ্তি বুঝতে হলে উপরে যা বলেছি তাকে বড় কোনো এক সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে।

এখন থেকে দু'দশক আগে আমি যখন মৌলবাদের অর্থনীতির (বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্র নিয়ে) বার্ষিক নিট মুনাফার হিসাবপত্তর দেওয়া শুরু করি তখন থেকেই অনেকেই— এদের মধ্যে ছিল অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী (যারা "মৌলবাদের অর্থনীতি" ধারণাটি সঠিক নয় বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং/অথবা আমার সংশ্লিষ্ট হিসাবপত্তর নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন) এবং একই সাথে ছিল জামায়াতে ইসলামী (যারা সমসাময়িক সময়ে তাদের মুখপাত্র "দৈনিক সংগ্রাম"-এ "আবুল বারকাত-এর অ-বারকাতিয় বয়ান" শিরোনামে সিরিজ রচনা করেছিল)। আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদদের প্রশ্ন ছিল: মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যে নিট মুনাফা (net profit) দেখানো হচ্ছে (অর্থাৎ আমি দেখাচ্ছি) সেসবের বিপরীতে ওদের মোট সম্পদের (total asset) পরিমাণ কত? আর জামায়াতে ইসলামী (তাদের দৈনিক পত্রিকা "সংগ্রাম"-এ) বলেছিল "আবুল বারকাত-এর এসব হিসাবপত্তর মনগড়া"; "বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি নিয়ে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই"। এসব বিবেচনা থেকেই আমার মনে হয়েছে যে মৌলবাদের অর্থনীতির (যার নিট মুনাফার হিসাবপত্তর সারণি ৪-এ দেখানো হয়েছে) মূল খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিট মুনাফার পাশাপাশি এসব খাত প্রতিষ্ঠান-এর মোট সম্পদের হিসাবপত্তর দেওয়াটা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনবোধ থেকেই সংশ্লিষ্ট হিসাবপত্তর করার চেষ্টা করেছি (বিগত ২০ বছর যাবৎ)। এসব হিসেব যথেষ্ট দুরূহ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে এসব হিসাবপত্তর উত্থাপনের একটি চেষ্টা করেছি। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে বিভিন্ন খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি আপনি মৌলবাদের অর্থনীতির নিট মুনাফার হিসাব উপস্থাপন করেন সেসবের বিপরীতে ওইসব খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি তাদের মোট কী পরিমাণ বিনিয়োগ অথবা কী পরিমাণ পুঁজি অথবা কী পরিমাণ মোট সম্পদ রয়েছে (অথবা প্রয়োজন)— এসব নিয়ে কেন কোনো কিছু বলেন না? অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোনো কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করিনি, কারণ আমার মতে, "মৌলবাদের অর্থনীতি" কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়। তবে 'সময়' (time) ও 'পরিপ্রেক্ষিত' (context) বিবেচনায় মনে হয়েছে (অনেক বছর যাবৎই মনে হয় কিন্তু হিসাবপত্তরটা বেশ জটিল) এসব প্রশ্নের সম্ভাব্য আনুমানিক সদুত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজন বোধ থেকেই বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টাফল সারণি ৫-এ উপস্থাপন করেছি, যেখানে মৌলবাদের অর্থনীতির মোট আটটি খাতওয়ারি নিট মুনাফার বিপরীতে মোট সম্পদের আনুমানিক পরিমাণ দেখানো

হয়েছে (আর সারণির নিচে হিসাবের পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিষয়াদি উপস্থাপন করা হয়েছে)।

আগেই বলেছি (সারণি ৪-এ) যে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির মোট নিট মুনাফা ৩ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। আর সারণি ৫-এ ওই নিট মুনাফা অর্জনে খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মোট সম্পদের (total asset) সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির নিট মুনাফার বিপরীতে অনুমিত হিসাবে দেখা যায় যে ২০১৬ সালে ৩ হাজার ১৬২ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জনের পেছনে আছে মোট ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৯ কোটি টাকার মোট সম্পদ। মৌলবাদের অর্থনীতির মোট সম্পদ নিয়ে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ জরুরি:

প্রথমত: ২০১৬ সালের হিসাবে বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির ৮টি বৃহৎ বর্গের সেক্টরে (সারণি ৫ দ্রষ্টব্য) মোট ৩ হাজার ১৬২ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জনের পেছনে আছে ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৯ টাকার মোট সম্পদ। এ হিসাব যথেষ্টমাত্রায় অনুমিত হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল প্রবণতা নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়ত: মৌলবাদের অর্থনীতির মোট সম্পদের মধ্যে প্রায় ৩১ শতাংশ আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে (ব্যাংক, বিমা ও লিজিং কোম্পানি)। আর প্রায় ১৭ শতাংশ আছে বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে। বিষয়টি যথেষ্ট ভাবনা উদ্রেগকারী। কারণ একদিকে যেমন তাদের আছে নিরেট আর্থিক খাতে অঢেল সম্পদ; আর অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে "নীরিহ খাত"– "সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসংশ্লিষ্ট খাতে" (বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, শিল্পী-সাহিত্য গোষ্ঠী) আছে মৌলবাদের অর্থনীতির মোট সম্পদের যথেষ্ট বড় অংশ (যা মূলধারার অর্থনীতিতে কল্পনাতীত)। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায় তাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যেখানে তারা একদিকে অর্থনীতিকে কব্জা করতে চায় (অথবা বেশ কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়) আর অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে যৌক্তিক কারণেই যথেষ্ট মাত্রায় শক্তিশালী করতে চায়।

তৃতীয়ত: নিট মুনাফার সাথে মোট সম্পদের অনুপাত (যাকে বলা হয় রিটার্ন অন অ্যাসেট) খাত প্রতিষ্ঠানওয়ারি একইরকম নয়। যেমন, এ

অনুপাত তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট খাতে সর্বোচ্চ (০.৬৬৭ শতাংশ) আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সর্বনিম্ন (০.৪১৭ শতাংশ)। রিটার্ন অন অ্যাসেট-এর এ হিসাবও প্রবণতার দিকনির্দেশনামূলক; তবে খাতওয়ারি যা দেখানো হয়েছে বাস্তবতা তার থেকে একটু ভিন্ন হতেই পারে।

চতুর্থত: "মৌলবাদের অর্থনীতি" যে বাংলাদেশের মূল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে এবং এ দখল ক্রমবর্ধমান— তা চারটি অনুপাত (বা সূচক) দিয়ে বোঝা সম্ভব। অনুপাত চারটি নিম্নরূপ: (১) মৌলবাদের অর্থনীতির মোট সম্পদ দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (অর্থাৎ জিডিপি)-এর ৩৮.৫ শতাংশ-এর সমপরিমাণ (২০১৬ সালের মোট জিডিপির পরিমাণ ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা); (২) মৌলবাদের অর্থনীতির মোট সম্পদ মোট দেশজ বিনিয়োগের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি (২০১৬ সালে মোট দেশজ বিনিয়োগ ৫ লক্ষ ৮ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা)[৫১], (৩) মৌলবাদের অর্থনীতির মোট সম্পদের পরিমাণ সরকারের ২০১৬-১৭ সালের মোট জাতীয় বাজেটের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি (২০১৬-১৭ সালের সংশোধিত বাজেট ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা); (৪) গত ৪০ বছরে মৌলবাদের অর্থনীতিতে ক্রমপুঞ্জীভূত যে নিট মুনাফা হয়েছে (প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা) তা ওই অর্থনীতির মোট বর্তমান সম্পদের (৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৯ কোটি টাকা) এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ (এ সম্পদ ধীরে ধীরে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে)।

[৫১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৬) অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, পৃ. xvii.

সারণি ৫: বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক নিট মুনাফার (net profit) সাথে সংশ্লিষ্ট খাত-প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের (total asset) আনুমানিক সম্পর্ক, ২০১৬ সাল

মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠান	২০১৬ সালে নিট মুনাফা (কোটি টাকায়)	২০১৬ সালে মোট সম্পদ (কোটি টাকায়)	মোট গড় সম্পদের কত শতাংশ নিট মুনাফা (Return on average assets)
১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি	৮৭৮	২,০২,২২৯	০.৪৩৪
২. বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: খুচরা ব্যবসা, পাইকারি ব্যবসা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	৩৭৩	৮৯,৫২০	০.৪১৭
৩. ঔষধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	৩১৬	৬৬,৩৬০	০.৪৭৬
৪. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়	২৯৮	৫৩,৬৪০	০.৫৫৬
৫. যোগাযোগ/পরিবহন: রিকশা, ভ্যান, তিন চাকার সিএনজি, কার, ট্রাক, বাস, লঞ্চ, ট্রলার, স্টিমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, উড়োজাহাজ	২৩৪	৪৪,৯৭০	০.৫২০
৬. জমি, দালান (রিয়েল এস্টেট)	২৫৩	৫৩,১৩০	০.৪৭৬
৭. সংবাদমাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম	২৩৩	৩৪,৯৫০	০.৬৬৭
৮. বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	৬১৩	১,১০,৩৪০	০.৫৫৬
মোট	৩,১৬২	৬,৫৫,১৩৯	০.৪৮৩

হিসাবের পদ্ধতিগত নোট: এ সারণিতে যেসব হিসাবপত্তর দেওয়া হয়েছে তার পদ্ধতিগত (methodological) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ জরুরি। এ সারণিতে নিট মুনাফার তথ্য নেওয়া হয়েছে সারণি ৪ থেকে (যেখানে সারণি ৪-এর পদ্ধতিগত বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে)। এ সারণির তৃতীয় কলামে মোট গড় সম্পদের (total average assset) যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা আনুমানিক, কারণসংশ্লিষ্ট খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ব্যালান্স শিট-এ যে হিসাব দেওয়া হয় তা অনেক কারণেই বিশ্বাসযোগ্য নয় (অন্যান্য খাত-

প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা বিশ্বাসযোগ্য নয়)। এ ক্ষেত্রে আমি সংশ্লিষ্ট খাত-প্রতিষ্ঠান-এর প্রকৃত অথবা সত্য ভাষ্যের কাছাকাছি যারা/যেসব ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান হিসাবপত্তর দিতে পারে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করেছি। যেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে 'উপার্জিত সম্পদ' (earning asset) এবং 'অনুপার্জিত সম্পদ' (non-earning asset)-এর বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। 'উপার্জিত সম্পদের' মধ্যে আছে ঋণ, অগ্রিম, বিনিয়োগ এবং শ্রেণিকৃত (Classified) ঋণ (বিষয়টি জটিল?), আর 'অনুপার্জিত সম্পদের" মধ্যে আছে স্থায়ী সম্পদ. জমি-দালানসহ অন্যান্য সম্পদ। এসব কিছু ব্যালান্স শিট-এ যা দেখানো হয় তা যথেষ্ট মাত্রায় কৃত্রিম। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিট মুনাফার তুলনায় মোট সম্পদের পরিমাণ বেশি হবে, কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেখানে মোট সম্পদ গুরুত্ববহ সেখানে 'নিট মুনাফা' ও 'মোট সম্পদের" অনুপাতটা ভিন্ন হবে। এখানে যৌক্তিক সূত্র হলো এ রকম যে নিট মুনাফার সাথে মোট সম্পদের যে হার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট খাতের ক্ষেত্রে বেশি হবে। অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিট মুনাফা মোট সম্পদের সম্পর্ক নিয়ে কাগজপত্তরে যা কিছু দেখানো হয় সেসবে বহু ধরনের বিকৃতি বা অসামঞ্জস্য আছে। এর সবকিছুই আমি বিবেচনা করেছি। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পদ্ধতিতত্ত্বগতভাবে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ (অন্তত হিসাবপত্তর করার ক্ষেত্রে) তা হলো প্রতিটি বৃহৎ বর্গের খাতের মধ্যে (ছোট বর্গের) উপখাত আছে, যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি বৃহৎ বর্গের খাত হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক, বিমা, লিজিং কোম্পানি হবে উপখাত। আবার প্রতিটি "উপখাত" অনেক কোম্পানির সমষ্টি। যেসব উপখাত-কোম্পানির হিসাবপত্তর জটিল এবং ক্ষেত্রবিশেষে বেশ কিছু অনুমাননির্ভর (যাকে বলে crucial assumption) হতে হয়েছে। পদ্ধতিগতভাবে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে অনেক উপখাতের ক্ষেত্রেই মোট সংশ্লিষ্ট উপখাত সংখ্যা এবং তাদের আকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া দুষ্কর। এ ধরনের ক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ কিছু অনুমাননির্ভর হতে হয়েছে। আর আপাতত সর্বশেষ পদ্ধতিতত্ত্বীয় বিষয় বলা চলে এ রকম যে, মৌলবাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও খাত-উপখাতের হিসাবপত্তরের সাথে মূলধারার অর্থনীতির সংশ্লিষ্ট খাত-উপখাতের তুলনা করা বেশ দুষ্কর; কারণ মূলধারার অর্থনীতির এসব হিসাবপত্তর পাওয়া যায় না (সম্ভবত কখনো সরকারিভাবে তা করা হয়নি)।

মৌলবাদের অর্থনীতির গঠনপ্রক্রিয়া, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা-প্রবণতা বিশ্লেষণে কয়েকটি গুরুত্ববহ বিষয় নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং মৌলবাদী জঙ্গিত্ব দমনের উপাদান হিসেবে দেখা উচিত। বিশ্লেষিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিম্নরূপ:

প্রথমত: তারা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভাব্য উচ্চ মুনাফা অর্জনের খাতসমূহে বিনিয়োগ করছে, অর্থাৎ পারলৌকিক জীবন নিয়ে লৌকিকতায় তারা যতই পারদর্শিতা প্রদর্শন করুক না কেন ইহলৌকিক-পার্থিব জীবন সম্পর্কে তারা অনেকের চেয়ে অধিকতর সজাগ-সচেতন।

দ্বিতীয়ত: তারা স্ট্রাটেজিক বিনিয়োগে অর্থাৎ কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত, ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়োগে অধিক উৎসাহী।

তৃতীয়ত: বিনিয়োগের খাত নির্ধারণে তারা জনগণের সাথে দ্রুত সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রগুলোকেই বেছে নিয়েছে।

চতুর্থত: তাদের খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিনিয়োগকাঠামো যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ।

পঞ্চমত: তাদের বার্ষিক নিট মুনাফার মাত্র ১০ শতাংশ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে কমপক্ষে ৫ লক্ষ দলীয় সদস্য পূর্ণকালীন নিযুক্তি দেওয়া সম্ভব। তারা সেটা করে এবং অন্যান্য খাতে ক্রস-ভর্তুকি দেয়।

ষষ্ঠত: সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রাটেজিক অবস্থানে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ক্যাডারদের পরিকল্পিতভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য তারা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা (অপ)ব্যবহার করে।

সপ্তমত: সশস্ত্র জঙ্গিরা এতই সংগঠিত ও শক্তিমান যে জঙ্গিরা ধরা পড়লে তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতার ভেতরে কোনো কোনো শক্তি তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগ করে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়; চিহ্নিত জঙ্গিদের ধরে ছেড়ে দিতে হয়; আর তাদের নিয়ন্ত্রক গডফাদাররা সম্পূর্ণ ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

অষ্টমত: রেন্ট সিকিং সিস্টেমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন-উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা যেমন মানুষের মধ্যে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি এ আবেগানুভূতি ব্যবহার করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে তারও ভিত্তি ওই রেন্ট সিকিং, যা দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে যে মৌলবাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তারও ভিত্তি যে রেন্ট সিকিং তার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

নবমত: মৌলবাদের অর্থনীতির মূল খাত-ক্ষেত্রগুলোই এমন যেখানে তুলনামূলক সহজেই রেন্ট সিকিং কর্মকাণ্ড পরিচালন সম্ভব। এসব খাত-ক্ষেত্রের অন্যতম হলো আর্থিক খাতের ব্যাংকিং, বিমা, লিজিং কোম্পানি, পুঁজিবাজার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন, জমি-দালান-রিয়েল এস্টেট, অতি মুনাফাকারী প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদ মাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বেসরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন।

দশমত: ধর্মের নামে হিসাবপত্তর পদ্ধতি শরিয়াহ্ভিত্তিক করার ক্ষেত্রে নানান ফাঁকিজুকি, যা রেন্ট সিকিং-এর নামান্তরমাত্রই নয়, তা রেন্ট সিকিং সর্বোচ্চকরণে সহায়ক।

একাদশত: তথাকথিত শরিয়াহ্র নামে তারা তাদের আর্থিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে রাজনীতি ও সরকারকে ব্যবহার করে এমনসব বিধিবিধান-নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রেন্ট সিকিং-এর মধ্যেই পড়ে।

দ্বাদশত: মূল অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি সৃষ্টির ফলে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক এ গোষ্ঠী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম যে দেশে হরতাল-অবরোধসহ অনুরূপ বিষয়াদি অর্থায়ন করে তারা বাজার অর্থনীতির কালোবাজারি-মজুদদারি উস্কে দিয়ে বাজারসন্ত্রাসী ও মূল্যসন্ত্রাসী রেন্ট-সিকারদের সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রে এমনটিও হওয়া সম্ভব যে মৌলবাদের অর্থনীতি নিজেই সরাসরি রেন্ট-সিকার-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

এতক্ষণ যা কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করলাম তা থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ শুধু মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতিই সৃষ্টি ও বিকশিত করেনি, তারা সৃষ্টি করেছে "সরকারের

মধ্যে সরকার" এবং "রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র" (রাষ্ট্রের হেন যন্ত্রাংশ নেই যেখানে তাদের উপস্থিতি সরব-সবল নয়)। এবং তাদের সৃষ্ট মিনিঅর্থনীতি, মিনিসরকার ও মিনিরাষ্ট্রের সম্মিলনে এবং বহিঃস্থ শক্তির সহায়তায় তারা "অর্থনৈতিক শক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"-র মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখল করে নিতে চায়। আর এ ক্ষেত্রে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ওই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কার্যকর রণনীতিমাত্র।

অধ্যায় ৯

মৌলবাদের অর্থনীতি, রাজনীতি ও জঙ্গিত্ব: যোগসূত্র কোথায়?

"সুইসাইড সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হবে যখন আমরা (মার্কিনরা) অন্যদেশে হস্তক্ষেপ বন্ধ করব।"

হাওয়ার্ড জিন, ১৯২২-২০১০

ধর্মীয় মৌলবাদ এ দেশে ইতিমধ্যে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া" (economic power-based political process) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ শক্তি এখন অন্দর (দেশজ) ও বাহির-এর (বহিঃস্থ) বিভিন্ন শক্তির সহায়তায় ধর্মের নামে 'জিহাদ'-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতাটাই দখল করতে চায়। এ অবস্থায় মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ অনুধাবনের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও রাজনীতিসম কর্মকাণ্ডে মৌলবাদী জঙ্গিদের সম্পৃক্ততা, ব্যাপকতা, গভীরতা ও সম্ভাব্য প্রবণতাসমূহের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিগত ১৭ বছরে, ১৯৯৯-২০১৬ সময়কালে বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিরা বহু মানুষ হত্যা করেছে, অনেককে গুরুতর আহত করেছে, অনেক প্রতিষ্ঠান নির্মূল করেছে (দেখুন সারণি ৬ ও ৭)। আর এসবই যে তারা ইসলাম ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে করছে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই (এসব নিয়ে তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মর্মার্থ জানতে পরিশিষ্ট ৩, ৪, ৫ দেখুন)।

ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলবাদী জঙ্গিত্বের যোগসূত্র সম্পর্কে ইতিমধ্যে বলেছি এবং এ অধ্যায়েও বলা হবে। এখানে আপাতত দুটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমত, এখন থেকে ১২ বছর আগে ১৭ আগস্ট ২০০৫-এ ওরা দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় একই সময়ে সিরিজ বোমা হামলা ঘটায় এবং হামলার সময়ে "জিহাদি ইশতেহার" বিলি করে

("জিহাদি ইশতেহারের" পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট ৩ দেখুন)। সংশ্লিষ্ট তথ্য বলছে যে একযোগে দেশের ৬৩ জেলায় মৌলবাদী ওই জঙ্গিদের বোমা হামলা চালাতে বিশ্বস্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা বাবদ ৮ বছরে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা; এবং ওই অপারেশনে খরচ হয়েছে ২ থেকে ৩ কোটি টাকা।[৫২] আর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ জনাব শাহরিয়ার কবির, "১৭ আগস্টের বোমা হামলার জন্য গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতার কথা যারা বলেন তাদের একটি পুরোনো প্রবাদ জানা উচিত— শর্ষের ভিতর ভূত থাকলে সেই শর্ষ দিয়ে ভূত তাড়ানো যায় না।"[৫৩] দ্বিতীয়ত, এ কথা সত্য মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না যে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রায়ই আমাদের এমন ধারণা দেওয়া হয় যে আমাদের দেশে বড় মাপের অথবা বৃহৎ পরিচয়ের মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনসমূহ (যেমন জেএমবি, এবিটি, হুজি ইত্যাদি) অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত জঙ্গি সংগঠনসমূহের তুলনায় অধিকতর ভয়াবহ অথবা বেশি মারাত্মক (এ রকমটি গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা বলে/মনে করে)। আমার ধারণায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠনসমূহ অপেক্ষাকৃত বড় মাপের সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক ও অনেক বেশি কার্যকর হতে সক্ষম। কারণ অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের সংগঠনসমূহে নেতৃত্বের পর্যায় সংখ্যা (layers of leader) স্বল্প, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরাই বাস্তবায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, ফলে তাদের কার্যক্রমের গোপনীয়তা রক্ষা করা অনেক সহজ। আর অপেক্ষাকৃত বড় মাপের জঙ্গি সংগঠন বহু স্তরবিশিষ্ট হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী থেকে বাস্তবায়নকারী পর্যন্ত অনেকগুলো স্তর পেরোতে হয়, যেখানে কোনো না কোনো স্তরে জঙ্গি কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট গোপনীয় সিদ্ধান্ত ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়। আমি আমার গবেষণায় এও দেখেছি যে, অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের বেশ কিছু মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন অপেক্ষাকৃত বড় মাপের সংগঠনের সাথে একীভূত হতে দ্বিধা বোধ করে।

[৫২] কাজী মুকুল (সম্পাদনা), ২০০৫, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদের ডাক: রাজনৈতিক দল ও সিভিল সমাজের করণীয়। ঢাকা : একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, পৃ. ৮৭।

[৫৩] ঐ, পৃ. ৬।

সারণি ৬: বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিদের দ্বারা সংগঠিত বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাক্রম: ১৯৯৯-২০১৬

ঘটনার তারিখ	লক্ষ্যবস্তু মাত্রা/ প্রকৃতি এবং স্থান	প্রত্যক্ষ ক্ষতি
৭ মার্চ ১৯৯৯	উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, যশোর	নিহত ৬, আহত ৭৫
৮ অক্টোবর ১৯৯৯	আহমেদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ, খুলনা	নিহত ৭, আহত ৪০
২০ জানুয়ারি ২০০১	সিপিবি'র সভায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, ঢাকা	নিহত ৭, আহত ৫২
১৪ এপ্রিল ২০০১	পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে রমনার বটমূলে বোমা হামলা, ঢাকা	নিহত ১১, আহত ১২০
৩ জুন ২০০১	রোমান ক্যাথলিক গির্জায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জ	নিহত ১০, আহত ২৫
১৫ জুন ২০০১	আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জ	নিহত ২২, আহত ১০০
২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১	মোল্লাহাট, বাগেরহাটে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মিছিলে বোমা হামলা	নিহত ৮, আহত ১০৫
২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১	সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভার পাশে বোমা হামলা	নিহত ৪, আহত ১৭
১৬ নভেম্বর ২০০১	হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরিকে হত্যা	নিহত
২১ এপ্রিল ২০০২	বৌদ্ধ ভিক্ষু মাহাথেরো হত্যা	নিহত
২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২	সাতক্ষীরায় সিনেমা হল ও সার্কাস প্রদর্শনীতে বোমা হামলা	নিহত ৩, আহত ১৭
৭ ডিসেম্বর ২০০২	৪টি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ, ময়মনসিংহ	নিহত ২৭, আহত ২৯৮
১৭ জানুয়ারি ২০০৩	সুফি সমাধিতে বোমা বিস্ফোরণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল	নিহত ৯ আহত ২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩	দিনাজপুর মেসে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ০৩
১২ জানুয়ারি ২০০৪	হজরত শাহজালাল (র.) মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৫, আহত ৫২
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪	অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	গুরুতর আহত এবং পরে মৃত্যু
২ এপ্রিল ২০০৪	১০ ট্রাক অস্ত্রবাহী জাহাজ, চট্টগ্রাম বন্দর, ২০০০ অটোমেটিক/সেমি অটোমেটিক রাইফেল, ৪০টি রকেট চালিত গ্রেনেড, ২৫,০০০ হ্যান্ড গ্রেনেড, ১৮ লাখ ছোট-বড় গুলি ও বিপুল পরিমাণ বারুদ।	
২১ মে ২০০৪	হজরত শাহজালালের (র.) মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৮, ব্রিটিশ হাইকমিশনারসহ আহত ১০১
২১ আগস্ট ২০০৪	আওয়ামী লীগের (শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	নিহত ২৪, আহত ৫০৩

২৭ জানুয়ারি ২০০৫	বিরোধী দলের (আওয়ামী লীগ) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়াসহ নিহত ৫, আহত ১৫০
০৯ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, সিরাজগঞ্জে ব্র্যাক ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি	
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	এনজিও (ব্র্যাক) অফিসে বোমা হামলা, রায়পুর, নওগাঁ	-
২০০৩-২০০৫	বাংলাভাই দল কর্তৃক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত (জেএমবি), উত্তর বাংলা	নিহত ৩৫, আহত ১২৩
১৭ আগস্ট ২০০৫ (এ দিনে প্রচারিত জেএমবি-র জিহাদি ইশতেহার পরিশিষ্ট ৩-এ দেখুন)	৬৩ জেলায় একই সাথে সিরিজ বোমা হামলা (মুন্সিগঞ্জ ছাড়া সব জেলা)	নিহত ৩, আহত কমপক্ষে ১০০
৩ অক্টোবর ২০০৫	৩টি আদালত ভবনে বোমা হামলা (চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম)	নিহত ২, আহত ৩৯
১৮ অক্টোবর ২০০৫	দ্রুত বিচার আইন টাইব্যুনাল সিলেটে বোমা বিস্ফোরণ	আহত ১
১৪ নভেম্বর ২০০৫	বিচারকের উপর বোমা হামলা, ঝালকাঠি	নিহত ৩, আহত ৪
২৯ নভেম্বর ২০০৫	চট্টগ্রামের কোর্ট এরিয়ায় বোমা হামলা	নিহত ৯, আহত ৭৮
১ ডিসেম্বর ২০০৫	জেলা প্রশাসক অফিসে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১, আহত ৫০
৮ ডিসেম্বর ২০০৫	উদীচী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নেত্রকোনা	নিহত ৯, আহত ৫০
২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	আইনজীবী ভবনে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১০, আহত ২২০
২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	পুলিশ বক্সে বোমা হামলা, চট্টগ্রাম	নিহত ৩, আহত ২৫
১৩ মার্চ ২০০৬	কুমিল্লা কালিয়াঝুরিতে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ৪, আহত ১০
২১ জুন ২০০৮	সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের র‍্যালিতে বোমা হামলা	নিহত ১, আহত ৫১
২১ ডিসেম্বর ২০১৩	পীর লুৎফর রহমানসহ ৬ জন হত্যাকাণ্ড	নিহত ৬
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	ময়মনসিংহের ত্রিশালে ১০-১৫ জন সশস্ত্র মুখোশধারী জেএমবি সদস্য কর্তৃক প্রিজন ভ্যান থেকে জেএমবি সদস্য ছিনতাই	নিহত ১, আহত ২
২৭ আগস্ট ২০১৪	নুরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা	নিহত ১
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫	ইতালির নাগরিক সিজার তাবেলা হত্যা, ঢাকা	নিহত ১
৩ অক্টোবর ২০১৫	জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি হত্যা, রংপুর	নিহত ১
১৫ অক্টোবর ২০১৫	খিজির হায়াত খান হত্যা	নিহত ১

২৩ অক্টোবর ২০১৫	ঢাকার হোসেনী দালানে গ্রেনেড হামলা	নিহত ২
২৯ অক্টোবর ২০১৫	লুক সরকার এর ওপর হামলা	আহত ১
২৬ নভেম্বর ২০১৫	বগুড়ায় শিয়া মসজিদে গুলিবর্ষণ	নিহত ১
৭ মার্চ ২০১৩	শাহবাগ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী সানিউর রহমানকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা	আহত ১
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার শ্রী শ্রী শান্ত গোরিয়ারকে হত্যা	নিহত ১
২৩ এপ্রিল ২০১৬	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আ ফ ম রেজাউল করিম সিদ্দিককে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা	নিহত ১
২৫ এপ্রিল ২০১৬	রাজধানীর কলাবাগানে জুলহাস মান্নানের বাসায় জুলহাস মান্নান ও তনয় মজুমদারকে কুপিয়ে হত্যা	নিহত ২
৩০ এপ্রিল ২০১৬	কাপড়ের ব্যবসায়ী নিখিল জোয়ার্দারকে কুপিয়ে হত্যা	নিহত ১
৭ মে ২০১৬	মো. শহিদুল্লাহকে গলা কেটে হত্যা (তিনি একজন মুদি দোকানি এবং পীরের অনুসারী; নিজেও পীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন)	নিহত ১
১৪ মে ২০১৬	বান্দরবানের নাইক্ষ্যাংছড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষু মং শৈউ চাককে কুপিয়ে হত্যা (নিহত ভিক্ষু ধাম্মা ওয়াসা নামে পরিচিত ছিলেন)	নিহত ১
২০ মে ২০১৬	হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মীর সানাউর রহমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইফুজ্জামানকে হত্যার জন্য চাপাতি দিয়ে আঘাত করা। মীর সানাউর রহমান ঘটনাস্থলে নিহত হন; সাইফুজ্জামান গুরুতর আহত	নিহত ১, আহত ১
২৫ মে ২০১৬	গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জুতা ব্যবসায়ী দেবেশ চন্দ্র প্রামাণিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা	নিহত ১
৭ জুন ২০১৬	৭০ বছর বয়সী পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলীকে গলা কেটে হত্যা	নিহত ১
১০ জুন ২০১৬	পাবনায় সৎসঙ্গ আশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডেকে (৬২) কুপিয়ে হত্যা। নিহত নিত্যরঞ্জন প্রায় ৪০ বছর ধরে পাবনার হেমায়েতপুরের শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র সৎসঙ্গ সেবাশ্রমে সেবক হিসেবে কর্মরত ছিলেন	নিহত ১
১৫ জুন ২০১৬	কলেজশিক্ষক রিপন চক্রবর্তীকে তার বাসায় চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা	আহত ১
৩০ জুন ২০১৬	ঝিনাইদহের উত্তর কাস্টসাগর গ্রামের ধামদন মঠের সেবায়েত শ্যামানন্দ দাসকে (৬২) কুপিয়ে হত্যা	নিহত ১
১ জুলাই ২০১৬	রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকা গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় হামলা করে দেশি-বিদেশি নাগরিক জিম্মি ও হত্যা	নিহত ২৪ জন (১৮ জন বিদেশি নাগরিক)
২ জুলাই ২০১৬	বান্দরবনে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী কৃষক মং সু লং মর্মাকে কুপিয়ে হত্যা	নিহত ১

৬ জুলাই ২০১৬	দেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত শোলাকিয়ায় ঈদের দিন হত্যাকাণ্ড	নিহত ১ জন, আহত ১২ জন

উৎস: বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত। উল্লেখ্য যে সারণিতে বর্ণিত সন্ত্রাসী হামলার অধিকাংশের দায় স্বীকার করেছে জেএমবি অথবা হুজি-বি অথবা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। অবশ্য কোনো কোনো ঘটনার দায় স্বীকার করেছে স্বল্পপরিচিত মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের অন্যান্যরা।

সারণি ৭: আনসারুল্লাহ বাংলা টিম/আনসার আল ইসলাম কর্তৃক ব্লগার ও প্রকাশক হত্যাকাণ্ড, ২০১৩-২০১৬

ক্রমিক	তারিখ	নাম	আহত/নিহত	স্থান
১	১৪ জানুয়ারি ২০১৩	আসিফ মহিউদ্দিন	আহত	ঢাকা
২	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	রাজীব হায়দার	নিহত	ঢাকা
৩	০২ মার্চ ২০১৩	জগৎ জ্যোতি তালুকদার	নিহত	সিলেট
৪	০২ জুলাই ২০১৩	আরিফ রায়হান দীপ	নিহত	ঢাকা
৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪	আশরাফুল ইসলাম	নিহত	সাভার
৬	১৫ নভেম্বর ২০১৪	সফিউল ইসলাম লিলন	নিহত	রাজশাহী
৭	২৬ জুন ২০১৪	রাকিব মামুন	আহত	ঢাকা
৮	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	অভিজিৎ রায়	নিহত	ঢাকা
৯	৩০ মার্চ ২০১৫	ওয়াসিকুর রহমান বাবু	নিহত	ঢাকা
১০	১২ মে ২০১৫	অনন্ত বিজয় দাস	নিহত	সিলেট
১১	০৭ আগস্ট ২০১৫	নীলয় নীল	নিহত	ঢাকা
১২	৩১ অক্টোবর ২০১৫	ফয়সল আরেফিন দীপন	নিহত	ঢাকা
১৩	৩১ অক্টোবর ২০১৫	আহমেদুর রহমান টুটুলসহ ৩ জন	আহত	ঢাকা
১৪	৬ এপ্রিল ২০১৬	নাজিমুদ্দিন সামাদ	নিহত	ঢাকা

উৎস: বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে লেখক কর্তৃক সংকলিত।

ধর্মীয় উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল এক চিত্র। পরিবর্তনশীল এ চিত্রে স্পষ্ট হয়: তুলনামূলক স্বল্পমাত্রার জঙ্গিত্ব থেকে অধিক মাত্রার জঙ্গিত্বে উত্তরণ। যার মধ্যে আছে 'লুক্কায়িত থেকে প্রকাশ্য পদ্ধতি'; 'একমুখী হাতিয়ারের পরিবর্তে বিধ্বংসী বোমা ব্যবহার'; চার স্তরবিশিষ্ট "জিহাদের" (উল্লেখ্য পবিত্র কোরআন শরিফে কোথাও "জিহাদের" কথা নেই; যা আছে তা হলো আত্মরক্ষামূলক "পবিত্র যুদ্ধ") প্রথম স্তরের 'জিহাদ' থেকে

চতুর্থ স্তরের জিহাদ অর্থাৎ "কিলাল"[৫৪]— বড় মাপের সম্মুখ যুদ্ধ; স্থানীয় পর্যায়ের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা; একক সাংগঠনিক প্রচেষ্টা থেকে সব জঙ্গি নিয়ে একক প্লাটফর্ম গঠনের প্রয়াস ইত্যাদি। এসবের বিশ্লেষণে ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিত্বের মূল লক্ষ্যের কৌশলিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপ-লক্ষ্য স্পষ্ট হয় যা নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখলের লক্ষ্যে সংস্কৃতি-ধারায় পরিবর্তন আনা, যা তাদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম-বর্ণ-পেশা-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তচিন্তার মানুষ, সরকারি প্রশাসন যন্ত্র, বিচার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমন: জেলা প্রশাসন ও আদালত); ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন সিনেমা হল, থিয়েটার, যাত্রামঞ্চ, বাজারঘাট-ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কমিউনিটি সেন্টার, জনসমাবেশ, শিক্ষালয়, লাইব্রেরি; ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু জামায়াতের রাজনীতিবিরোধী অথবা ওয়াহাবি মতবাদ[৫৫] বিরোধী প্রতিষ্ঠান, যেমন সুফি-সমাধিস্থল-মাজারকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

২. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আসীন থাকলে এ ধরনের সন্ত্রাসী প্রবণতা হয় হ্রাস পায় অথবা প্রবণতার রূপ পরিবর্তিত হয়।

৩. ডানপন্থী বা ধর্মনির্ভর দলের সরকার ক্ষমতাসীন হলে এদের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বহুমুখী সম্প্রসারণ ঘটে।

৪. মাদ্রাসা থেকে শুরু করে সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মূলধারার বাংলা এবং এলিট 'ইংরেজি-মাধ্যম') এবং

---

[৫৪] জিহাদের চার স্তরের নাম যথাক্রমে 'দাওয়া', 'ইদাদ', 'রিবাত', ও 'কিলাল'। জিহাদের এ চার স্তরের বৈশিষ্ট্য দশম অধ্যয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[৫৫] 'ওয়াহাবি মতবাদ'-এর মূল কথা হলো মানুষ সৃষ্ট কোনো বিধান-আইনকানুন (অর্থাৎ 'তাগুতি' আইন) দিয়ে রাষ্ট্র-সরকার-সমাজ পরিচালন করা যাবে না, রাষ্ট্র-সরকার-সমাজ পরিচালিত হতে হবে আল্লাহ-নির্দেশিত কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শরিয়াহ্ পদ্ধতিতে, যেখানে মূল নীতি হবে "এক শাসক, এক কর্তৃত্ব, এক মসজিদ" ("One ruler, one authority, one mosque")। ওয়াহাবি মতবাদসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য দেখুন, আলাস্টের ক্রুক, ২০০৯, Resistance: The Essence of the Islamist Revolution. New York, London: Pluto Press.

আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-প্রশাসনিক-বিচারিক— সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফলপ্রদ মডেল আছে। তারা প্রতিনিয়ত ওইসব মডেলের সময়োপযোগিতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে; প্রয়োজনানুসারে মূল লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সেসব পরিবর্তন করে।

৫. ওদের অপতৎপরতা বাধাগ্রস্ত না হলে ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর বাধাগ্রস্ত হলে জঙ্গিত্ব বৃদ্ধির রূপ পাল্টায়। ক্ষমতার ভাগাভাগিতে তাদের ভূমিকা না থাকলেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কোনো সরকার যদি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়, মৌলবাদ তখন এটাকে তাদের শক্তি সামর্থ্য শাণিত করার কৌশলিক সময় ও সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদী রাজনীতির উদ্ভব, বিস্তৃতি, যোগসূত্র ও সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আরও কিছু জরুরি প্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন প্রয়োজন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে স্বাধীনতার বিজয় নিয়ে আমরা যথেষ্ট মাত্রায় আত্মতুষ্ট ছিলাম। সঙ্গত কারণও ছিল। জাতি হিসেবে আমরা এইই প্রথম দেখলাম যে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা— এ চার মূল নীতির ভিত্তিতে দেশগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। মূল স্রোতের ধর্মীয় চেতনা যদি উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী হয়ে থাকে এবং তা বংশপরম্পরা মানসকাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র গঠনের ওই চার মূল নীতিও আমাদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। আমাদের আত্মতুষ্টির কারণ এও হতে পারে যে সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বে এবং বিশেষত মুসলিমপ্রধান দেশসমূহের মধ্যে আমরাই প্রথম, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে (secularism, ধর্মহীনতা নয়) ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।[৫৬] আমাদের সুপ্ত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কাগুজে প্রকাশে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি (যাদের ক্ষমা করে আমরা ইসলাম ধর্মের মূল স্রোতের বাহকে পরিগণিত হতে পারি) পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে রাষ্ট্র যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে মানুষের জীবনে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটবে না; তারা ভবিষ্যৎ

[৫৬] অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পরবর্তীকালে মুক্তিসংগ্রামের চেতনাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মোশতাক-সায়েম-জিয়া অসাংবিধানিক-অবৈধ সরকার সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল নীতি বাতিল করে, আর তারও পরে জেনারেল এরশাদ-এর স্বৈরাচারী সরকার সংবিধানে "ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম" সংযোজন করেছে।

প্রক্ষেপণ করতে পেরেছিল যে এই মানুষই কয়েক বছরের মধ্যে চলমান নেতৃত্বের প্রতি মোহহীন হবে, আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তাদের (মুক্তিসংগ্রামে পরাজিতদের) বিজয় নিশ্চিত হবে। সমসাময়িককালে প্রগতির গতি এগোলো ঢিমেতালে; আর মৌলবাদীরা তাদের লক্ষ্যার্জনে জোর কদমে অথচ বেশ গোপনে এগোবার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করল (যেমন গ্রাম থেকে শহর দখল; কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচিতি গোপন রাখা ইত্যাদি)। যে প্রস্তুতির ফলই হলো গ্রাম দখল (ডিপটিউবওয়েলকেন্দ্রিক সমিতি, কৃষক সমিতি, মসজিদ-মাদ্রাসা— মাধ্যম যাই হোক না কেন), ধর্ম প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র অবস্থান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান দখল, আর বেসরকারি সংস্থার নামে ব্যাপকভাবে গ্রাম ও শহরের স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র মানুষের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ ও তা সুদৃঢ়করণ। এ কৌশল কার্যকর করতে মৌলবাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানমূহ যেমন নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তেমনি এ কৌশল অবলম্বনের ফলে ওইসব প্রতিষ্ঠানও শক্তিশালী হয়েছে। এ নিরিখে ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতৃত্ব যত না ভাববাদী তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি বাস্তববাদী ও বস্তুবাদী।

গত অর্ধ শতাব্দীর এ প্রক্রিয়ায় এখন তাদের সংগঠিত অর্জনটা এমন যে একদিকে প্রতিটি জাতীয় সংসদ আসনে তারা গড়ে ১৫ হাজার ভোট সংগ্রহে সক্ষম আর অন্যদিকে নির্বাচনে কোটি কোটি কালো টাকা ও প্রয়োজনীয় পেশি শক্তি সরবরাহের ক্ষমতাও তাদের এখন আছে। গ্রামাঞ্চলে তাদের আছে অতি সুসংগঠিত নারী-সংগঠন (যা এখন পর্যন্ত তেমন দৃশ্যমান নয়; প্রয়োজনে দৃশ্যমান হবে তবে ২০১৬-১৭ সালে আমরা ইতিমধ্যে শহরাঞ্চলে আত্মঘাতী নারী জঙ্গি দেখেছি)। আবার এসবের পাশাপাশি তারা এখন মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই অতি উচ্চমাত্রার সেনা-সূক্ষ্মতাসহ সারা দেশে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনে এবং কল্পনাতীত হত্যাযজ্ঞ সাধনে সক্ষম (যা তারা ইতিমধ্যে ১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে প্রদর্শন করেছে এবং একই সাথে "জিহাদি ইশতেহার" বিলি করেছে)। জনগণ বাধা না দিলে তারা তা অবশ্যই করবে, তার পুনরাবৃত্তি হবে এবং এসবের তীব্রতা ও ক্ষতিমাত্রা বাড়তে থাকবে। এ কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়।

মৌলবাদী জঙ্গিত্বের এ প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে আন্তসম্পর্কিত ও কৌশলিক সুসংগঠিত এবং তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে। বৈশ্বিক বিচারে মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট; সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার অন্যতম বাহনমাত্র। আর দেশজ বিচারে এ প্রতিপক্ষ আসলে ত্রিভুজাকৃতির আন্তসম্পর্কিত তিন বাহুর সমাহারমাত্র: ওপরের বাহুতে আছে 'ইসলাম' নামাঙ্কিত মূল ধারার রাজনৈতিক দল— জামায়াতে ইসলামী (প্রকাশ্য সংগঠন যার বহু ধরনের আনুষ্ঠানিক-

অনানুষ্ঠানিক উপসংগঠন-অঙ্গসংগঠন আছে), আর নিচের এক বাহুতে আছে ১৩৩টি চিহ্নিত জঙ্গি সংগঠন আর অন্য বাহুতে আছে মৌলবাদের অর্থনীতিসহ ২৩১টি বেসরকারি সংস্থা, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট (ছক ৭ দেখুন)। শেষোক্ত এসব ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনসমূহ মৌলবাদের অর্থনীতি-উদ্ভূত মুনাফা স্থানান্তর ও পাচারের কৌশলিক সংস্থামাত্র, যেসব সংস্থার মাধ্যমে তাদের জঙ্গিবাদী কর্মযজ্ঞসহ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল-উদ্দিষ্ট বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

মৌলবাদী শক্তিসমূহের কৌশলিক আন্তসম্পর্কটি ছক ৭-এ যে ত্রিভুজে দেখানো হয়েছে তা নিয়ে কোনো রকমের দ্বিধা যেন না থাকে সে জন্য দু-একটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। যেমন ত্রিভুজের মাথা হিসেবে দেখানো হয়েছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীকে। আসলে ওই মাথার উপরেও আরো বড় মাথা আছে, যেটা এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আর ওই দুই মাথার মাঝখানে অথবা মধ্যস্থতাকারী শক্তি হিসেবে আছে আল-কায়েদা, আইএসসহ অনুরূপ বিভিন্ন সংস্থা। ত্রিভুজের মাথায় অবস্থিত জামায়াতে ইসলামী-এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব (যা ওয়াহাবী মতাদর্শপুষ্ট) আর তারই নেতৃত্বে হেফাজতে ইসলামসহ অনুরূপ অনেক সংস্থা কাজ করে মূল লক্ষ্যার্জনে (অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে) সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবক শক্তি হিসেবে; একই রাজনৈতিক নেতৃত্বে মূল লক্ষ্যার্জনে অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে মৌলবাদের অর্থনীতি, আর সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠনগুলোর দায়িত্ব হলো মূল লক্ষ্যার্জনে সশস্ত্র কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া। এখানে যে প্রশ্নটি এখনো কেউই তেমন করেনি তা হলো: দেশি-বিদেশি জঙ্গিরা যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে সেসব কোন দেশে প্রস্তুত এবং কীভাবে জঙ্গিদের হাতে এল। উল্লেখ্য যে সময় (time) ও পরিপ্রেক্ষিত (context; মূলত আন্তর্জাতিক) বিবেচনায় বিষয়টি এমনও হতে পারে যখন ত্রিভুজের মাথায় অবস্থানরত রাজনৈতিক শক্তিটিকে "গণতান্ত্রিক নামধারী" কোনো কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে। এ কোনো অমূলক বা অযৌক্তিক ধারণা নয়। কারণ মূল লক্ষ্য অর্জনে যদি সেটা প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আপাত দৃশ্যমান সবকিছু বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল লক্ষ্যকে নয়। কথাগুলো বললাম এ জন্য যে বিশ্বব্যাপী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রবণতার এটাই হলো মর্মবস্তু (ছক ২, ৩, ৪ দেখুন)।

ছক ৭: মৌলবাদী শক্তিসমূহের কৌশলিক আন্তসম্পর্ক

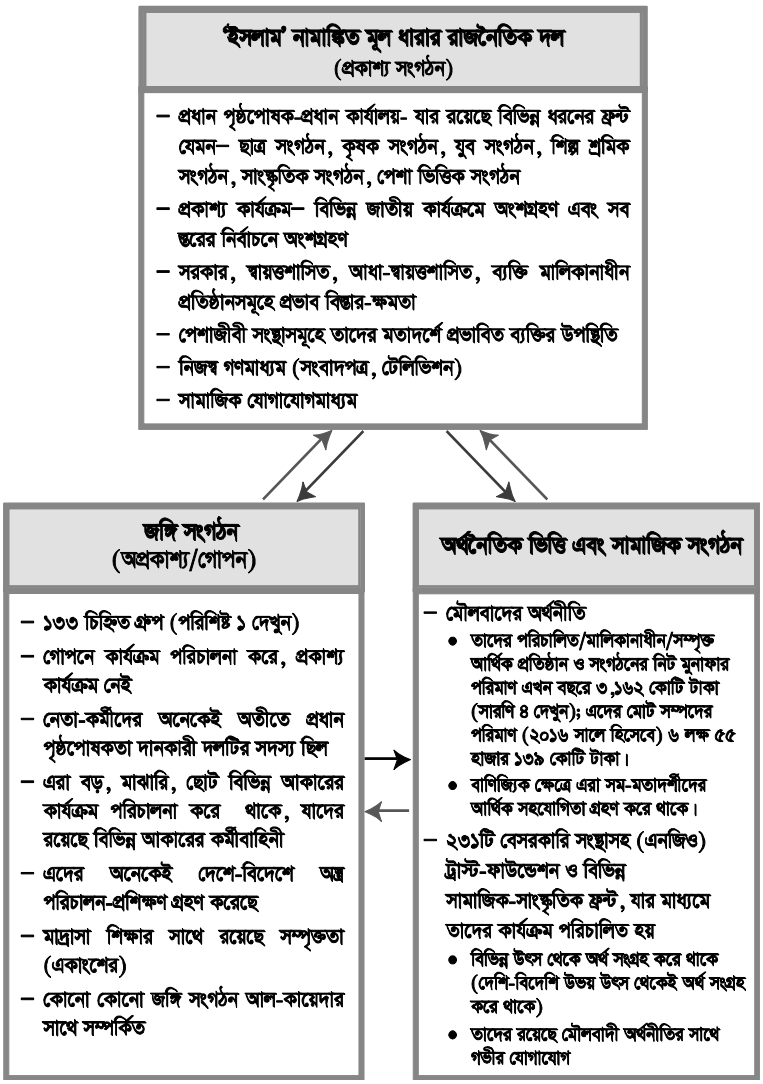

মৌলবাদী অর্থনীতির বিগত চার দশকে পুঞ্জীভূত নিট মুনাফার পরিমাণ হবে বর্তমান বাজারমূল্যে আনুমানিক ২ লক্ষ কোটি টাকা, যার ব্যাপকাংশ তারা এখন ব্যয় করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ প্রলম্বিত করতে, বিদেশি লবিস্টদের ভাড়া করার কাজে, জঙ্গিবাদসংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, নতুন ক্যাডার বাহিনী গঠনে, ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে তাদের ক্যাডারদের চাকরি দেওয়ার কাজে,

ক্ষমতাসীন সরকার ও রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে স্ব-স্বার্থীয় অবস্থান শক্তিশালী করার কাজে এবং সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে।

বাংলাদেশে মূলধারার অর্থনীতিতে রেন্ট-সিকারদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়নের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সশস্ত্র মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ। এ জঙ্গিবাদ অতীতে তাদের জঙ্গিত্ব প্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে। আর এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে তা অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং যথেষ্ট কৌশলিক; ইতিমধ্যে তারা তাদের সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন করে অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে (বিদেশিসহ) এবং তাদের বোমায় ইতিমধ্যে বহু নিরীহ মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছে (যা ইতিমধ্যে সারণি ৬ ও ৭-এ দেখানো হয়েছে)। শুধু তা-ই নয়, এ প্রক্রিয়ায় আত্মঘাতী বোমারু হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রায় সবাই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার-আধা বেকার মানুষ এবং প্রায় সবাই আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষালয় থেকে এসেছে এবং প্রায় সবাই একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অনুসারী। অবশ্য এ কথাও সত্য যে হিযবুত তাহ্‌রীর ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিম-এর সদস্যদের বড় অংশই "শহুরে শিক্ষিত সমাজ" থেকে আগত। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত শিক্ষার সব ধারা ও স্তরের সাথে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদের আন্তসম্পর্ক উত্তরোত্তর গভীরতর হচ্ছে। বিষয়টি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি।

ধর্মীয় মৌলবাদ ও তৎউদ্ভূত উগ্র জঙ্গিবাদ যে "আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতি" চালু করেছে তার ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধননির্বিশেষে দেশের সব মানুষের জীবন বিপন্নপ্রায়; সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তটস্থ। মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া যতই ত্বরান্বিত হচ্ছে এ বিপন্নতা ততই বাড়ছে। তবে বস্তুনিষ্ঠ সত্য ভাষ্যের স্বার্থে এখানে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ওই বিচারপ্রক্রিয়া বিচার-সম্ভাব্য মামলার তুলনায় এখনো যথেষ্ট মাত্রায় ধীর গতিসম্পন্ন[৫৭]। দেশে আর্থসামাজিক বৈষম্য যত বাড়ছে এবং মানুষের হতাশ-নিরাশ হওয়ার কারণ যত বাড়ছে এ বিপন্নতা ততই বাড়ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যায্য বিষয়াদি যতই বাড়ছে; বাড়ছে এসব বিপন্নতা।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌলবাদী জঙ্গিবাদ-উদ্ভূত পরিকল্পিত বিপন্নতার কিছু নতুন মাত্রা লক্ষণীয়। মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পরিকল্পিত এসব মাত্রা অস্বীকার করলে অথবা স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে আবারো ভুল হবে। কারণ সে ক্ষেত্রে বিষয়টি

[৫৭] আবুল বারকাত, ২০১৫, 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন', বিভাগীয় সেমিনার ২০১৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, রংপুর (২৪ অক্টোবর, ২০১৫)।

হবে রোগের কারণ উদ্‌ঘাটন না করে শুধু রোগ হলে তার চিকিৎসা করার মতো। বিপন্নতার নতুন এসব মাত্রার রূপ অনেক এবং বহুমুখী। এসব রূপের কয়েকটি এ রকম:

১. এ জঙ্গিত্ব দেশের উৎপাদনশীল খাতসমূহের "সরবরাহ চেইন" (supply chain) ভেঙ্গে ফেলে উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পরিভোগ-এর স্বাভাবিক সিস্টেমকেই ভেঙ্গে ফেলার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট। অর্থনীতির স্বাভাবিক এ সিস্টেম না ভাঙ্গতে পারলে অথবা অচল না করতে পারলে কীভাবে তারা ধর্মভিত্তিক-শরিয়াহ্‌ভিত্তিক সিস্টেম দিয়ে তা প্রতিস্থাপন করবে?

২. এ জঙ্গিত্ব অর্থনৈতিক কাঠামো বিকল করার লক্ষ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্যের এবং কাঁচামাল পরিবহনের অবাধ স্বাভাবিক সরবরাহ চেইন অচল করে দিতে চায়। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে দৃশ্যমান যেসব পদ্ধতি তারা ব্যবহার করেছে তার মধ্যে আছে হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, সড়কপথে চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি, ট্রাক-বাস-রেলে অগ্নিসংযোগ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভাংচুর, মিথ্যাচারে মসজিদের মাইক ব্যবহার ইত্যাদি।

৩. এ জঙ্গিত্ব অর্থনীতির প্রাণসংযোগ (life line)— 'অবকাঠামো' গুড়িয়ে দিতে চায়। এ লক্ষ্যে তারা ইতিমধ্যে গান পাউডার ব্যবহার করে দেশের কোনো কোনো এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের অবকাঠামো উড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিহত না করতে পারলে তারা আরও সম্ভাব্য যা করবে তা হলো— বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিড অচল করবে, বিদ্যুৎকেন্দ্র বিকল করবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে সঞ্চালনপ্রক্রিয়া বিনষ্ট করবে, (শহরে) পানি সরবরাহব্যবস্থা অচল করে দেবে (প্রয়োজনে পানি সরবরাহ লাইনে কলেরার জীবাণুসহ বিষ প্রয়োগ করবে); রাস্তাঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট চলাচল অনুপযোগী করার চেষ্টা করবে। এসব সক্ষমতা তাদের আছে। কারণ তারা ইতিমধ্যে "মূল অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি", "মূল রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলবাদের রাষ্ট্র" এবং "মূল সরকারের

মধ্যে মৌলবাদের সরকার" প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরিকল্পিতভাবে মূলধারার রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্র ও সরকারে নিজস্ব ক্যাডারদের অন্তর্ভুক্তি— এসব এখন তাদের রণকৌশলের অন্যতম রূপমাত্র।

৪. এ জঙ্গিত্ব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অকার্যকর করার সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সর্বশেষ দৃশ্যমান রূপ হলো স্কুলের পাঠ্যসূচিতে সাম্প্রদায়িক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা এবং অসাম্প্রদায়িক বিষয়াদি বর্জনে সরকারকে বাধ্য করা, আর একই সাথে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর 'দাওয়ায়ে হাদিস'কে স্নাতকোত্তর বা সমমানের স্বীকৃতি সরকার থেকে আদায় করা।

৫. এ জঙ্গিত্ব এখন দেশের গ্রামাঞ্চল, ক্ষুদ্র শহর ও শহরতলিতে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভয়-ভীতি সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। যার মূল উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ইঞ্জিন অনানুষ্ঠানিক খাতসহ (informal sector) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের কর্মকাণ্ড বিনষ্টের মাধ্যমে পুরো অর্থনীতিকে নিচে থেকে ভেঙ্গে ফেলা।

৬. এ জঙ্গিত্ব তাদের কর্মকাণ্ড দিয়ে এমন এক ভয়-ভীতি ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে, যখন গ্রামের হাটবাজার সন্ধ্যার পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে গ্রামের বাজারে সন্ধ্যার পরে কৃষিজ উৎপাদন উপকরণ যেমন সার, ডিজেল, বীজসহ অন্যান্য বাজারসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে আশঙ্কা করা যায় যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মজুদদারি বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হবে। এ আশঙ্কা অমূলক নয় যে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিতে কালোবাজারি-মজুদদারি বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ হবে, আর অন্যদিকে এ অবস্থাকেই আবার ধর্মের নামে জঙ্গিরা তাদের জঙ্গিত্ব আরও শাণিত করার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে।

৭. এ জঙ্গিত্ব ইতিমধ্যে হেফাজতে ইসলামের নামে আপাতত ঢাকার শাপলা চত্বরে (২০১৩ সালের ৫ মে) ইসলাম ধর্মের হেফাজতের অজুহাতে সংবিধানবিরোধী ও নারীবিদ্বেষী ১৩ দফা দাবিনামা পেশ করে নাস্তিক-আস্তিক বিভাজনের মাধ্যমে দেশে গৃহযুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছে। এসবে তাদের সাফল্য কম নয়। তাদের উদ্দেশ্য আপাতত অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা অবরুদ্ধ করা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করা অথবা প্রলম্বিত করা এবং ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অথবা জামায়াতে ইসলামীর নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা; আর আসল উদ্দেশ্য হলো– ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতাকেই দখল করা।

৮. এ জঙ্গিত্ব আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কের সৃষ্টি করে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চসহ দেশের দেশপ্রেমিক তরুণ প্রজন্মকে জোর করে অন্ধকার যুগে ঠেলে দিতে চায়। সংশ্লিষ্ট এসব ভীতি সৃষ্টিতে ইতিমধ্যে তারা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে; হয়েছে যথেষ্ট কামিয়াব। এ পারদর্শিতার সর্বশেষ লক্ষণ হলো শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামীকরণ ও কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রির মূলধারার মাস্টার্স-এর সমমান অর্জন করানো। এ কাজটি তারা করেছে 'জনমনে অসাম্প্রদায়িক' সরকারকে ব্যবহার করে। তাদের হিসাবে এসব হলো "জ্ঞানজগতের ইসলামীকরণ" (Islamization of Knowledge)-এর সূত্রপাতমাত্র।

৯. এ জঙ্গিত্ব ইতিমধ্যে নাস্তিকতার অজুহাতে মুক্তবুদ্ধির-মুক্তচিন্তার অনেক মানুষ হত্যা করেছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ভবিষ্যতে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড শুধু অব্যাহতই থাকবে না এসবের গতি বৃদ্ধি পাবে। এসব তারা প্রকাশ্য ও গোপন উভয় পথেই করবে। যখন-যেখানে-যে সময়ে তাদের প্রয়োজন তারা ঠিক সেভাবেই করবে। এ প্রক্রিয়ায় মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার মানুষদের অনেকেই ইতিমধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় ভীত-সন্ত্রস্ত। "মুক্তচিন্তার মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি" জঙ্গিদের অন্যতম অর্জন!

১০. এ জঙ্গিত্ব 'আস্তিক-নাস্তিক' বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়ে এখন 'মূর্তি-ভাস্কর্য' নামে নতুন এক বিতর্ক সৃষ্টি করে দেশজ-লোকজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্মূল করতে চায়। এ প্রক্রিয়ায় তারা ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রবেশমুখে নির্মিত ন্যায়বিচারের প্রতীক ভাস্কর্য অপসারণের দাবি তুলেছে; সরকারও এ বিষয়ে নমনীয়। শুধু তাই নয় হেফাজতে ইসলাম দেশের সব অসম্প্রদায়িক ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা ও মুক্তিসংগ্রামের সব স্মারক, সৌধ ও প্রতীককে মূর্তি আখ্যা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলার ঘোষণা দিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সামনে সম্ভবত তারা বলবে ভেঙ্গে ফেলতে হবে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, অপরাজেয় বাংলা, শিখা চিরন্তনসহ এ ধরনের সবকিছু। এসবই ইসলাম ধর্মের ওয়াহাবি মতবাদের সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ।

১১. এ জঙ্গিত্ব ভিন্ন ধর্মের মানুষের উপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন-নিবর্তন করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে চায়। আর তাদের এ প্রক্রিয়ায় যারা আনুষ্ঠানিক জঙ্গি নয় অথচ অন্যের সম্পদ জবরদখল করতে পারদর্শী তারাও যোগ দিয়েছে (অথবা তারা 'মৌনতার' নীতি অবলম্বনে বাধ্য হচ্ছে, যেখানে মৌনতা সম্মতির লক্ষণ)।

১২. এ জঙ্গিত্ব এ দেশে ভিনদেশের নাগরিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে আমাদের দেশকে অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এবং তা শুধু ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যেই নয় বিদেশের সাথে সব ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বন্ধ করে অর্থনীতি অচল করার লক্ষ্যেও।

১৩. এ জঙ্গিত্ব সমগ্র দেশে ভয়-ভীতি প্রদর্শন থেকে শুরু করে যে হারে আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার করেছে এবং করবে তাতে অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগহীন এক অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হবে, যখন ভেঙ্গে পড়বে সমগ্র অর্থনীতি-ব্যবস্থা। আর এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে একদিকে যেমন

> শরিয়াহ্ভিত্তিক অর্থনীতিকে জনসম্মুখে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করা যেতে পারে আর একই সাথে এসব করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল অসম্ভব নয়। সুতরাং, তারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার স্বার্থে অর্থনৈতিক-সামাজিক অবকাঠামো অচল ও ভেঙ্গে ফেলাসহ জনমনে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করবে— এটাই স্বাভাবিক। তাদের মতে, এ সবকিছুই হলো "ইসলামি জিহাদ"-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিরা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু। এ শত্রুদের প্রতিশোধস্পৃহা ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা ধর্মের নামে নির্বিচারে মানুষ খুন করেছে ও করবে। আমার এ উপসংহার ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্রান্ত হওয়ার নয়, যতক্ষণ একক পুঁজিবাদের হোতা সাম্রাজ্যবাদ (বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ) বিশ্বের মৌলকৌশলিক সম্পদে নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একক কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে; যতক্ষণ দেশে-দেশে সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রবাজার প্রসারিত হতে থাকবে; যতক্ষণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশে দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক অসমতা-বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে; যতক্ষণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে অথবা অন্যবিধ কারণে পরিচয়-সংকট (identity crisis) বাড়তে থাকবে; যতক্ষণ গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার মূল আচার হিসেবে চলতে থাকবে; এবং যতক্ষণ বিভিন্ন দেশে লোকজ সংস্কৃতির বিলুপ্তিপ্রবণতা বাড়তে থাকবে এবং একই সাথে পশ্চিমা অসার সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাড়তে থাকবে।

উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী জঙ্গিরা ধর্মের নামে জোরজবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতাটিকেই দখল করতে চায়— বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে চলেছে। ওদের জঙ্গিত্ব ক্রমান্বয়ে অতীতের সব সীমা অতিক্রম করছে— প্রথমে নিরীহ বেশে ধর্মের বাণী, তারপরে শরীরচর্চার নামে এক-আধটু প্রশিক্ষণ, তারপরে পটকার খেলা, তারপরে স্প্লিন্টার ছাড়া বোমা, তারপর পিস্তল-রিভলভারের খেলা প্রদর্শন, তারপর সভাস্থলসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে বাঙালির সংস্কৃতি হত্যার প্রয়াস, তারপর বাঙালি জাতিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনীতিবিদশূন্য করার প্রচেষ্টা, তারপর একসাথে একই সময়ে দেশের সব জেলাশহরের সরকারি অফিস ও বিচারালয়ে বোমা, তারপর বিচারক হত্যা, পেট্রোল বোমায় গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে-ঝলসিয়ে শিশু-নারী-বয়োবৃদ্ধ মানুষ-নির্বিশেষে হত্যাকাণ্ড নিয়মিতকরণ করা, তারপর আত্মঘাতী বোমা (নারী

আত্মঘাতী ও শিশু হত্যাসহ) এবং রিমোট কন্ট্রোল প্রযুক্তির সহায়তায় নীরিহ মানুষ খুন-হত্যাসহ কৌশলগত স্থাপনা ধ্বংস করা, আর তারপর আরো অনেক নবতর রূপ-পদ্ধতি, যা এ মুহূর্তে প্রক্ষেপণ সহজ নয়।

সুতরাং সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্বের ক্রমধারা যা তাতে স্পষ্ট যে ওরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং সুইসাইড বোমাই শেষ কথা নয়। যদি নিরস্ত্র করা না যায় তাহলে সামনে সম্ভবত আরও বড় মাপের নতুন ধরনের বিপর্যয় ঘটবে, যা হয়তো বা এই মুহূর্তে কল্পনাও করা যাচ্ছে না। আমাদের ইতিহাসে এ কোনো সাধারণ সংকট নয়— প্রকৃত অর্থেই মহাবিপর্যয়; গভীর সংকটের এ এক ক্রান্তিকাল।

মৌলবাদের অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদসংশ্লিষ্ট মহাসংকটটি এমনই যে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ধর্মান্ধ রাজনীতিকেরা অনেক গুরুতর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ কথাবার্তা প্রকাশ্যেই বলেছেন। এখনো বলছেন। যেমন তারা বলেন (নিম্নলিখিত বক্তব্যসহ সময়কাল অনুক্রমে ২০০৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত):

১. *"১৯৭১ আর ২০০৫ সাল এক কথা নয়"। (উল্লেখ্য যে মৌলবাদী জঙ্গিরা ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা করে যাতে ২৪ জন নিহত ও ৫০৩ জন আহত হন।)*

২. *"আমরা কচুপাতার ওপর বৃষ্টির পানি নই যে টোকা দিলেই পড়ে যাবো"।*

৩. *"কোথায় আজ ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, আর আমরা আজ কোথায়" (?)*

৪. *"সংসদের কয়েকটি আসন দিয়ে আমাদের শক্তির বিচার করলে ভুল করবেন"।*

৫. *"শীঘ্রই ইসলামি শাসন কায়েম হবে। দেখুন, অপেক্ষা করুন; পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকুন"।*

৬. *"ইসলামে আত্মহত্যা পাপ তবে ইসলামি শাসন/হুকুমত কায়েম হয়ে গেলে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"।*

৭. *"জ্ঞানপাপী মানুষ প্রণীত সংবিধানের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করতে সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে দেশে যত*

দিন ইসলামি আইন বাস্তবায়ন না হয় তত দিন তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন"।

৮. *"সশস্ত্র জেহাদ করা আমার অধিকার, আর ওই জেহাদে অংশগ্রহণ আমার দায়িত্ব। আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই"।*

৯. *"দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে, যাবে"।*

১০. *"আমাদের ১৩ দফা (অর্থাৎ হেফাজতে ইসলামের) দাবি না মানা পর্যন্ত তৌহিদি জনতার ঈমানি সংগ্রাম চলতে থাকবে" (এ ১৩ দফা মূলত নারীবিদ্বেষী এবং গভীর সাম্প্রদায়িক। এই ১৩ দফার পূর্ণ বিবরণ পরিশিষ্ট ৪-এ দেখুন)।*

১১. *(শাহবাগের) "গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের ফাঁসি চাই"। (গণজাগরণ মঞ্চের ৬ দফা পরিশিষ্ট ২-এ দেখুন)।*

১২. *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধীর দায়ে ফাঁসি হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলের দম্ভোক্তি — "এ অবিচারের আমরা বিচার করে ছাড়ব"।*

১৩. *পাঠ্যপুস্তকে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে) অমুসলিমদের কোনো লেখা পড়ানো যাবে না এবং শিক্ষার ইসলামীকরণ (Islamization of Education, সংক্ষেপে IOK নিয়ে ওরা বিশ্বব্যাপী অনেক লেখালেখি করছে) নিমিত্ত হেফাজত-এর ২১ দফা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।*

১৪. *দেশের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টের সামনে নির্মিত ন্যায়বিচারের প্রতীক সম্বলিত ভাস্কর্যটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে, কারণ ইসলাম এসব সমর্থন করে না। এ নিয়ে 'ইসলাম' নামকরণ সম্বলিত প্রতিটি দলই এখন একমত। অর্থাৎ এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম, মাঝারি, বেশি ইসলামি বলে কোনো কিছু কাজ করছে না। আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কের কয়েক বছর পরে এখন তারা মূর্তি-ভাস্কর্য বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। যুক্তিক্রম অনুসারে এসবের পরে সামনে তারা আনবে শিক্ষা-সংস্কৃতির ইসলামীকরণ এবং সমগ্র জ্ঞানজগতের ইসলামীকরণ প্রসঙ্গসমূহ। একটু একটু করে রাষ্ট্রক্ষমতা*

দখলের এ এক প্রাক্-লক্ষণ, বলা যেতে পারে বিবর্তনগত রণকৌশল।

১৫. "সংবিধানে ইসলাম নয়, ইসলামই হবে সংবিধান"।

ইসলামি জঙ্গিত্ব-উদ্ভূত মহাসংকটের গভীরতা এখানেও যে ইতিমধ্যে প্রথম ১০-১৫ বছরে ধৃত জঙ্গিদের প্রায় সবাই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান; এদের মধ্যে যারা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তাদের অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে এসেছে; আর বেশ কিছু এসেছে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে (বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে); এদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল অথবা আছে। আবার পাশাপাশি ইদানীং মারাত্মক প্রবণতা হলো এই যে ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলাশহরে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মভিত্তিক উগ্র জঙ্গিবাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত ধনী ঘরের সন্তান এবং ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (এসবের অন্যতম কারণ হিসেবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার অসারতার কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ-বিশ্লেষণ করেছি)। আরও দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে এখন পর্যন্ত ধৃত প্রায় ৩ হাজার জঙ্গির গড় বয়স মাত্র ২২ বছর (১৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে)। অথচ ১৫-২৫ বছর আগে গণমাধ্যমে জঙ্গি প্রশিক্ষণের যেসব সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছিল অথবা ১৫-২০ বছর আগে যারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মিয়ানমারের জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের বয়স তো এখন হবে ৫০-৭০ বছর— তারা কোথায়? আর যারা ১৯৭১-এ আলবদর-আলশামস-রাজাকার-শান্তি কমিটির নামে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল এবং/অথবা সরাসরি খুন-হত্যা-জখম-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগে জড়িত ছিল, এবং/অথবা এসবে মুখ্য পরামর্শদাতার কাজ করেছিল তাদের বয়স তো এখনো ৬৫-৯০ বছরের মধ্যে— তারা কোথায়? এসব গডফাদারের বড় অংশই ১৯৭১-এ মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছে। এসব গডফাদারের অনেকেই এখনো বহাল তবিয়তে দেশ-বিদেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অসাম্প্রদায়িকতাসহ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করারও এ এক নবতর কৌশল হতে পারে। মহা-বিপর্যয়টি এখানেও।

মৌলবাদী জঙ্গিত্ব শুধু যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে তা-ই নয়। ইসলাম ধর্মের নামে উগ্রবাদী মতাদর্শটি তার *'logos'* বা ইহলৌকিক যুক্তির দিক থেকে যথেষ্ট 'বাস্তববাদী' কৌশলিক অবস্থান গ্রহণ করেছে। ওদের মূলধারার রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ইসলামি জঙ্গিবাদের কর্পোরেট হেডকোর্য়াটার জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বিগত কয়েক বছর এসব নিয়ে "কূটনৈতিক দৃষ্টিতে

বাস্তবানুগ" এবং "মৌলবাদী জঙ্গিত্ব প্রকাশে যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ" রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করেছেন। যেমন অন্যান্য অনেক "নীতিগত" কৌশলিক বক্তব্যের মধ্যে তারা বলেছেন:

১. "ইসলাম ধর্মমতে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেশে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়, তবে নারী নেতৃত্ব জায়েজ যদি ওই নেতৃত্ব আমাদের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি করে"।

২. "সুদ খাওয়া ইসলামে হারাম। তবে আমাদের নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি ভিন্ন কোনো নামে সুদ-জাতীয় কোন কিছু খায় তাতে অসুবিধা নেই"।

৩. "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামের শত্রু। তবে ইরাকে মার্কিনি আগ্রাসনে কোনো সমস্যা নেই যদি আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকি"।

৪. "ভারত একটি শত্রু রাষ্ট্র। তবে ভারতের সাথে অন্যায়-অন্যায্য দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তি স্বাক্ষরে অসুবিধা নেই যদি এদেশে (বাংলাদেশে) আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকি"।

ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের আস্ফালন যে সব ধরনের সভ্যআচরণ মাত্রা অতিক্রম করেছে এবং তাতে আমাদের মুক্তি-স্বাধীনতাবিরোধী আন্তর্জাতিক চক্র মদদ দিয়ে চলেছে (যে বিষয়টি আমি ইতিমধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি)-এর সর্বশেষ প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ট্রাইবুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে মার্কিন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও ব্রিটেনের সংসদ সদস্য লর্ড কার্লাইল সাহেবের অবস্থান; অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে যখন যুদ্ধাপরাধী— এ দেশে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-সংশ্লিষ্ট সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ওরাসহ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর মতো সংস্থা রক্ষার চেষ্টা করে আমাদের ট্রাইবুনাল নিয়ে শুধু প্রশ্ন উত্থাপনই করেনি বিচারকাজ বেঠিক হয়েছে অথবা ঠিক হয়নি বলে তারা স্পষ্ট রায় দেওয়ার মতো ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করেছে। আর মৌলবাদী জঙ্গিদের অর্থায়নের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি—যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলী তো বাঁচবার জন্য ওয়াশিংটনভিত্তিক লবিস্ট ফার্ম ক্যাসিডি

ইন্টারন্যাশনালকে তিন দফায় ৫০০ কোটি টাকার ওপর প্রদান করেছে।[৫৮] বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একটু খোলাসা করা প্রয়োজন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন যেদিন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখল ঠিক একই দিনে (৬ এপ্রিল ২০১৫) কোনো কালক্ষেপণ না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক এনজিও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ[৫৯] এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড কার্লাইল[৬০]— উভয়েই চরমতম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যুদ্ধাপরাধী মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার জন্য সরকার বরাবর আহ্বান জানিয়েছিল। ব্যারিস্টার লর্ড কার্লাইল কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখায় অসন্তোষ প্রকাশ করে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার আহ্বান জানালেন। ব্যারিস্টার লর্ড কার্লাইল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এ আহ্বানও জানালেন যে "বাদীপক্ষের কৌসুলির আচরণ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত, এবং ওই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের সব বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত রাখা উচিত"। বিশ্বপ্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "মানবাধিকার সংস্থা"(!) আর ওই বিশ্বপ্রভুর উপ-প্রভু ব্রিটিশ লর্ড সাহেবদের একই সাথে একই সময়ে যুদ্ধাপরাধী বিচারপ্রক্রিয়ার রাশ টেনে ধরার উদ্দেশ্যটা কী?

যা বললাম এসবের নিহিতার্থ স্পষ্ট অনুধাবনে অন্তত দুটো বিষয় মনে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রথমত, নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামক আন্তর্জাতিক এনজিওটি তাদের কাগজে-কলমে বলে যে তারা আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে পৃথিবীর কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অ্যাডভোকেসি করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন আন্তর্জাতিক কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে (যে

[৫৮] এ বিষয়টি আমি প্রামাণিক দলিল-দস্তাবেজসহ ২৬ জুন ২০১২ তারিখে জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম।

[৫৯] যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৮ সাল, যার ঘোষিত মূল কাজ মানবাধিকার নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি এবং যার প্রতিপালনে অর্থের প্রধান উৎস জর্জ সোরোস ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন যারা প্রাক্তন কম্যুনিস্ট দেশগুলোতে অতিমাত্রায় সক্রিয়।

[৬০] যিনি ১৯৯৪ সালে ব্যারিস্টারি পাস করেন, ১৯৯৯ সালে লর্ড উপাধি পান, ২০০১-১১ পর্যন্ত সময়কালে সন্ত্রাসবাদবিষয়ক আইনি প্রক্রিয়ার সাথে এবং ২০০৮ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত, যিনি উইনস্টেই গ্রুপের একজন শেয়ারহোল্ডার এবং মধ্যপ্রাচ্যের কাতার ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি যার ক্লায়েন্ট।

লঙ্ঘনকে বলা হয়েছিল "মানবাধিকার লঙ্ঘন"; "যুদ্ধাপরাধতুল্য", "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদতুল্য") একক সিদ্ধান্তে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরাক দখল করল, বিনা বিচারে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করল, লিবিয়ায় বোমা মেরে দেশটিকে ছিন্নভিন্ন করে ছাড়ল এবং গাদ্দাফিকে বিনা বিচারে হত্যা করল তখন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আর লর্ড কার্লাইল সাহেবেরা কোথায় ছিলেন? কোনো টু শব্দটি তো করেননি, উল্টো এসবে সমর্থন দিয়েছিলেন। একাত্তরের খুনিদের বিচার নিয়ে আমাদের ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট যেসব রায় দিচ্ছেন, সেসব নিয়ে তাদের আসলে কোনো কিছু বলার কোনো ধরনের নৈতিক অধিকারই নেই। দ্বিতীয়ত, বহু বছর ধরে তথ্যপ্রমাণসহ আমি বলে আসছি যে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধী অপরাধীরা বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করতে ইতিমধ্যে বহু ধরনের চেষ্টা করেছে (স্মরণ করুন আওয়ামী লীগ যখন ২০০৮-এর জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সবেমাত্র ক্ষমতায় এল, তখন ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিডিআর-এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড) এবং একই সাথে তথ্যপ্রমাণ দিয়েছি যে যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে মার্কিন মুলুকে হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে লবিস্ট নিয়োগ করেছে এ কথা প্রমাণ করতে যে তাদের (যুদ্ধাপরাধীদের) যেন নিরাপরাধ প্রমাণে বিশ্বব্যাপী তদবির জোরদার করা হয় (ওয়াশিংটনভিত্তিক লবিস্ট ফার্ম ক্যাসিডি ইন্টারন্যাশনালের সাথে মীর কাশেম আলীর চুক্তি কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?)।

মার্কিন মুলুকের হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আর ব্রিটিশ লর্ডদের সাথে তর্কে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছাও নেই প্রয়োজনও নেই। তবে মানুষ হিসেবে ওদের প্রতি আমার একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে। অনুরোধটা হলো মাত্র দুই মিনিট সময় দিন, দয়া করে পড়ুন একাত্তরের খুনি মু. কামারুজ্জামান ১৯৭১-এ যা যা করেছিল তার মধ্যে মাত্র একটা নমুনা (আশা করি পড়বেন এবং তারপরে যা বলার বলবেন!)। দয়া করে পড়ুন তাহলে কামারুজ্জামানের ফাঁসির রায় বহাল রাখার পরে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ির সোহাগপুর গ্রামের বিধবাপল্লির বাসিন্দা জোবায়দা খাতুনের প্রতিক্রিয়া (পড়ুন, বারবার পড়ুন, যতক্ষণ না বুঝবেন ততক্ষণ পড়ুন):

> *"আমি তহন ছয় মাসের পোয়াতি (গর্ভবতী)। পাক সেনারা চোখের সামনে গুলি কইরা আমার স্বামীডারে মাইরা ফালায়। জানুয়ারগরের অত্যাচারে পেটের বাচ্চাডাও নষ্ট অইয়া যায়। এরা চইলা গেলে নিরুপায় অইয়া গোসুল ছাড়াই স্বামীরে উডানে (বাড়ির আঙ্গিনায়) কব্বর দিছি। পরে দুই পুলাপান লইয়া অসুস্থ*

সইলে গ্রাম ছাড়ি। কম বয়সে বিধবা অইছি, স্বামীর আদর কি জিনিস বুঝবার পাই নাই। তারাও বুঝব বিধবা অয়নের কি কষ্ট।... স্বামী মইরা যাওয়নের পর ২২ দিন জাউ খাইয়া থাকছি। ভাতের অভাবে মেয়েডা মইরা যায়। পরে অসুস্থ সইল লইয়া বাড়ি বাড়ি কাম করছি। শেষে ভিক্ষা কইরা চলছি। শুধু এই দিনডা দেহুনের লাইগা আল্লাহ আমগরে বাঁচাইয়া রাখছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইব এই খবরেই আমরা বিরাট খুশি অইছি। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমার স্বামী-সন্তানের আত্মা শান্তি পাইব।" একই গ্রামের আরেকজন স্বামীহারা করফুলি বেগম (৭০) বলেন, *"সাক্ষী দেওয়ার পর থাইকা রাতে ঘরের চালে কে বা কারা ডেল মারত। এলাকার লোকজন ডর (ভয়) দেহাইত। সরকার বইদলা (পরিবর্তন) গেলে নাহি, আমগর উল্ডা বিচার করব। এর লাইগা সবসুমু ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ফাঁসির রায় বহাল থাহায় আমগর মনে স্বস্তি ফিইরা আইছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমগর আত্মা শান্তি পাইব।"* এখানে উল্লেখ জরুরি যে একাত্তরের ২৫ জুলাই সোহাগপুর গ্রামে কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে আল-বদর, রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ করে। বেনুপাড়ার সব পুরুষকে (১৮৭ জন) হত্যা করে পাড়াটিকে পরিণত করা হয় বিধবাপল্লিতে। সেদিন যে ৫৭ জন বিধবা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জোবায়দাসহ ৩০ জন এখনো বেঁচে আছেন। (দৈনিক প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল, ২০১৫, পৃ. ২)।

অধ্যায় ১০

মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও জিহাদ: কালবিন্যাস। যাচ্ছিটা কোন দিকে?

"নির্বোধ ও গোঁড়া ব্যক্তিরা সর্বদাই তাদের মতাদর্শ
নিয়ে নিশ্চিত; আর জ্ঞানীরা এক্ষেত্রে সবসময়
দ্বিধাগ্রস্ত; এ নিয়েই পৃথিবীর যা কিছু সমস্যা।"
বার্ট্রান্ড রাসেল, ১৮৭২-১৯৭০

আমাদের দেশে ইসলামি জঙ্গিত্বের মহা-ভয়াবহ মহা-বিপযর্য়কর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন (বলা যেতে পারে প্রশ্নগুচ্ছ) নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা অথবা অনুসন্ধানধর্মী কাজ হয়নি। অগবেষিত অথবা স্বল্পগবেষিত এ প্রশ্ন বা প্রশ্নগুচ্ছ হলো:

১. ইসলামি জঙ্গিবাদ অথবা একই কথা ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসমুহের বিকাশের উত্তরণ পযার্য়সমূহ (transformative phases) কী কী এবং এর বৈশিষ্ট্যসূচক নিদের্শকসমূহ কী কী?

২. ইসলামি জঙ্গিবাদ অথবা ইসলামি জঙ্গিত্ব তার বিকাশে এখন "জিহাদের"[৬১] কোন স্তরে অবস্থান করছে এবং কেন?

৩. এ দেশের ইসলামি জঙ্গিদের সাথে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

এসব প্রশ্নগুচ্ছ নিয়ে প্রথমেই বলে রাখা উচিত যে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসমূহের অস্তিত্ব (বাংলাদেশে এ সংখ্যা ১৩৩টি; দেখুন পরিশিষ্ট ১) একদিকে যেমন নির্ভেজাল বাস্তবতা (যা সারণি ৬ ও ৭-এ দেখানো হয়েছে) অন্যদিকে তারা এমনই অতিগোপন সংগঠন যে গোপনীয়তা যথেষ্ট দুর্ভেদ্য। আন্তর্জাতিক ও

[৬১] ইসলামে "জিহাদ" বলে কিছু আছে কি না এ নিয়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক হয়। তবে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরিফে যা বলা আছে সেসব আমি পরে উল্লেখ করেছি।

দেশীয় বহু কারণেই এ গোপনীয়তার কারণ উদ্‌ঘাটনে আমাদের দেশের "সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ"-উদ্দিষ্ট সংস্থাসমূহ যথেষ্ট মাত্রায় অপারগ। তবে এসব প্রতিরোধে তাদের আত্মতুষ্টি (অন্তত গণমাধ্যমে) মাত্রা কম নয়!

ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসমুহের মিশন, ভিশন, গঠনপ্রক্রিয়া, কর্মপ্রণালি, সাংগঠনিক কাঠামো, অর্থ ও অস্ত্রের উৎস, অস্ত্র প্রশিক্ষণ, টার্গেট নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও তার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পদ্ধতি, জঙ্গিদের পারস্পরিক সম্পর্ক— এসব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট মাত্রায় সীমিত। এসব নিয়ে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান এমনই সীমিত যা দিয়ে ইসলামি উগ্রবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এসব নিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অনুমাননির্ভর (speculative) হওয়া ছাড়া পথ থাকে না। এসব নিয়ে আছে যথেষ্ট মাত্রায় বিভ্রান্তি (confusion অর্থে), আছে হয় অতিমূল্যায়ন নয় অবমূল্যায়ন, আছে অতিকথন অথবা স্বল্পকথন, আছে অনেক অনুদ্‌ঘাটিত বিষয়াদি (যা উদ্‌ঘাটন সহজসাধ্য নয়), আছে এমনসব বিষয় যা ঘটনা ঘটে যাওয়ার বহু পরে উদ্‌ঘাটিত হয় যখন উদ্‌ঘাটন করে তেমন কোনো লাভ হয় না। এসব নিয়ে আমরা 'কিছু জানি', 'অনেক কিছুই জানি না', 'কি জানি না তাও জানি না' আর সব শেষে আছে "অনেক অজানা— অজানা বিষয়াদি" (many unknown unknowns)। এসব কারণে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের যুক্তিসম্মত সদুত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। এ জন্যই সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছি; আর অন্যদিকে যুক্তিবিজ্ঞানভিত্তিক বিমূর্ততা (scientific abstraction)-এর আশ্রয় নিয়েছি। সামাজিক গবেষণার এসব পদ্ধতি অবলম্বনে উত্থাপিত প্রশ্নগুচ্ছের উত্তরে যা পেয়েছি তা নিম্নরূপ[৬২]:

> প্রথমত, শুরু করা যাক ইসলামি জঙ্গিত্বের আন্তর্জাতিক হেডকোয়ার্টার "আল-কায়েদা" দিয়ে। এই কয়েক বছর আগেও আল-কায়েদা নিয়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো খবর শুনলেও ইদানীং আমরা 'আল-কায়েদা' নামে কোনো কিছু শুনি না। এখন আমরা আল-কায়েদার বিপরীতে যে নামটি শুনি তা হলো 'ইসলামিক স্টেট' বা 'আইএস' (IS)। তাহলে আল-কায়েদা কি নির্মূল হয়ে গেছে নাকি নাম পরিবর্তন হয়েছে, নাকি অন্য কিছু।

[৬২] আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. Lead Speaker's Paper for the workshop *"Countering Religious Extremism in South Asia",* IISS, London, United Kingdom. 09 September, 2015.

আমার মতে, আল-কায়েদা, আইএসআইএস, আইএস— এসবের উদ্দেশ্য অভিন্ন ও শেকড়ও একই জায়গায়। আমার মতে, আল-কায়েদার সশস্ত্র ফ্রন্টের নামই "আইএস"।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপ্রবেশ মোকাবিলার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (তার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা) তালেবান সৃষ্টি করে, যাদের সাংগঠনিক নামই আল-কায়েদা। যার নেতৃত্বে ছিলেন ওসামা বিন লাদেন (যাকে একসময় ২৫ কোটি ডলার হস্তান্তরের কথা স্বীকার করেছেন সিআইএ-র ইকোনমিক হিটম্যান জন পার্কিন্স), মোল্লা ওমর প্রমুখ। যাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। এই জেনারেল মোশাররফই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পরবর্তীকালে এসব নিয়ে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, "মার্কিন সরকার আমাদের ব্যবহার করেছে; কিন্তু পরবর্তী সময়ে মূল্য পরিশোধ করেনি।"

তৃতীয়ত, তৎকালীন আল-কায়েদা এবং এখনকার ইসলামিক স্টেট মুভমেন্ট (সংক্ষেপে আইএস) আনুষ্ঠানিকভাবে যা বলে তা হলো– ইসলামি জিহাদের মাধ্যমে দেশে দেশে শরিয়াহ্ভিত্তিক ইসলামি রাজ কায়েম করতে হবে। এখানে 'জিহাদ' সম্পর্কে উল্লেখ জরুরি যে পবিত্র কোরআন শরিফের কোথাও জিহাদকে 'পবিত্র যুদ্ধ' বলা হয়নি। ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে মুসলিম শাসকেরা যুদ্ধের মাধ্যমে অন্য দেশ দখলকে জায়েজ করার ক্ষেত্রে ওই ধরনের যুদ্ধকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলামি চিন্তাবিদদের অনেকেই "বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে" জিহাদ নামে আখ্যায়িত করাকে পবিত্র কোরআন শরিফের ভুল ব্যাখ্যা বলে মনে করেন। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন শরিফের যেসব আয়াত উল্লেখ করা হয় তাতে বলা হয়েছে "যুদ্ধ নয়" সংঘাত-সংঘর্ষ নয়, "শান্তিই" হবে মূল নীতি (norm বা principle অর্থে)। পবিত্র কোরআন শরিফে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা বলা হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ: (১) "*...ওদের কোনো ক্ষতি করার অনুমতি আল্লাহ তোমাদের দেননি*" (সুরা আনআম,

আয়াত ৯০); (২) *"ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই"* (সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৬); (৩) *"... সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে একত্র করে হেদায়েত করতে পারতেন। অতএব তুমি (আল্লাহর নিয়মের ব্যাপারে) নিজেকে মূর্খ হওয়ার সুযোগ দিও না"* (সুরা আনআম, আয়াত ৩৫); (৪) *"আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তারা শিরক করত না। তা ছাড়া তোমাকে ওদের পাহারাদারও নিযুক্ত করা হয়নি। ওদের কোনো কাজের দায়দায়িত্বও তোমার উপর বর্তায় না" (সুরা আনআম, আয়াত ১০৭);* (৫) *"আর প্রতিপক্ষ যদি সন্ধি করতে চায়, তবে তুমিও সন্ধির ব্যাপারে মনোযোগী হবে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে।... হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট"* (সুরা আনফাল, আয়াত ৬১, ৬৪); (৬) *"...তাদের জোরপূর্বক বিশ্বাস করানো তোমার কাজ নয়"* (সুরা হুজুরাত, আয়াত ৪৫)।

চতুর্থত, ১৯৯৫-১৯৯৭ সালে আল-কায়েদা তাদের খসড়া মাস্টার প্ল্যান (মহাপরিকল্পনা) প্রণয়ন করে, যা পরবর্তী সময়ে (২০০২ সালের দিকে) চূড়ান্ত করে তারা বলে যে তাদের মূল লক্ষ্য: "পৃথিবীর অনেক দেশে ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে"। আল-কায়েদার চূড়ান্ত মাস্টার প্ল্যানে সময়-নির্দিষ্ট (time bound) করে সংশ্লিষ্ট যা যা বলা হয়েছে সেসবের মূল বিষয় এ রকম:

১. বিশ্বব্যাপী ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জিহাদি সংগ্রামে পাঁচটি কালপর্ব (phase) থাকবে: ২০০০-২০০৩ (প্রথম পর্ব), ২০০৩-২০০৬ (দ্বিতীয় পর্ব), ২০০৬-২০০৯ (তৃতীয় পর্ব), ২০০৯-২০১২ (চতুর্থ পর্ব), এবং ২০১৩-২০২৬ (পঞ্চম পর্ব)।

২. পঞ্চম পর্বের শেষে অর্থাৎ ২০২৫-২০২৬ সাল নাগাদ পৃথিবীর সব মুসলিম-অধ্যুষিত দেশে শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা— 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. পৃথিবীর কোনো দেশই ১০০ বছরের ঊর্ধ্বে ইসলামি খেলাফতবিহীন অবস্থায় থাকবে না (এ কথা বলার সময়

হাদিস শরিফের নির্দেশনা উল্লেখ করা হয়)। এ ক্ষেত্রে সময়-নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে তারা হাদিস শরিফের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে যা উল্লেখ করে তা হলো, "যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বশেষ ইসলামি খেলাফত ১৯২৪ সালে ওসমানের আমলে বিলুপ্ত ঘোষিত হয়, সেহেতু তার ১০০ বছর পরে অর্থাৎ ২০২৫-২০২৬ সাল নাগাদ অবশ্যই আবারো খেলাফত-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের সব কর্মকাণ্ড সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হতে হবে"।

৪. মাস্টার প্ল্যানের ৫ম কালপর্বের শুরুর দিকে অর্থাৎ ২০১৭ সালের দিকে তালেবানদের আবারো আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা দখল করতে হবে।

৫. আফগানিস্তান পুনর্দখল প্রক্রিয়ায় এক "ভীতি বলয়" (threat belt) সৃষ্টি করতে হবে। এই "ভীতি বলয়ে" যেসব দেশ ও অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার মধ্যে থাকবে ভারত (বিশেষত কাশ্মীর, আহমেদাবাদ, গুজরাট এবং 'সাত বোন'– আসাম, অরুণাচল, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা আর ২০১৮ সালের মধ্যেই ওই 'সাত বোন'কে যথেষ্ট মাত্রায় অস্থিতিশীল করতে হবে), মিয়ানমার (বিশেষত রোহিঙ্গাসহ আরাকান রাজ্য), এবং বাংলাদেশ (আল-কায়েদার পরিকল্পনামতে প্রধানত সমুদ্রসম্পদ ও ভৌগলিক-রাজনৈতিক বিবেচনায়)।

৬. দুটি 'মানামা' অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করতে হবে। প্রথম "মানামা" হবে "হিন্দ এলাকায়" যার মধ্যে থাকবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান। আর দ্বিতীয় "মানামা" হবে "শ্যাম এলাকায়" যার মধ্যে থাকবে সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেস্টাইন ও তৎসংশ্লিষ্ট ভৌগলিক এলাকাসমূহ।

৭. আল-কায়েদার মহাপরিকল্পনায় (Master Plan) উল্লেখ করা হয়েছে যে এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইসলামি

জিহাদিদের জিহাদের[৬৩] চারটি স্তর (4 stages of Jihad) পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে হবে। আল-কায়েদার মহাপরিকল্পনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এমনও হতে পারে যখন কোনো নির্দিষ্ট স্তর বাদ দিয়েই এক লাফে পরবর্তী স্তরে যাওয়া সম্ভব (যাকে বলে "by passing a stage")। জিহাদের ওই চারটি স্তর হলো যথাক্রমে **"দাওয়া"** অর্থাৎ সব পথ-পদ্ধতি অবলম্বনে মানুষদের দাওয়াত দিয়ে জিহাদের বাণী-বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া; **"ইদাদ"** অর্থাৎ সব ধরনের প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিপালন করা; **"রিবাত"** অর্থাৎ ছোট-ছোট এবং বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ-হামলা কার্যপরিচালন করা; এবং সর্বশেষ স্তর **"কিলাল"** অর্থাৎ ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে বড় মাপের সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধ।

পঞ্চমত, বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের বিকাশ স্তর এবং তাদের সাথে ইসলামি জঙ্গিবাদের আন্তর্জাতিক হেডকোয়ার্টার আল-কায়েদার যোগসূত্র–সংশ্লিষ্ট বিষয়। ইতিমধ্যে পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করেছি যে আমাদের দেশে জানামতে ১৩৩টি ইসলামি জঙ্গি সংগঠন আছে এবং সেই সাথে দেখিয়েছি (সারণি ৬ ও ৭) যে তারা জানামতে ইতিমধ্যে কত ধরনের জঙ্গিত্ব সংঘটিত করেছে। আমার মতে, সময়কালের নিরিখে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি-উগ্রবাদী সংগঠনসমূহের বিকাশকে চারটি স্তর বা পর্যায়ে (phases of transformation) ভাগ করা যায়। যে চারটি উত্তরণ-বিকাশ স্তর হলো এ রকম: ১৯৯২-১৯৯৬ (প্রথম স্তর বা প্রথম কালপর্ব), ১৯৯৭-২০০৬ (দ্বিতীয় স্তর বা দ্বিতীয় কালপর্ব), ২০০৭-২০১২ (তৃতীয় স্তর বা তৃতীয় কালপর্ব), ২০১৩-এবং সামনের দিক (চতুর্থ স্তর বা চতুর্থ কালপর্ব)। আমাদের দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ-এর ছোট থেকে বড় হওয়ার যে চারটি বিকাশকাল বা উত্তরণকাল তার মূল বৈশিষ্ট্যসহ কালসমূহ নিচের ছক ৮-এ দেখানো হয়েছে।

[৬৩] অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি পবিত্র কোরআন শরিফে 'জিহাদ' বলে কোনো কিছুর উল্লেখ নেই, যা আছে তা হলো আত্মরক্ষার স্বার্থে "পবিত্র যুদ্ধ"। মুসলিম শাসকেরা যখন সাম্রাজ্য বিস্তারে যুদ্ধ করেন, তখন "পবিত্র যুদ্ধ" শব্দটি পাল্টে তার পরিবর্তে 'জিহাদ' শব্দ ব্যবহার শুরু করেন।

ছক ৮: বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠনসমূহের বৈশিষ্ট্যসহ বিকাশকাল

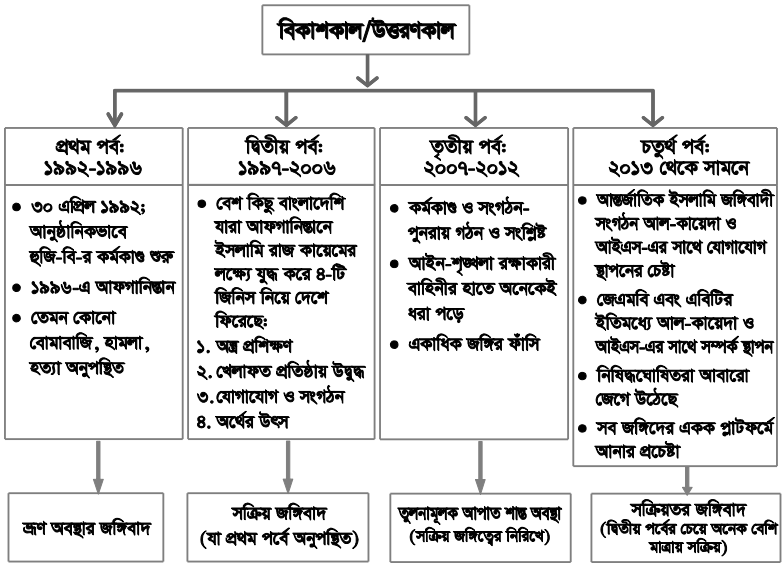

ষষ্ঠত, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ এখন জিহাদের কোন স্তর বা পর্যায়ে অবস্থান করছে? এ প্রশ্ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে খুব একটা ভাবনা-চিন্তা হয় কি-না সে বিষয়ে আমার সম্যক জানা নেই– যদিও জানতে চেষ্টা করেছি। এসব নিয়ে অনেকের মধ্যে বেশ আত্মতুষ্টিও লক্ষ করেছি; যারা বলেন "ওদের সাথে আইএস-এর কোনো সম্পর্ক নেই", "ওদের আস্তানা আমরা গুড়িয়ে ফেলেছি", "জেএমবি বলে কিছু নেই এখন আছে কিছু নব্য-জেএমবি", "ওরা বেশি দূরে এগুতে পারবে না"; আবার অবশ্য কেউ কেউ বেশ আত্মতুষ্টিসহ বলেন, ওরা ইসলামি জঙ্গিবাদ বিকাশের মোটামুটি প্রাথমিক স্তর বা প্রাথমিক পর্বের আশেপাশে অবস্থান করছে। আমি আত্মতুষ্টিকর, কৌশলিক পলায়নপর এবং সুবিধার রাজনীতি-উদ্ভূত (politics of convenience) এসবের সাথে একমত নই। এ দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ ও তাদের সশস্ত্র অবস্থা-অবস্থান আর পাশাপাশি ইসলামি জঙ্গিত্বের বৈশ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মহাপরিকল্পনা যা তা দিয়ে বিচার করলে আমি অবশ্যই যুক্তিগত কারণেই বলব ওরা বহু দূর এগিয়েছে, ওদের

বিকাশ-বিস্তৃতি-অবস্থান অনেকেরই ধারণার বাইরে হতে পারে। ছক ৮-এ দেখিয়েছি যে ২০১৩ সাল থেকে এ দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ এখন তাদের বিকাশের চতুর্থ স্তর বা চতুর্থ পর্বে অবস্থান করছে, যে পর্বটি যেকোনো মানদণ্ডেই মারাত্মক-মহাবিপর্যয়কর এক ভবিষ্যৎ অবস্থার লক্ষণমাত্র (কাউকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার লক্ষ্যে এসব বলছি না)। মারাত্মক ও মহাবিপর্যয়কর বলছি এ কারণে যে আমি নিশ্চিত;

১. সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত জামায়াতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহা-জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার এবং তাদের সামরিক ফ্রন্ট আইএস-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলেছে। এবং আল-কায়েদা থেকে তারা অস্ত্র সরবরাহ, বোমা প্রস্তুত পদ্ধতি, অস্ত্র প্রশিক্ষণ (ম্যানুয়ালসহ), টার্গেট নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে গেরিলা যুদ্ধের কায়দাকানুন, অর্থ সরবরাহ, অর্থের উৎস পাকাপোক্তকরণ, নিরীহ মুসলমানদের জিহাদের পক্ষে আনার 'বিজ্ঞানসম্মত' পথ-পদ্ধতি, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি পাচ্ছে;

২. তারা ইতিমধ্যে শুধু আল-কায়েদাই নয় অনুরূপ অন্যান্য বিদেশি জঙ্গি সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠান-ট্রাস্ট-ফাউন্ডেশন-বেসরকারি সংস্থা-মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং ওদের পরামর্শে সক্রিয়;

৩. হিজবুত তাহ্‌রিরসহ আরো কিছু নিষিদ্ধ অথবা এখনো নিষিদ্ধ হয়নি এমন সব জঙ্গি সংগঠনও অনুরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে;

৪. নিষিদ্ধঘোষিত জেএমবি এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিমসহ বেশ কিছু ইসলামি জঙ্গি সংগঠন দেশের সব ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসহ ইসলামি জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী সব সংগঠন-সংস্থা-প্রতিষ্ঠানকে (মৌলবাদের অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানসহ) একক একটি প্লাটফর্মে দাঁড় করানোর সক্রিয় চেষ্টা করছে;

৫. এ দেশের সব ইসলামি জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদার মাস্টার প্ল্যান বা মহাপরিকল্পনা ধারণ করে অর্থাৎ ওদের সবাই

বিশ্বাস করে যে ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই;

৬. ওরা যখন যেভাবে যেসব বর্বরতম নৃশংস পথ-পদ্ধতি অবলম্বনে মুক্তচিন্তার মানুষ খুন-হত্যা-জখম করছে, অর্থনীতির প্রাণসংযোগসমূহ বিনষ্ট করে অর্থনীতিকে বিকল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, প্রশাসন-আদালতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান— দেশজ/সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (প্রাতিষ্ঠানিক উৎসব) ও ব্যক্তি হত্যায় উদ্যত এবং একই সাথে মোটামুটি যথেষ্টসংখ্যক আত্মঘাতী জঙ্গিও সৃষ্টি হয়েছে— এসবই তো যথেষ্ট মাত্রায় প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিত্ব বিকাশ স্তরের মানদণ্ডে প্রাথমিক কোনো পর্যায়ে অবস্থান করছে না। আমার ধারণায় এ দেশে ইসলামি জঙ্গিবাদ 'দাওয়া' স্তর পার হয়েছে, অতিক্রম করেছে দ্বিতীয় স্তর 'ইদাদ', এখন তাদের অবস্থান জিহাদের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মধ্যবর্তী কোনো পর্যায়ে অর্থাৎ 'রিবাত' ও 'কিলাল'-এর মাঝে কোনো এক পর্যায়ে। সবকিছু বিচার বিশ্লেষণে আমি মনে করি, তাদের অবস্থান জিহাদি সর্বশেষ পর্যায় 'কিলাল'-এর কাছাকাছি অর্থাৎ তারা ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে সশস্ত্র সম্মুখ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তবে 'কিলাল'-এর এ যুদ্ধ তারা করবে কি না— বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ। এক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হলো বহিঃস্থ— সাম্রাজ্যবাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছানির্ভরতা।

সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়। এ কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় এ জন্যেও যে তারা "ইসলাম শান্তির ধর্ম" বলে যে 'মূল মন্ত্র' উল্লেখ করা হয় তা পরিত্যাগ করে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"-কে (economic power based political process) রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম বা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের *'mythos'*-এর সাথে বাস্তবের *'logos'*-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতিমাত্র। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে "রাজনৈতিক মতাদর্শে" রূপান্তর করা হচ্ছে। আসলে ধর্মনির্বিশেষে ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক জিহাদিরা যে জিহাদের সর্বশেষ স্তর/পর্যায় অর্থাৎ 'দাওয়া', 'ইদাদ' ও 'রিবাত' অতিক্রম করে 'কিলাল' (বা সর্বাত্মক সশস্ত্র সম্মুখ

যুদ্ধ)-এর স্তরে পৌঁছেছে এ উপসংহারে উপনীত হওয়ার পেছনে ইতিমধ্যে আমি অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছি। আমার যুক্তিক্রমের মধ্যে আছে: (১) বহিঃস্থ উপাদান অর্থাৎ এক মেরুর সাম্রাজ্যবাদ সিস্টেমের বিশ্বের চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদ (জমি, জলা, জ্বালানিশক্তি, খনিজসম্পদ, আকাশ-মহাকাশ) কব্জাকরণ, সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের হোতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ওই চার মৌলকৌশলিক সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা (অভিগম্যতা বা access নয়, ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রয়াস। এবং (২) অভ্যন্তরীণ উপাদান অর্থাৎ দেশে দেশে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অসমতা-বৈষম্য সৃষ্টিসহ আনুষঙ্গিক অনেক অনুকূল বিষয়াদি।

এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে আমি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি—কোন শক্তি এবং কেন ১৯৭০-এর দশকের শেষে ও ১৯৮০-র দশকের শুরুতে আল-কায়েদা প্রতিষ্ঠা করে (?); কারা আফগানিস্তানে তালেবানইজম সৃষ্টি করে (?); কারা আফগানিস্তানের চারপাশে সীমান্ত অঞ্চলে "মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠার নামে হাজার হাজার অস্ত্র প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে (?); কারা সৃষ্টি করে বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরকে (?); কারা আফগানিস্তানে প্রগতিকামী সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে ইসলাম ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব যেখানে নেতৃত্ব দেয় 'মাদক সম্রাট' (drug lords) এবং "যুদ্ধবাজ রাজ-রাজরারা" (war lords) (?), যারাই পরে "গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান-এ (!) তাদের 'সংসদ' অর্থাৎ 'জিরগা'র নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে; কারা এ প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানে সেনাসম্রাট পারভেজ মোশাররফকে সৃষ্টি করে (?) যে পারভেজ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে অভিযোগ করে যে, "ওরা আমাকে ব্যবহার করেছে কিন্তু কথা রাখেনি"; কোন শক্তি এবং কেন আইএস (অথবা আইএসআইএস) সৃষ্টি করেছে (?) কারা এবং কেন মুসলিম-অধ্যুষিত মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশ থেকে ৬-৭ লক্ষ মুসলমানকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়েছে (?) এসবের মূল উৎসকারণে (root cause) আছে "শোষণ-উদ্দিষ্ট পুঁজির ধর্ম"; আর ভৌগলিক উৎসকারণে আছে "একমেরুর সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেম এবং হোতা সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র" (এসবই এ গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

এসবের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ কারণসদৃশ বিষয়াদিকে আমি ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব উদ্ভব-বিকাশের 'মূল উৎস-কারণ' বলিনি, বলেছি "প্রভাবক" অথবা 'ত্বরান্বয়নকারী' উপাদান যেসবের মধ্যে আছে 'শোষণ-বৈষম্য-অসমতা'সহ রেন্ট-সিকারদের রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি নিয়ন্ত্রক-এর "স্বাভাবিক চরিত্র"। আর গভীর এসব উৎস কারণের

বাহ্যিক রূপ হিসেবেই উল্লেখ করেছি "ধর্মের ভূমিকা"। ধর্ম— এমন এক শক্তিশালী বাহ্যিকতা, যে শক্তির সমান্তরাল সমশক্তি ইতিহাসে বিরল।

জিহাদি স্তর হিসেবে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম যে 'কিলাল' স্তরে (অর্থাৎ জিহাদের চতুর্থ এবং সর্বশেষ স্তর যেখানে জিহাদিরা "সম্মুখ সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত" থাকে) পৌঁছেছে তার অন্যতম সহজ প্রমাণ হলো (অন্যান্য প্রমাণ ইতিমধ্যে এই অধ্যায়সহ অন্যান্য অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি) এখন থেকে ১২ বছর আগে ২০০৫ সালের ১৫ আগস্ট ইসলামি জঙ্গিরা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা হামলা করে এবং 'জামা'আতুল মুজাহিদীন' বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর নামে "বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আহ্বান" শিরোনামে "ইসলামী জিহাদের ইশতেহার" বিতরণ করে। ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক খিলাফত রাষ্ট্র গঠন-উদ্দিষ্ট ইশতেহারটির বিষয়বস্তু যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট; আহ্বান-উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে সরকার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের জন্য বক্তব্য সুস্পষ্ট, সুলিখিত, ধর্মভীরু মুসলমানের জন্য যথেষ্ট আকর্ষক এবং আবেদনময়। এ ইশতেহারে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়:

> *"(জনগণের প্রতি আহ্বান!) মানুষ সৃষ্ট আইন অর্থাৎ তাগুতি আইন চলবে না...। কোন মুসলিম ভুখণ্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান চলতে পারে না", ..."এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি", ... "যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে তা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করে আল্লাহর হুকুম ও রাসুলের তরীকায় দেশ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। ... আপনাদের যে কোনো বিচার ফয়সালার জন্য মসজিদের খতিব, মাদ্রাসার মুহাদ্দেস ও অভিজ্ঞ আলেমেদ্বীনের কাছে গিয়ে আল্লাহর আইনের ফয়সালা প্রার্থনা করুন। তাগুত সরকারের আইন উপেক্ষা করে আল্লাহর আইনের বিচার ফয়সালা নিন।"*
>
> *..."(বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান)। আপনারা এ দেশে আল্লাহর আইন চালু করুন। ... আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা দেশে তাগুতি শাসনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন চাই"।*
>
> *..."(জাতীয় সংসদের সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতি আহবান!)... এদেশে যারা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায়*

তারা ইসলামের শত্রু। অতএব, আল্লাহর হেদায়েত পেতে চাইলে দলাদলি বাদ দিয়ে সরকারী ও বিরোধীদল মিলে অবিলম্বে দেশে ইসলামী আইন চালু করুন।"

..."(সরকারি আমলা ও বিচারকগণের প্রতি আহ্বান!)... সরকার দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করলে আপনারা প্রশাসনিক কাজকর্ম ও তাগুতী আইনে বিচারকার্য পরিচালনা বন্ধ করুন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন ধন্য করুন।"

"আর্মি, বিডিআর, পুলিশ ও র‍্যাবসহ সকল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান!)...তাগুতের সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সৈনিক হয়ে যান।" (পূর্ণাঙ্গ "জিহাদি ইশতেহার" দেখুন পরিশিষ্ট ৩-এ)।

উল্লিখিত জিহাদি ইশতেহার থেকে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক নয় যে ক্রমবর্ধমান "শোষণ-বৈষম্য-অসমতা"-উদ্ভূত রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত ৯০ শতাংশ মুসলমান-অধ্যুষিত এবং ভৌগলিকভাবে ভারতবেষ্টিত (যেখানে এ দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যাপকাংশ বিভিন্ন কারণে ভারত সরকারবিরোধী কিন্তু কোনো অর্থেই ভারতের জনগণের প্রতি বিরূপ নয়) বাংলাদেশে জামা'আতুল মুজাহেদিন-এর উল্লিখিত জিহাদি ইশতেহার-এর "আবেদন" জনমনে কম নয়, এবং সে কারণে জিহাদের 'কিলাল' পর্ব সমাধা করা কঠিন কাজ নাও হতে পারে, আর অন্যদিকে বৈশ্বিক সমীকরণে বহিঃস্থ উপাদান— সাম্রাজ্যবাদ বিশেষত হোতা সাম্রাজ্যবাদ— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ— যখন চাইবে তখনই জিহাদি এ 'কিলালি' আবেদন বাস্তবে রূপ নিতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের প্রগতিচেতনা দুর্বলতর হতে থাকলে এ আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে এখন থেকে ১৩ বছর আগেই হুঁশিয়ারি প্রক্ষেপণ করে লিখেছিলাম, সমগ্র বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এ রকম:

"স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি জানে তারা কী চায়, বিপরীতে আমরা জানি না আমরা কী চাই; ওরা জানে কেমন করে তা অর্জন করবে, বিপরীতে আমরা জানি না; ওরা তাদের লক্ষ্যার্জনে সুসংগঠিত, আমরা অসংগঠিত; লক্ষ্যার্জনে ওদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই,

বিপরীতে আমাদের দ্বিধা আছে; ওরা যা করছে তা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, আর আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বলে মনে হয়; ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, যুবসমাজের বেকারত্ব হতাশাকে ওরা সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে সিদ্ধহস্ত, আর আমরা "দরিদ্র মানুষ-যুব বেকার-হতাশা"-র বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম এড়িয়ে চলেছি। আমাদের অস্বচ্ছতা ও অনৈক্য ওদের ভিত শক্তিতে সহায়ক হচ্ছে"।[৬৪]

[৬৪] বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, "গভীর ষড়যন্ত্রের পথ ধরে দেশ গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগুচ্ছে", দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ আগস্ট ২০০৪। এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের ঠিক আগের দিনে, যে দিন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার ঢাকার জনসভায় জঙ্গিরা গ্রেনেড হামলা হয়। যে হামলায় নিহত হন ২৪ জন; আর চিরপঙ্গুত্বসহ গুরুতর আহত হন ৫০৩ জন।

অধ্যায় ১১

"ধর্ম ও ব্রেইন": স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন-এর যে বিষয়টি বোঝা জরুরি

"একজন ব্যক্তির ধর্ম কী হবে বিষয়টি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার মতো; বিষয়টি তেমনই যে ওই ব্যক্তি কোন ভাষায় কথা বলবেন।"

জর্জ সান্তাইয়ানা, ১৮৬৩-১৯৫২

ধর্ম, ধর্মানুভূতি, ধর্মান্ধতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব— এসব নিয়ে বিগত প্রায় ২০ বছরের গবেষণায় আমি এ উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে এসবের পেছনের অর্থনীতি, রাজনীতি, রাজনৈতিক অর্থনীতির বিচার-বিশ্লেষণ— সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির "পূর্ণাঙ্গ মর্মার্থ" বুঝতে যথেষ্ট মাত্রায় সহায়ক নয়। এ বিষয়ে বিগত ২০ বছরের অনুসন্ধানকাজ ব্যর্থ হয়নি। তা বিষয়সমূহের কারণ-পরিণাম বুঝতে বেশ সহায়ক হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ৫০-৬০ শতাংশ সহায়ক হয়েছে। কারণ-পরিণামসংশ্লিষ্ট বাদবাকি ৪০-৫০ শতাংশ অনুধাবন সম্ভব হয়নি। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে এ বিষয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গবেষণা যে বিষয় বুঝতে যথার্থ মাত্রায় সহায়ক হয়নি বলে মনে হয় তা হলো—ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য করণীয়সমূহ কী হবে? কী এবং কেমন হতে পারে উত্তরণের পথনির্দেশ? আর এ জন্যই খুবই জরুরি অথচ তেমন গবেষিত নয় অথবা উপেক্ষিত অথবা কেউই তেমন আমল দেননি "Neurotheology" অর্থাৎ "ধর্মের সাথে মানুষের ব্রেইন"-এর সম্পর্ক (অর্থাৎ স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন) নিরূপণের প্রয়াস নিয়েছি। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক, তবে শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয় এ জন্য যে মানুষের ব্রেইন একদিকে যেমন জটিল এবং স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মতে এখন পর্যন্ত বহুলাংশে দুর্বোধ্য; আর অন্যদিকে মানুষ যে যুগে যে কালে যে অবস্থায় যা কিছু ভাবনা-চিন্তা করে তা তার জন্মসূত্রীয়

মস্তিষ্কের অবস্থা, তার পরিবেশ-প্রতিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাসহ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনেক উপাদান দিয়ে গঠিত। এ ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ (generalization) করলে তা হবে অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব, বাস্তবতাবিবর্জিত তত্ত্বাগীশতামাত্র।

প্রথমেই "ধর্ম আর ব্রেইন" বিষয়টির মূল প্রশ্নাদি উত্থাপন করা যাক। "স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্মদর্শন" বিজ্ঞানে যেসব প্রশ্নের অনুসন্ধান জরুরি তা হলো:

১. পৃথিবীতে এখন ১০ হাজারের বেশি ধর্ম আছে। কী সে কারণ, যা পৃথিবীতে এত মানুষকে ধর্ম পালনে উদ্বুদ্ধ করে?

২. ধর্মের বিবর্তনগত সুবিধাসমূহ কী কী?

৩. ধর্ম পালনকারী মানুষের মস্তিষ্ক কোষ (religious brain) কীভাবে কাজ করে? এখানে মনে রাখা জরুরি যে একজন মানুষ জন্মসূত্রেই যেমন কোনো না কোনো ধর্মাবলম্বী আবার মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুকালেই "মস্তিষ্কের ধর্মভিত্তিক প্রোগ্রামিং" এর কাজ শুরু হয়। সুতরাং মানুষের ব্রেইন নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের এসব অনুসন্ধানফল অগ্রাহ্য করলে আর যাই হোক একদিকে যেমন বোঝা সম্ভব হবে না যে মানুষ কেন ধর্মীয় জঙ্গিত্বের আশ্রয় নেয়; আর অন্যদিকে সমাজ-প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৬৫]

পৃথিবীতে এখন প্রায় ৭৫০[৬৬] কোটি মানুষের বাস। এই ৭৫০ কোটি মানুষের সম্ভবত প্রায় সবাই শান্তিতে বসবাস করতে চাই এবং চাই জীবন-সমৃদ্ধি— একক ব্যক্তিসত্তা হিসেবে এবং সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে; আর অন্যদিকে খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যারা এমন এক সমাজে বসবাস করতে চাইবে যে সমাজ পশ্চাৎপদ, যে সমাজে ধর্মভিত্তিক উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার এবং যে সমাজে জীবনের নিরাপত্তা সদা হুমকির মুখে। সম্ভবত এসব কারণেই

[৬৫] "Understanding Neurotheology Matters in Countering Religious Extremism: Religion and Brain" বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণায় এক নবতর সংযোজন। "ধর্মীয় ব্রেইন" বিষয়টি সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং বিগত ৫০০ বছরে "religious brain" কীভাবে কাজ করেছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh, পৃ. ৩৪-৩৭।

[৬৬] ২০১৭ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭৫১ কোটি ৫৩ লক্ষ। দেখুন, United Nations The World Pupulation Prospects: The 2015 Revision (Medium-fertility variant)।

ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ-জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) ছোট্ট করে বলেছিলেন, "মানুষের চরিত্র মূলত স্বার্থপর নয়।" আর ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণে ঊনবিংশ শতকের আরোএকজন ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) বলেছিলেন, "মানবজীবনের আলোকিত যুগ দিয়েই প্রতিস্থাপিত হবে কুসংস্কার আর স্বৈরাচারী ধর্মভিত্তিক শাসনের যুগ" (অবশ্য কবে তা হবে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি)।

বিশ্বব্যাপী এ মুহূর্তে মোট ধর্মের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। যেকোনো ধর্মই হোক না কেন প্রতিটি নির্দিষ্ট ধর্মই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে "সত্য" (Truth) একটিই এবং সেটা ওই ধর্মেই (অর্থাৎ তার ধর্মে) নিহিত। আর ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের ঘৃণা করা অথবা বিদ্বেষমূলক আচরণ ধর্ম বিশ্বাসেরই অংশ। ১৫০০ সালের দিকে চার্চ-সংস্কারক মার্টিন লুথার ইহুদিদের "জাত সাপের শাবকদল" হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কয়েক শত বছর ধরে ইহুদিদের উপর খ্রিস্টানদের সংঘবদ্ধ লুণ্ঠন-নির্যাতন-হত্যাকাণ্ড শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষ ভাগ করে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান আর মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল, তখন কয়েক লাখ মানুষ হত্যার শিকার হয়েছিল। ধর্মে-ধর্মে হানাহানি কখনো কমেনি। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যত গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার ৪৩ শতাংশের বাহ্যিক মূল কারণটি ধর্মসংশ্লিষ্ট (আসলে "মূল কারণ" তা নয়)।

'ধর্ম' নিজ থেকে অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) আপনা আপনি কোনো যুদ্ধবিগ্রহের কারণ নয়। "কারণ" হিসেবে সম্পদ সংগ্রহের (wealth accumulation) জন্য কামড়াকামড়ি, শোষণ-উদ্ভূত ব্যবস্থার লক্ষ্য ও প্রকৃতি, আঞ্চলিক অথবা বৈশ্বিক মৌলকৌশলিক সম্পদসমূহের ওপর একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং প্রাচীন দার্শনিক সিসেরোর (খ্রি. পূ. ১০৬-৪৩) প্রশ্ন (*Cui bono?*) লাভটা কার? এসব বিষয় গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিকট ইতিহাস থেকে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছি। আমার ধারণা দূর-ইতিহাস-এর আরো কিছু উদাহরণ দিলে যুক্তিটি আরো বেশি বস্তুনিষ্ঠ হবে। এ বিবেচনা থেকে দূর-ইতিহাসের কয়েকটি যুদ্ধ এবং সেসবের 'প্রকৃত কারণ' উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। উদাহরণসমূহ নিম্নরূপ:

১. *প্রাচীন যুগের যুদ্ধবিগ্রহ:* মিসর, ব্যাবিলন, পারস্য এলাকা, গ্রিক ও রোম সাম্রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ। 'ধর্ম' এসবের কোনোটিরই মূল কারণ ছিল না। এসব যুদ্ধের মূল কারণ ছিল বাণিজ্য পথ দখল, ভৌগলিক এলাকা

(দেশ) দখল, সীমান্ত এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য বিস্তার।

২. *মধ্যযুগের যুদ্ধবিগ্রহ:* মঙ্গোল, গোথ্, ভাইকিংস, হান এবং অন্যান্যদের যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ ছিল নগররাষ্ট্র কর্তৃক সামন্তপ্রভুদের মালিকানাধীন ভূমি দখল গো-সম্পদ দখল। এসব যুদ্ধের কোনোটিই সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্মের ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সংঘটিত হয়নি।

৩. *আধুনিককালের যুদ্ধবিগ্রহ:* ব্রিটেন, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও অন্যান্যেরা সপ্তদশ-ঊনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক হিসেবে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, সেসবের কারণ হিসেবে 'ধর্মের' তেমন কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এসব যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশ টিকিয়ে রাখা এবং তার বিস্তার-সম্প্রসারণ। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কম্বোডিয়ার পল পট্-এর গণনিধন— এসবের কোনোটিরই 'কারণ' হিসেবে 'ধর্ম'কে চিহ্নিত করা যায়নি। অর্থাৎ ছোট-বড় যুদ্ধ অথবা যুদ্ধাবস্থার সাথে 'কারণ' হিসেবে ধর্মের সংশ্লিষ্টতা নেই। "যুদ্ধবিষয়ক এনসাইক্লোপিডিয়া" বলছে, "বিগত সাড়ে ৫ হাজার বছরে ১ হাজার ৭৬৩টি যুদ্ধ হয়েছে, যার মাত্র ১২৩-টির সাথে (অর্থাৎ মোট যুদ্ধের ৭ শতাংশের কম) ধর্মের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়।" প্রায় একই ধরনের উপসংহার-এ পৌঁছেছে পাঁচ খণ্ডে "যুদ্ধবিষয়ক এনসাইক্লোপিডিয়া"। এ এনসাইক্লোপিডিয়া বলছে, "এই পর্যন্ত সংঘটিত ৬ শতাংশ যুদ্ধকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়"। যুদ্ধের কারণ নির্ণয়সংশ্লিষ্ট গবেষকদের অনেকেই মনে করেন, "ধর্ম কোনো কারণ নয়, ধর্ম— কারণসদৃশ", এবং মূল কারণ হলো, 'যুদ্ধ শুরু হয় তখন, যখন কোনো জাতি (রাষ্ট্র) মনে করে যে তার এমন কিছু একটা দরকার যা পেতে হলে যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই। কখনো দুই জাতি-দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে বিরোধ থেকে যুদ্ধ শুরু হয় এবং কখনো বা দেশ দখলের আকাঙ্ক্ষা থেকে। যুদ্ধের মৌলিক কারণ হলো আরো আরো বেশি জমি-সম্পত্তির মালিক হওয়ার বাসনা, আরো আরো বেশি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার বাসনা, আরো আরো বেশি সম্পদের মালিক হওয়ার বাসনা, আরো আরো বেশি

> ক্ষমতাধর হওয়ার বাসনা, আরো আরো বেশি নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আর অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার বাসনা।[৬৭]

পৃথিবীর ৭৫০ কোটি মানুষের মধ্যে ৬৪ শতাংশই ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। 'ধর্ম' প্রকৃতিগতভাবেই শক্ত করে আঁকড়ে থাকার মতো বিষয়। ২০০৭ সালে গণচীনের ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের এক-তৃতীয়াংশ বলেছে, তারা ধর্মে বিশ্বাস করেন (অবশ্য মাও সে তুং এর আমলে ধর্ম নিয়ে এমনটা বলা সম্ভব ছিল না)। মার্কিনদের ৯৫ শতাংশ বলেছেন, তারা সৃষ্টিকর্তা ('God' অর্থে) বিশ্বাস করেন; ৯০ শতাংশ বলেছেন, তারা উপাসনা করেন; ৮২ শতাংশ বলেছেন, সৃষ্টিকর্তা অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম এবং ৭০ শতাংশ মৃত্যু-পরবর্তীজীবনে (life after death) বিশ্বাস করেন। তবে মাত্র ৫০ শতাংশ মার্কিন বলেছেন যে তারা দোজখে বিশ্বাস করেন– ওপরের অন্যান্য তথ্যের সাথে মেলালে এ ক্ষেত্রে বেশ অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

১৯৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের ওপরে এক জরিপে দেখা যায় যে তাদের ৩৯ শতাংশ ধর্মে বিশ্বাস করেন (অথচ এ ক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৯০ শতাংশ)। আবার মার্কিন বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাদের অবস্থান উচ্চ স্থানে (অর্থাৎ জরিপের সংজ্ঞানুযায়ী যারা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সদস্য) তাদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ তাদের ৯৩ শতাংশ বিশ্বাস করেন না), আর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের প্রায় সবাই ধর্মে বিশ্বাসী নন। ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞানীদের মাত্র ৩ শতাংশ ধর্মে বিশ্বাসী। আবার ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার বিজ্ঞানীদের অবস্থা এক নয়: জীববিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানীদের তুলনায় ধর্ম বিশ্বাস ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে অনেক কম বিশ্বাসী; আর এ কারণেই প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের ৭৮ শতাংশ নিজেদের 'বস্তুবাদী' বলে আখ্যায়িত করেন (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস হলো 'বস্তু' অর্থাৎ Physical matter-ই একমাত্র বাস্তব সত্য অন্য কিছু নয়); এদের ৭২ শতাংশ মনে করেন, ধর্ম হলো এক সামাজিক বিষয় (Social phenomenon) যার আবির্ভাব ঘটেছিল তখন থেকে, যখন থেকে মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে (অর্থাৎ আজ থেকে ৫-১৫ লক্ষ বছর আগের কথা)। তারা ধর্ম নিয়ে কোনো সংঘর্ষে না গিয়ে বলতে চান ধর্ম হলো মানুষের বিবর্তনপ্রক্রিয়ার ফল।

---

[৬৭] দেখুন, Charles Phillips and Alan Axelrod, 2005, Encyclopedia of Wars (in 3 Volumes), NY: Facts on File, Inc.; Gordon Martel (ed), 2012, The Encyclopedia of Wars (in 5 Volumes), NY: Wiley-Blackwell; Jeremy Black, 1998, Why Wars Happen, London: Reaktion Book Ltd.

এ কথা যুক্তিসঙ্গত যে ধর্মের বিবর্তনমূলক সুবিধা আছে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অথবা ধর্ম বিশ্বাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখে অন্তর্জাগতিক বিষয়াদি, ঐশ্বরিক বিষয়াদি, অপার্থিব বিষয়াদি, অতিপ্রাকৃত বিষয়াদি, আধ্যাত্মিক বিষয়াদি (এক কথায় যাকে বলে spirituality)। এবং এসব বিষয়ের ৫০ শতাংশ নির্ধারিত হয় বংশানুগতিসূত্রে (অর্থাৎ genetically determined)। আবার "আধ্যাত্মিকতা" অথবা "অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস" বিষয়টি এমনই যে তা মানতে ধর্ম বিশ্বাস বাধ্যতামূলক নয়।

কোনো একজন ব্যক্তি ধর্ম বিশ্বাসী হবেন কি হবেন না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি 'মুক্ত' নন (not 'free')। যেকোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাস মূলত জন্মসূত্রীয় বিষয়; জন্মসূত্রেই মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে জন্মের কিছু কালের মধ্যেই তার ব্রেইন সার্কিটে ওই ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গেঁথে যায়। বিষয়টি অনেকটা মাতৃভাষার মতো, যেমন বাঙালি মায়ের গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে কথা বলা শুরু করলে বাংলা ভাষায় কথা বলে, অথবা ইংরেজ মায়ের সন্তান ইংরেজিতে কথা বলে বাংলায় নয়। এসব ক্ষেত্রে সেরোটোনিন নামে একধরনের 'রাসায়নিক বাহক' (chemical messenger) নির্ধারণ করে দেয় সেই মাত্রা যে মাত্রায় একজন আধ্যাত্মিক বিষয়ে অথবা অতিপ্রাকৃত বিষয়ে অথবা ঐশ্বরিক বিষয়ে বিশ্বাসী হবেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে একজন ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্কোর (বা মাত্রা) কত দূর হবে তা নির্ভর করে ওই ব্যক্তি মোট কতটি সেরোটোনিন (serotonin receptor) বহন করছেন তার ওপর।

একজন শিশুর জন্মের পরপরই তার ব্রেইনে "ধর্মের প্রোগামিং"-এর কাজ শুরু হয়। শিশুর "প্রোগামড্ বিশ্বাস" হলো বিবর্তনের উপজাত (by product of evolution)। একজন শিশু যেকোনো বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষার কারণেই তার মাতা-পিতা এবং/অথবা শিশুরক্ষা প্রতিষ্ঠানের (হতে পারে নার্সারি, প্লে গ্রুপ ইত্যাদি) আদেশ-নির্দেশ কোনো যুক্তি ছাড়াই মেনে চলে। যে কারণেই শিশুরা হয় সরল বিশ্বাসী।[৬৮] আর সে কারণেই সহজেই অনুশাসনযোগ্য (indoctrinate অর্থে)। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এ রকম: একজন শিশুর ধর্ম বিশ্বাস যে তার পিতা-মাতা থেকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত— বিষয়টি সার্বজনীন; শিশুরা অনুকরণ করে যে সামাজিক শিক্ষা

[৬৮] ধর্ম বিশ্বাসী পরিবারে আমরা আমাদের শিশুদের যে শিক্ষা দিই তার অন্যতম হলো 'কী ভাববে', 'কীভাবে ভাববে নয়' (what to think, not how to think)। শিশুরা অনেক প্রশ্ন করতে ভালোবাসে– কী, কীভাবে, কেন না ইত্যাদি– কিন্তু আমরা (অভিভাবকেরা) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় বলি "এত বেশি প্রশ্ন করতে হয় না", অথবা বলি "ও বেশি বেশি প্রশ্ন করে– কী যে হবে" ইত্যাদি।

পেয়ে থাকে তা যথেষ্ট মাত্রায় ফলপ্রদ মেকানিজম, আর এসবে আমাদের মস্তিষ্কে কাজ করে আয়না-নিউরন (mirror neuron); এসব বিশ্বাস যে মৃত্যুর পরে জীবন আছে এবং/অথবা ধর্মযুদ্ধে বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা নিয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলে শহিদ হয়ে বেহেশতবাসী হবে (এবং সেখানে কল্পনাতীত অনেক কিছুই পাবে) এবং/অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী হলে মহা শাস্তি হবে এবং/অথবা আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবানে বিশ্বাসের চেয়ে এ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু থাকতে পারে না— এসবই বংশপরম্পরা চলে আসছে এবং তা আমাদের ব্রেইন সার্কিটে প্রোথিত হয়ে আছে। আমরা সবাই একটা সত্য জানি ও মানি যে শৈশবকালীন বিকাশের ধারা থেকে বেরোনো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আধুনিক মানুষের বিবর্তন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে পাঁচটি আচরণগত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে:

১. ভাষা (language)

২. শ্রমের যন্ত্র (tool making)

৩. সংগীত (music)

৪. শিল্পকলা (art)

৫. ধর্ম (religion)।

উল্লেখ্য যে, ধর্ম ব্যতীত উপরোল্লিখিত সব বৈশিষ্ট্যের অগ্রসূচকের সবই প্রাণিজগতে পাওয়া যাবে। তবে মানবসভ্যতায় ধর্মের বেশ কিছু বিবর্তনমূলক সুবিধা স্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য। যেমন:

১. "ধর্ম" বিভিন্ন গ্রুপকে একত্রিত করে; বিভিন্ন গ্রুপের মানুষের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে;

২. ধর্মের বিভিন্ন বাণী, আদেশ, নিষেধাজ্ঞার বেশ কিছু সুবিধা আছে;

৩. ধর্মবিশ্বাস মানুষকে দুঃসময়ে সহায়তা করে এবং শান্তি দেয়— যেমন একজন চরম অসুস্থ মানুষকে "মানসিক শান্তি" দিতে পারে; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীন ও বিচারহীনতার পরিবেশে মেয়েশিশু ও নারীকে হেজাব-বোরখা পরিয়ে বাহ্যত সুরক্ষিত করে। কিন্তু ধর্মে অবিশ্বাসী যারা, দুঃসময়ে তাদের সমস্যার সমাধান

কোনো ঐশ্বরিক আস্থা-বিশ্বাস ছাড়াই নিজেকেই করতে হয়;

৪. আল্লাহ-ঈশ্বর যেহেতু সবকিছুই জানেন ও বোঝেন, সেহেতু তার কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে— এ বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসীদের আশাবাদী করে;

৫. ধর্ম বিশ্বাস মৃত্যু ভয় হ্রাস করে (কারণ সব ধর্মই মৃত্যুপরবর্তী জীবনের কথা বলে); এবং

৬. নিজ ধর্ম সমুন্নত রাখতে অন্য ধর্মের মানুষ হত্যা— প্রায় সব ধর্মেই স্বীকৃত। যে কারণে ধর্মভিত্তিক ঘৃণা-বিদ্বেষ (xenophobia), আন্ত-ধর্ম সংঘাত, অগ্নিসংযোগ আর তরবারি ব্যবহার করে "ঈশ্বরের শান্তি" ("Peace of God")— এসব সহজে বিলীন হওয়ার নয়।

এতক্ষণ স্নায়ুতান্ত্রিক বা মনোজাগতিক ধর্ম দর্শন নিয়ে যা বললাম তার ভিত্তিতে বলা সহজ যে মানুষের "ধর্মীয় ব্রেইন" বা religious brain কী কী কারণে বিকশিত হয় এবং কাজ করে (এসবই সহজভাবে ছক ৯-এ দেখানো হয়েছে)। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, মানুষের 'ধর্মীয় ব্রেইন' যেসব কারণে সৃষ্টি হয়, বিকশিত হয় এবং কাজ করে তার যেসব মৌল উপাদান নিম্নের ছক ৯-এ দেখানো হয়েছে সেগুলো আসলে ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে না; সম্ভবত একাধিক মৌল উপাদান একই সঙ্গে কাজ করে; ঐতিহাসিক বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এক বা একাধিক উপাদান অন্য উপাদানের তুলনায় দ্রুত অথবা ধীরে কাজ করে; কোনো কোনো উপাদান আপাতদৃষ্টিতে ধরা নাও পড়তে পারে (অর্থাৎ দৃশ্যমান নাও হতে পারে); এমনও হতে পারে যে কোনো কোনো মৌল উপাদান অন্য উপাদানের 'কারণ' হিসেবে কাজ করে (অর্থাৎ মৌল উপাদানসমূহের কারণ-পরিণাম স্তরবিন্যাস আছে)। সম্ভবত সবচেয়ে জটিল ও মারাত্মক অবস্থা ঘটে যখন বেশির ভাগ উপাদান (ছক ৯-এ উল্লিখিত) একই সাথে ক্রিয়া করে।

ছক ৯: মানুষের 'ধর্মীয় ব্রেইন' (religious brain) কী কী কারণে বিকাশ লাভ করে এবং কীভাবে কাজ করে: উপাদানসমূহ

অতি প্রসঙ্গিক বিধায় "ধর্মীয় ব্রেইন" কী কী কারণে বিকাশ লাভ করে এবং কীভাবে কাজ করে এসব নিয়ে ছক-৯-এ উল্লিখিত মৌল-উপাদান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার:

১. আমরা ধর্ম পরিচিতি লাভ করি জন্মসূত্রে। অর্থাৎ জন্মসূত্রে পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির পক্ষে "ধর্ম পরিচয়" নিয়ে নিজ-সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ আমরা জন্মগ্রহণ করি কোনো না কোনো ধর্ম পরিচয় নিয়ে। অর্থাৎ জন্ম পরিচয়সূত্রে নির্দিষ্ট ধর্ম গ্রহণ আমাদের নিজ সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। স্পেনের দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানার মতে বিষয়টি এ রকম— "একজন মানুষের ধর্ম পরিচিতি কী হবে— বিষয়টি ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার মতো, যেমন ওই ব্যক্তিটি কোন ভাষায় কথা বলবে"। আর গ্রিক দার্শনিক হোমার-এর মতে, "প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরকে প্রয়োজন।"

২. ধর্ম নিয়ে আমরা যা ভাবি অথবা ভাবতে বাধ্য হই তা 'পারিবারিক সংস্কৃতি'-উদ্ভূত। সম্ভবত এমন কোনো ধর্ম নেই যা আমাদের নিজ জন্ম-উদ্ভূত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মের প্রতি নির্মোহ হতে শেখায়। অন্যথায় "নিজ ধর্ম" অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল-সহানুভূতিশীল হতে শেখাত, অথবা "ধর্ম নিয়ে নির্মোহ বিচার-বিশ্লেষণ করতে" শেখাত।

৩. আমার নিজ ধর্ম আমার ভাবনাগত ও কর্মজগৎকে কোন ধারা দেবে অথবা আমাকে কোন পথে পরিচালিত করবে তার মধ্যস্থতাকারী উপাদান হিসেবে যেসব বিষয় বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করে (যা ছক-৯ এ দেখানো হয়েছে) সেসব হলো: পারিবারিক অবস্থা (অবস্থান, বৈশিষ্ট্য), ঐতিহাসিক সময়কালের বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক আর্থরাজনৈতিক-সামাজিক-সংস্কৃতির প্রভাব, শিক্ষা, বৈষম্যাবস্থা এবং পরিচয়-সংকট। যেমন, ১৯৪৭-এ যখন দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান- ভারত বিভক্তি বাধ্য করা হলো, তখন পাকিস্তানের হিন্দু ধর্মা বলম্বীরা নিজ জন্মভূমিসমূহ সম্পদ-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে হিন্দুস্তানে (ভারতে) যেতে বাধ্য হলো। আর একই কারণে ভারতের মুসলিমরা বাধ্য হলো পাকিস্তানে আসতে। এখানে হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে ধর্মগত সম্প্রীতির শত শত বছরের সংহতির একনিমেষেই পরিসমাপ্তি হলো — এসবই ধর্ম নিয়ে রাজনীতির নির্মম কুপ্রভাব; এসবই ঐতিহাসিক সত্য।

আবার মানুষে মানুষে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য— তা দেশজ হোক আর বৈশ্বিক হোক— মানুষকে হতাশ-নিরাশ করে, করে ভাগ্যনির্ভর। দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ে ইতিমধ্যে সপ্তম অধ্যায়ে বলেছি (দেখুন সারণি ৩)। আর বৈশ্বিক বৈষম্যাবস্থা ইতিমধ্যে গুরুতর রূপ ধারণ করেছে এবং তা ক্রমবর্ধমান। যেমন ২০১৭ সালে বিশ্বের মোট সম্পদের (পরিমাণ ছিল ২৮০ ট্রিলিয়ন ডলার) ৫০ শতাংশ এখন বিশ্বের ১ শতাংশ মানুষের হাতে; সম্পদের পুঞ্জীভবনও ক্রমবর্ধমান, কারণ ২০০৮ সালে বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার সময় শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর হাতে ছিল বিশ্বের মোট সম্পদের ৪২ শতাংশ। এর বিপরীতে বিশ্বের ৩৫০ কোটি মানুষের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার ডলার বা তার চেয়ে কম। অর্থাৎ বিশ্বের ৭০ শতাংশ

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হাতে যে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে তার চেয়ে ১৭ গুণ বেশি সম্পদ আছে মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে (দেখুন Global Wealth Report 2017)। ক্রমবর্ধমান এই সম্পদবৈষম্য একদিকে যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে সম্পদ মইয়ের নিচতলার মানুষকে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ করে, হতাশ-নিরাশ করে, নিয়তিনির্ভর করে অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বাস শক্তিশালী করে, তেমনি সম্পদ মইয়ের উপরতলার মানুষদের তাদের সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ধর্মসহ বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করে। অর্থাৎ সম্পদবৈষম্য সৃষ্টিকারী মই-এর উপরতলা আর নিচতলা— উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্টদের "ধর্ম" প্রয়োজন।

৪. পশ্চিমা দেশে (ইতিহাস-পরিপ্রেক্ষিতে অন্যত্রও হতে পারে) জন্ম এবং বেড়ে ওঠার পরেও ইদানীং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সন্তানদের অনেকেই উগ্র মৌলবাদী জঙ্গিত্বকে 'মুক্তির পথ' হিসেবে গণ্য করছে। এসবের কারণ কী? আমার ধারণা এসবে মধ্যস্থতাকারী সক্রিয় (অতিসক্রিয়) উপাদান হিসেবে একদিকে কাজ করছে "পরিচয়-সংকট" (identity crisis) আর অন্যদিকে "অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিবেশ" (ঐতিহাসিক সময়কাল বিবেচনায় এসবের পেছনেও আছে অজস্র কারণ)। এ ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদসংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারী উপাদানের মাধ্যমে কী ভাব কাজ করে তার সহজ-সরল সমীকরণটি হতে পারে এ রকম:

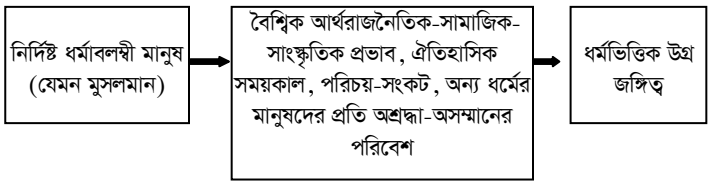

ইতিমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছি যে ধর্মভিত্তিক (অথবা অন্য যেকোনো কারণভিত্তিক) উগ্র জঙ্গিত্বের মূল বা শেকড়ের কারণ হলো মানুষে-মানুষে শোষণ এবং ওই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। উপরের সমীকরণে সেটা খুব স্পষ্ট নয়। উপরের সমীকরণে যা বোঝানের চেষ্টা করেছি তা হলো ধর্মের সাথে ধর্মভিত্তিক উগ্র জঙ্গিত্বের উদ্ভব ও বিকাশের যোগসূত্র, যার মাধ্যমে হতে পারে (অথবা মধ্যস্থতাকারী মৌল-উপাদান) সেসবের বহু ধরন; বিভিন্ন

বৈশিষ্ট্যের যার সাথে যোগসূত্র, থাকবে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের (historical context), যেখানে সুনির্দিষ্ট রাজনীতি হবে বাহনমাত্র। আর সেখানে প্রায়ই রাজনীতিকে কারণ হিসেবে ভ্রম করা হয়। বাহ্যিকতার নিরিখে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বে "পরিচয়-সংকট" (identity crisis) 'কারণ' হিসেবে দৃশ্যমান হতে পারে। যেমন এখনকার পশ্চিমা সমাজ যেখানে 'মুসলমান' মাত্রেই মনে করা হয় 'জঙ্গি' এবং পশ্চিমাদের আচরণও (এয়ারপোর্ট থেকে রাস্তাঘাটসহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরে) হয় অনুরূপ। এ ক্ষেত্রে সহজ-সরল সমীকরণটির রূপ হলো নিম্নরূপ:

মুসলমান → পরিচয় সংকট → ইসলামভিত্তিক উগ্র জঙ্গিবাদ

মুসলমান → মানুষ হিসেবে অশ্রদ্ধা, অসম্মানের পরিবেশ→ ইসলামভিত্তিক উগ্র জঙ্গিবাদ

ওপরের সমীকরণ দুটিতে 'মুসলমান' হওয়াটা সমস্যা নাকি 'মুসলমান'-কে সচেতনভাবে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করাটা সমস্যা। এ সমস্যা নিয়ে ভাবনা জরুরি। আমার ধারণায় একমেরুর বৈশ্বিক পুঁজিবাদী বিশ্বে পৃথিবীর চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদের (জমি, জলা, জ্বালানিশক্তি-খনিজসম্পদ, আকাশ-মহাকাশ) ওপর সাম্রাজ্যবাদের একক মালিকানা ও একচ্ছত্র আধিপত্য-কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় একবিংশ শতকের এ সময়ে 'মুসলমান'-রা হলো উপলক্ষমাত্র, কারণ নয়; কারণ হলো ওই একক মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য-উদ্দিষ্ট বিষয়াদি। আর "মুসলমান" অথবা "মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ" হলো উপলক্ষমাত্র, যা কারণ হিসেবে চালিয়ে দেওয়াটাই হলো রাজনীতি, মহারাজনীতি, দুর্বোধ্য রাজনীতি। আর এ রাজনীতিতে মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্ররা অংশগ্রহণে বাধ্য, যেমন রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে সৌদি আরব অথবা কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদি।

৫. শিক্ষাব্যবস্থার বৈকল্য অথবা সাম্প্রদায়িকীকরণ অথবা চরম বৈষম্য এবং সমাজে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য-অসমতা-উদ্ভূত হতাশা-নিরাশা— এসবই উগ্র জঙ্গিত্ব উদ্ভব ও বিকাশে

মধ্যস্থতাকারী মৌল-উপাদান হিসেবে ক্রিয়া করে। বিষয়টি নিচের সমীকরণে দেখানো হয়েছে:

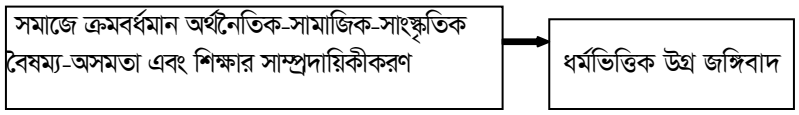

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য— তা শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেই হোক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই হোক— এ সবকিছুরই মূল উৎস মানুষে-মানুষে শোষণভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপস্থিতি। আর এসব কিছু প্রয়োগে প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট ধরনের-বৈশিষ্ট্যর রাজনীতি।

৬. নারীর প্রতি বৈষম্য (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মজুরি, চাকরি, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ইত্যাদি), সহিংসতা, নারীর নিরাপত্তাহীনতা—এ সবকিছুই নারীর মনোজগতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। এদিক থেকে মানুষ হিসেবে সুস্থ মস্তিষ্কের নারী যেমন সামন্তবাদ-পুঁজিবাদকে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি গ্রহণ করতে পারে না ধর্মের নামে "নারীর প্রতি অবিচার"। এ ক্ষেত্রে নারীসমাজ যদি দ্রোহ করে সে ক্ষেত্রে দোষ কোথায়? আর দ্রোহটাতো ধর্মের নামেও হতে পারে। অথবা মানুষ হিসেবে একজন নারী যদি মনে করেন যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই এসব বৈষম্য-অসমতা ঘটছে সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য "আত্মঘাতী বোমারু" হওয়া যুক্তিসঙ্গত — সে ক্ষেত্রে ওই নারীর দোষটা কোথায়?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—খ্রিষ্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের দোহাই দিয়ে অগণিত মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কারাগারে পাঠানো হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে অসংখ্য হত্যাকাহিনি এবং তার ধণাত্মক ফল বর্ণিত আছে। কিন্তু যিশুখ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার পরে খ্রিস্টানরা ইহুদি নিধনের ধর্মভিত্তিক যুক্তি খুঁজে বের করেছে। আবার শান্তির কথা বলতে গিয়ে এমনও বলা হয়েছে: "আমি এখন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসিনি, আমি তরবারি নিয়ে এসেছি" (দেখুন, Mathew 10:34)। এসব কথা থেকে মনে হতে পারে আমি কোনো এক বিশেষ ধর্মকে দোষ দেওয়ার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। প্রায় সব ধর্মেই আছে মৌলবাদ (absolute truth lies with me/my religion, and me only), পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা যাকে যেকোনো মূল্যে 'সত্য' (Truth) বলে গ্রহণ

করতে বাধ্য করা হয়। আবার ধর্মীয় জঙ্গিত্ব-উগ্রবাদ-আগ্রাসন আদৌ কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাসের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। খ্রিস্টান চরমপন্থী-উগ্রবাদী জঙ্গি টিমোথি ম্যাকভেইগ (যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় "Oklahoma City Bomber") ১৬৯ জনকে হত্যা করে; ইসলাম ধর্মের বিন-লাদেন এবং অন্যান্য অনেকে ২০১১ সালের ৯/১১-তে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে (এ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে)। ইসলাম ধর্মসহ অনেক ধর্মেই সুইসাইড বোমারুরা নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে ও করছে; ছোটখাটো অন্যায়ে হাতের কব্জি কেটে ফেলা, জনসম্মুখে পাথর নিক্ষেপ করা যেখানে প্রথম পাথরটা বিচারকই নিক্ষেপ করেন (ইরানে ২০০৭-এর জুলাই মাসে), ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হত্যা করা, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রদর্শন করা, মেয়েদের যৌনাঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা (যা পবিত্র কোরআন শরিফের কোথাও নেই) এবং তথাকথিত ইসলামি পণ্ডিতদের দিয়ে ফতোয়া দেওয়া (যেমনটি দিয়েছেন মিসরের পণ্ডিত ইউসুফ আল-বাদরি) যে এর ফলে "নারীরা আরো সংযমী হবেন", "পশ্চিমা দুনিয়ার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে", "এইচআইভি ও এইডস-জাতীয় রোগ-ব্যাধি নির্মূল হয়ে যাবে"।

এসবের পাশাপাশি আফগানিস্তানে তালেবান, প্যালেস্টাইনে হামাস, লেবাননে হিজবুল্লাহদের উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠনসমূহ বেশ দ্রুত হারে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব থেকে কোনোভাবেই এ উপসংহারে আসা যাবে না যে এসব এককভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে মুসলমানদের সমস্যা।[৬৯] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুশ প্রশাসনের আমলে খ্রিস্টান মৌলবাদীরা সরকারি সমর্থনেই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রো-লাইফ ক্যাম্পেইন করেছে, ডারউইনবিরোধী মতবাদ ব্যাপক প্রচার করেছে এবং একই সময়ে ইহুদি উগ্রপন্থী-মৌলবাদ-জঙ্গিগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবেই ইসরায়েলসহ বিশ্বের বহু দেশে (ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সহায়তায়) ঘৃণ্যতম-বর্বর ঘটনা ঘটিয়েছে। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব তো বেশ কিছু মুসলিম দেশের নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া-আসা বন্ধ করে ছেড়েছেন (!) অর্থাৎ আপাতত দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী ধর্মের নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরীহ মানুষের জীবননাশ হতেই

[৬৯] অবশ্য 'কৃত্রিম মুসলিম ভীতি' থেকে মুসলমানদের 'টার্গেট' করার বিষয়টি ইতিমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে চারটি অন্যতম উপাদান হলো: (১) (পশ্চিমা গবেষণা বলছে) পৃথিবীর ১৬০ কোটি মুসলমানের (২০১০ সালের হিসাবে) ৭ শতাংশ রাজনৈতিকভাবে উগ্রপন্থী; ওদের মন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়; (২) মুসলমানেরা সারা বিশ্বে ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর; (৩) মুসলিম দেশসমূহে আনুপাতিক হারে অনেক বেশি পরিমাণে প্রাকৃতিক জ্বালানি-শক্তি-খনিজসম্পদ আছে, (৪) ২০৫০ সাল নাগাদ মুসলমানেরাই হবে বৈশ্বিক জনসংখ্যায় প্রধান ধর্মভিত্তিক গ্রুপ– প্রায় ৩০ শতাংশ।

থাকবে। এটা অসভ্য ও অত্যন্ত লজ্জার এ জন্য যে এমনকি শিশুদেরও এসবে বাধ্যানুগত করা হচ্ছে। অথচ শিশুদের আধ্যাত্মিক মন-মননকে (spirituality অর্থে) জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির বহুমুখী শাখা-প্রশাখায় ব্যবহার-প্রয়োগের সুযোগ দিয়ে তাদের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ প্রগতিবাদী-আলোকিত মানুষ গড়ার পথ সুপ্রশস্ত করা প্রয়োজন এবং তা সম্ভব। এ কথা তো অনস্বীকার্য যে ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করার এটাও অন্যতম কার্যকর পথ।

অধ্যায় ১২

মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের সম্ভাব্য "সীমানা": তাহলে করণীয়?

"কুসংস্কার ও স্বৈরাচারী ধর্মভিত্তিক সময় শেষ পর্যন্ত
আলোকিত যুগ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে।"
ভলতেয়ার, ১৬৯৪-১৭৭৮

ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্ম প্রচারে ঐতিহাসিকভাবে কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ, কোথাও তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ পথ আবার কোথাও এ দুইয়ের মিশ্রিত পথের ভূমিকা জানা আছে। লক্ষণীয় যে যেখানেই যুদ্ধ-তরবারিকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেই হয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নয়তো বা যুদ্ধংদেহী রাষ্ট্রপরিচালন পদ্ধতি জেঁকে বসেছে। কিন্তু যেখানেই অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পথে দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচার এগিয়েছে— যেমন আমাদের দেশে ওলি-আওলিয়া-সুফি-সাধকেরা (sufism)— সেখানে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কখনো শক্ত ভিত পায়নি। উল্টো ধর্মগুরুরা যখনই ধর্মকে রাষ্ট্রপরিচালনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছে, তখনই বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ শান্তিপূর্ণ পথে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম পালনের ফলে মানুষ বংশপরম্পরা ধর্মভীরু হয়েছে, কিন্তু বকধার্মিক হয়নি। অর্থাৎ ধর্মের মূল ধারণাটি (perception of religion অর্থাৎ religiosity) এ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাহন হয়েছে। আর সে কারণেই মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ এ দেশে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শুধু ওই শক্তি ব্যবহার করে ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা বেশি নাও হতে পারে। তবে এ সম্ভাবনা আদৌ নেই এ কথা জোর দিয়ে বলা কঠিন। মতাদর্শ হিসেবে 'ধর্ম' ও ধর্মসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ বিকাশে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে (এ বিষয় আগেই বলেছি)। আবার ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ

যে ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য যথেষ্ট নয় তার কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ নিম্নরূপ:

১. এ দেশে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ৫০ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের যে ২৬ লক্ষ একর ভূ-সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পদ গ্রাস করা হয়েছে তা গ্রাস করেছে মাত্র ০.৪ শতাংশ মুসলমান (গ্রাসকারীরা সবাই যদি ইসলাম-ধর্মাবলম্বী হয়)— অর্থাৎ ৯৯.৬ শতাংশ মুসলমান ভিন্ন ধর্মের মানুষের সম্পদ জোরদখলের সাথে সম্পৃক্ত নন। অবশ্য অনেকেই এটা হিন্দু বনাম মুসলমান সমীকরণে রূপান্তরের অপপ্রয়াস চালান (এখানে পাঠককে চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত "শত্রু সম্পত্তি আইন" ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাঁচে হিন্দুধর্মালম্বী জনগোষ্ঠীর 'অ-জনগণ' হওয়ার প্রক্রিয়া স্মরণে রাখতে অনুরোধ করছি)।

২. বাগমারায় উগ্র-জঙ্গি মৌলবাদ— বাংলাভাইকে— রাষ্ট্রযন্ত্র যতই মদদ দিক না কেন— এলাকার মানুষই কিন্তু জোটবদ্ধভাবে তা মোকাবিলা করেছে— মূল ধর্ম-গোষ্ঠীর অসাম্প্রদায়িক সুপ্ত চেতনার এ-এক স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

৩. ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ভেঙ্গে পড়ার পরে ঢাকা মেডিকেলসহ অন্যান্য হাসপাতালে হিন্দু ধর্মাবলম্বী আহত ছাত্রদের জীবন বাঁচাতে রক্ত দানে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, তা নিশ্চয়ই অসাম্প্রদায়িক চেতনার অপার শক্তিকেই নির্দেশ করে।

৪. ২০১২ সালে (২৭-২৮ সেপ্টেম্বর) কক্সবাজারের রামুতে জামায়াত-জঙ্গিরা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর যে পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ করল সেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ যেভাবে এগিয়ে এল তা কি এ দেশের সাধারণ মানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ নয়?

৫. ২০১৩-র ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধননির্বিশেষে তরুণ প্রজন্ম ধর্মীয় মৌলবাদবিরোধী যে দৃঢ়চেতা অবস্থান নিল তা কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে এ দেশের তরুণসমাজ মুক্তি-স্বাধীনতার চেতনা যথেষ্ট মাত্রায় ধারণ করে?

৬. ইসলাম ধর্মের পজিটিভ ডিএনএর বাহক এ দেশের একজন সাধারণ মুসলমানও কি সুইসাইড বোমাবাজদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করে? না কি প্রায় সবাই মনে করে যে এসবই ধর্মের নামে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক অধর্মের কাজ?

এত কিছুর পরেও, "আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকলে বিপদ নেই"— এমনটি ভাববার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। কারণ বিষয়টি কারণগতভাবে রেন্ট-সিকিং সিস্টেমের আওতায় বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদসংশ্লিষ্ট কাঠামোগত বিষয়; বিষয়টি গভীরভাবে রাজনৈতিক— ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রাগ্রসর পরিবেশ সৃষ্টির। অতএব লড়াইটিও রাজনৈতিক। মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত এবং সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব যে পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে ও করছে, তাতে লড়াইটা হতে হবে সর্বব্যাপী, বহুমাত্রিক ও বহুকেন্দ্রিক। এ লড়াই অনগ্রসর মানসকাঠামোর বিরুদ্ধে প্রগতির লড়াই; আর সুফি-সাধক-ওলামাদের জন্য মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারা পুনঃস্থাপনের লড়াই। সুতরাং এ লড়াইয়ে একদিকে ইসলাম ধর্মের উগ্র সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধারার মোকাবিলায় মাবকল্যাণকামী সুফি-উলামা ধারার প্রবক্তাদের— যারা ঐতিহাসিকভাবেই মূল ধারার প্রবক্তা— মানবকল্যাণে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আর অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার লালন এবং মুক্তচিন্তা ও স্বাধীনতার ভিত্তি প্রসার নিমিত্ত জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই হতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত মৌলবাদী অর্থনীতির ভিত্তিমূল দুর্বল করার একমাত্র পথ।

ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বের 'সীমানা' (limit অর্থে) অর্থাৎ কত দূর যেতে পারে এ জঙ্গিত্ব (?) এবং সেই সাথে এ জঙ্গিত্ব রোধে কী করা যেতে পারে (অথবা কী করা সম্ভব?)। আমার দৃষ্টিতে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব যেহেতু বিভিন্ন ধরনের বহিঃস্থ (external) এবং অভ্যন্তরীণ (internal) উপাদানসমূহের কার্যকারণের মিথষ্ক্রিয়া (যা বিস্তারিতভাবে অধ্যায় ৩ ও ৪-এ বিশ্লেষিত হয়েছে), যেখানে অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ বহিঃস্থ-উপাদানসমূহের ওপর "নির্ভরশীল অধীন সত্তা", সেহেতু এ জঙ্গিত্ব রোধে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় উপাদানেই হাত দিতে হবে এবং একই সাথে এ কথাও যুক্তিগতভাবেই সঠিক যে শুধু অভ্যন্তরীণ উপাদানে হাত দিয়েই মৌলবাদী জঙ্গিত্ব রোধ হবে না। আবার এ কথাও যৌক্তিক যে অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহে হাত না দিয়ে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্ব রোধও করা যাবে না। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্ব রোধসংশ্লিষ্ট এই ডায়ালেক্টিকস্ অস্বীকার করা প্রায়োগিকতার নিরিখে হবে ভ্রান্ত এবং আত্মঘাতী।

ওপরে যা বললাম তার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো এই যে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব উচ্ছেদে দুই ধরনের (অথবা দুই বর্গের) সমাধানের কথা ভাবা যেতে পারে। সমাধান-উদ্দিষ্ট প্রথম বর্গ (first order) বা প্রথম ধরনকে বলা যেতে পারে প্রাথমিক সমাধান (primary solution) অথবা প্রয়োজনীয় সমাধান (necessary solution) অথবা আশু সমাধান (immediate solution)— এসব সমাধান স্থায়ী সমাধান নয়; এসব সমাধান বিশ্বব্যাপী ধর্মভিত্তিক (অথবা জাতপাতভিত্তিক অথবা নৃ-গোষ্ঠীভিত্তিক অথবা বর্ণভিত্তিক) মৌলবাদী জঙ্গিত্বের "জঙ্গিত্বমাত্রা" হ্রাস করতে সক্ষম, দূর করতে সক্ষম নয়। প্রথম বর্গের এ সমাধানকে বলা যেতে পারে "মধ্যপন্থীয় সমাধান" (Mediocristanic solution)। দর্শনগতভাবে "মধ্যপন্থীয় সমাধান" এর ধারণা-সূত্র হলো: "যখন আপনার নমুনাসংখ্যা (sample) অনেক বড় এবং কোনো একক উপাদান সমগ্র বিষয়কে (অর্থাৎ aggregate-কে) তেমন প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম নয় অথবা তেমন পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়।"[৭০] প্রথম বর্গীয় সমাধান হলো সেই সমাধান যা সমাজকাঠামোর কোনো পরিবর্তন-এর কথা বলে না অথবা বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামো জিইয়ে রেখেই সংস্কারমূলক সমাধানের কথা বলে। প্রথম বর্গীয় এ সমাধান স্থায়ী কোনো সমাধান নয়, অস্থায়ী সমাধান; এ সমাধান রোগীর সম্পূর্ণ রোগ মুক্তির কোনো গ্যারান্টি দেয় না, রোগ থেকে সাময়িক মুক্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য (relief) দেয়মাত্র। প্রথম বর্গের মধ্যপন্থীয় (mediocristanic) এই সমাধানের বিপরীতে চূড়ান্ত সমাধান (final solution) অথবা স্থায়ী সমাধান (permanent solution) অথবা অত্যবশ্যকীয় সমাধান (essential solution) হলো "চরমপন্থীয় সমাধান" (extremistanic solution)[৭১]। দর্শনগতভাবে "চরমপন্থীয় সমাধান"-এর ধারণা-সূত্র হলো: "প্রায় সব সামাজিক বিষয়ই নিউটনীয় একরৈখিক নয়; নয় তা গাউসিয়ান বেল কার্ভ— এসবের বিপরীতে সব সামাজিক বিষয়ই চরমপন্থীয় এবং কাঠামোগত; কোনো একটি একক বিষয় সমগ্র বিষয়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে না। অসমতা-বৈষম্য এমনই যে কোনো একটি পর্যবেক্ষণ (observation অর্থে) সমগ্রকের ওপর আনুপাতিক হিসাবে অনেক কম অথবা অনেক বেশি প্রভাব-অভিঘাত ফেলতে পারে।"

---

[৭০] **এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, নিকোলাস তালিব**, ২০১০, The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable. পৃ. ৩২-৩৫।

[৭১] "Extremistanic solution" **-এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে "চরমপন্থীয় সমাধান" খুব যুৎসই অথবা খুব গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। অনুবাদটা হতে পারে "আমূল সমাধান"** (radical solution) **অথবা "মৌলিক কাঠামোগত সমাধান"** (fundamental structural solution)।

"সমাধান" নিয়ে ওপরে যা বললাম সে আলোচনার নিরিখেই আমার মতে, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব নিরসনে (উচ্ছেদে) নিচে যেসব 'ক্ষতি হ্রাস' (damage minimization) ও 'ঝুঁকি হ্রাস' ("risk reduction) কৌশল উল্লেখ করছি সেসবই প্রাথমিক বর্গের (mediocristanic solution) সমাধানমাত্র। আর যখন আমি প্রাথমিক বর্গের ওইসব সমাধানের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক-সামাজিক বৈষম্য-অসমতা দূর করার প্রস্তাবসহ বৈশ্বিক রেন্ট সিকিং ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ-পদ্ধতির কথা বলছি সেসবই হলো চূড়ান্ত সমাধান বা চরমপন্থীয় সমাধান (অথবা দ্বিতীয় বর্গীয় সমাধান অর্থাৎ extremistanic solution)। বিদ্যমান-চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমার এ বিশ্লেষণ থেকে যে কেউই এ উপসংহারে উপনীত হতে পারেন যে তাহলে আপাতত আমাদের মধ্যপন্থীয় সমাধান-এর বাইরে ভাববার সুযোগ নেই। এ ধরনের ভাবনা আপাতত অমূলক হবে না। মধ্যপন্থীয় সমাধান-ভাবনা অমূলক নয় এ জন্যও যে চূড়ান্ত সমাধান-এর বিষয়টি কাঠামোগত (structural) এবং শুধু দেশজ নয় (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ নয়) বৈশ্বিক; আর একই সাথে মধ্যপন্থীয় সমাধান চূড়ান্ত সমাধানের পূর্বশর্ত হতে পারে। আমি এখন এ বিষয়েই আসব।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব-কব্জাকরণ প্রক্রিয়ায় ধর্মের ব্যবহার; আর অন্যদিকে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিকাশমান ভিত্তিতে আমাদের দেশে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে, তা থেকে আমি অন্তত নিশ্চিত যে "*এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে*"— এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে; এমনটি ভাবলে অস্বীকার করা হবে সংশ্লিষ্ট বিশয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অথচ এখন পর্যন্ত স্বল্পগবেষিত "ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রের" বিজ্ঞানকে (গুরুত্বের কারণে বিষয়টি একাদশ অধ্যায়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেছি)। আর এসব অগ্রাহ্য করলে তা হতে পারে উচ্ছ্বাস-উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহা বিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি[৭২]) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয়; কারণ যেসব জটিল ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা কয়েক দিনে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। আর ভিত্তিটি নিঃসন্দেহে দেশের ভেতরের (internal factors) দারিদ্র্য-দুর্দশা-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা ও ধর্মীয় মন-মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রসহ বহিঃস্থ উপাদান-(external factors) সংশ্লিষ্ট।

---

[৭২] 'স্বল্প মেয়াদ' ও 'মধ্য মেয়াদ' বলতে কত সময়কাল বুঝব — বিষয়টি পরিপ্রেক্ষিত-সংশ্লিষ্ট (contextual) এবং বিষয়বস্তুর মর্মবস্তুগত (content of the subject)। এ নিয়ে আপাতত বিতর্কের খুব প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ভবিষ্যতে গভীর গবেষণার দাবি রাখে।

উল্লিখিত এসব কিছু বিবেচনায় বাস্তবে যা সম্ভব তা হলো একই সাথে "*ক্ষতি হ্রাসের কৌশল*" (damage minimizing strategy) ও "ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল" (risk reduction strategy)[৭৩] দ্রুত বাস্তবায়ন করা। এখানে বলে রাখি যে আমার মতে, 'ক্ষতি' (damage) ও 'ঝুঁকি' (risk)— প্রত্যয় বা ধারণা দুটি আন্তসম্পর্কিত তবে সমার্থক নয়। এখানে 'ক্ষতি' বলতে বুঝিয়েছি অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে যে লোকসান ইতিমধ্যে হয়েছে এবং যেসব লোকসান হওয়ার আশঙ্কা আছে, যা স্বল্প মেয়াদে জীবনবিনাশী নাও হতে পারে। এ ধারণার বিপরীতে 'ঝুঁকি' বলতে আমি বুঝিয়েছি সেসব উপাদান ও মৌলসমূহ, যা অসাম্প্রদায়িক মন-মনন-মানসকাঠামোর জন্য জীবনবিনাশী হওয়ার শর্ত সৃষ্টি করে এবং যার ফলে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমাজদেহ বিনষ্ট হতে পারে। 'ক্ষতি' স্থায়ী অথবা অস্থায়ী উভয়ই হতে পারে কিন্তু 'ঝুঁকি' প্রকৃতিগতভাবেই মোটামুটি স্থায়ী রূপসম্পন্ন। কার্যকারণ সম্পর্কের সমীকরণে 'ক্ষতি'-কে 'ঝুঁকি'-র অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা যেতে পারে। সুতরাং একদিকে আমি "ঝুঁকি হ্রাস' কৌশলকে "ক্ষতি হ্রাস' কৌশলেরই আবশ্যিক শর্ত বলে মনে করি; আর অন্যদিকে 'ক্ষতি হ্রাস' হলো "ঝুঁকি হ্রাসের" প্রয়োজনীয় শর্ত।

আমার মতে, স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসেবে "ক্ষতি হ্রাস কৌশল" ও "ঝুঁকি হ্রাস কৌশল" (যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়) হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা:

১. ১৯৭১-এ যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছে— যারাই মৌলবাদী জঙ্গিদের গডফাদার— তাদের বিচারকাজ দ্রুত সম্পন্ন করে শাস্তি কার্যকর করা (সম্ভব হলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে)।

২. জঙ্গিদের অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা।

৩. জঙ্গি অর্থায়নের উৎসমুখ বন্ধ করা।

৪. মৌলবাদের অর্থনীতিসংশ্লিষ্ট (আর্থিক খাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনসহ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-পক্ষীয় অডিটের মাধ্যমে জামায়াত-জঙ্গিসংশ্লিষ্টতা উদ্‌ঘাটন

[৭৩] এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophy with reference to Bangladesh, পৃ. ২৭-৩৭।

করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে — 'ক্ষতি' ও 'ঝুঁকি' হ্রাসের লক্ষ্যে — (গুরুত্ব ক্রমানুসারে) জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তকরণ, আইনি হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন, পর্ষদ পরিবর্তন, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, একইভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায়-প্রমোশন ও পদায়ন বন্ধ করা ইত্যাদি।

৫. জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে, তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রচার করা। অবশ্য জঙ্গিদের ব্যবহৃত অস্ত্রসস্ত্র কোন দেশের তৈরি এবং কীভাবে এ দেশের জঙ্গিদের হাতে এল— এসব বিষয়ে সরকারের পক্ষে বলা অনেক কারণেই সহজসাধ্য নয়।

৬. জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। অবশ্য "একক জঙ্গি" অথবা 'জঙ্গিগোষ্ঠী'-র মালিকানাধীন সম্পদ নির্ধারণ সহজ কাজ নয়।

৭. বাজেয়াপ্তকৃত এ সম্পদ সরকারের তত্ত্বাবধানে এনে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, অসচ্ছল জীবন যাপন করছেন এবং পরবর্তীকালে যারা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পঙ্গুত্ব বরণসহ আহত হয়েছেন—ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের দেওয়া এবং সেইসাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তা ব্যয় করা।

৮. জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। অবশ্য 'প্রত্যক্ষ' জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা তুলনামূলক কঠিন না হলেও 'পরোক্ষ' জড়িত ব্যক্তিদের নির্ধারণ সহজ কাজ নয়।

৯. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী গোয়েন্দা নজরদারি সিস্টেম অনেক বেশি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুত ফলপ্রদ ও কার্যকর করার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করা।

১০. সরকারের জঙ্গিদমন ও ধৃত জঙ্গিদের মধ্যে জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতা-সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি (deradicalisation programme) ফলপ্রদতার সাথে পরিচালন করা।

১১. জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করা এবং একই সাথে অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জঙ্গিদের ব্যবহৃত আধুনিক অস্ত্রের উৎসসংশ্লিষ্ট বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা প্রয়োজন যে এসব আধুনিক অস্ত্র উন্নত বিশ্বে উৎপাদিত হয় (আমাদের মতো উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে নয়) এবং ব্যাপক হারে এসব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, পরিবহন, হস্তান্তর নিঃসন্দেহে পরিকল্পিতভাবে ছাড়া অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অর্থ থাকলে হয়তো বা দু-একটা অস্ত্র কেনা সম্ভব, কিন্তু রকেট লঞ্চার কেনা অথবা ব্যাপক পরিমাণে আধুনিক অস্ত্র "এবং অব্যাহতভাবে গোলাবারুদ" কেনা সম্ভব নয়। আর যদি তা সম্ভবও হয় সেক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব জানে যে কে, কোন গোষ্ঠী, কখন, কোন অস্ত্র, কী পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয়-হস্তান্তর করছে। এসবই ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উদ্ভবের বহিঃস্থ উপাদানসংশ্লিষ্ট বিষয়।

১২. রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটর, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে তাদের বহিষ্কার করা।

১৩. ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা।

১৪. ধর্মীয় জঙ্গিদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উন্মোচনে গণসচেতনতা বৃদ্ধি-সহায়ক সিরিয়াস প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড করা, যাতে জনগণই জঙ্গি নির্মূল প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণামূলক এই কর্মকাণ্ডে সব ধরনের পথ-পদ্ধতি-মাধ্যম ব্যবহার করা প্রয়োজন। তবে সঙ্গত কারণে জুম্মার নামাজ হয় এমন মসজিদে জুম্মার খুতবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে মোট ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৪০টি জুম্মা-মসজিদে গড়ে প্রতি সপ্তাহে জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ করেন ২ কোটি ৬৪ লক্ষ মুসল্লি, যারা আবার বাড়িতে ফিরে মোট ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা বলেন।[৭৪] এসবের একদিকে যেমন

[৭৪] যেহেতু সমগ্র দেশে মোট কয়টি মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ানো হয় এবং প্রতি জুম্মার নামাজে মোট কতজন অংশগ্রহণ করেন এসব নিয়ে সরকারি কোনো পরিসংখ্যান নেই (অথবা থাকলেও আমার জানা নেই), সেহেতু আমার হিসাবপত্তরের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে

গুণিতক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব আছে; আর অন্যদিকে কর্মকাণ্ডটি তেমন ব্যয়বহুলও নয়।

১৫. ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব রোধে "ক্ষতিহ্রাস কৌশল" এবং "ঝুঁকিহ্রাস কৌশল" হিসেবে ওপরে যা উল্লেখ করলাম তার সাথে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি যুক্ত করা দরকার তা হলো 'শিশুদের' মন-মনন-সুস্থ বিকাশ-উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ড। বিষয়টি নিগূঢ় কয়েকটি কারণে জরুরি: শিশুদের বিকাশের সুযোগ তাদের জীবনে একবারই আসে (তাদের শেখানো দরকার "কীভাবে ভাবতে হবে", "কী ভাবতে হবে নয়"); আজকের মন-মননে পরিবেশ-প্রতিবেশে সুস্থ শিশুই দিতে পারে আগামীর সুস্থ সমাজের নিশ্চয়তা। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে মোট ১৬ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশের বয়স ৪ বছর পর্যন্ত, প্রায় ১৩ শতাংশের বয়স ৫ থেকে ৯ বছর, প্রায় ১২ শতাংশের বয়স ১০ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশেরই বয়স ১৫ বছরের নিচে। বিষয়টি মানুষের বিকাশ-সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক কারণেই অতি গুরুত্বপূর্ণ। স্নায়ুবিজ্ঞানীদের (Neuro scientist) মতে, "আমাদের স্মরণশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় যে স্নায়ু-সার্কিট তা জন্মের প্রথম দিকেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং সচেতন-স্মরণশক্তির কর্মকাণ্ড জন্মের দ্বিতীয় বছর থেকেই শুরু হয়ে যায়। ...আমাদের জন্মের পরের জীবনটা মাতৃগর্ভেই "প্রোগামড্"। আমাদের স্নায়ুতন্ত্র আমাদের জন্মের

আমার হিসাব পদ্ধতিটা বলা প্রয়োজন। যেসব অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমি হিসাবপত্তর করেছি তা হলো: (১) ২০০৮ সালে বাংলাদেশে মোট মসজিদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৮৬টি (দেখুন, আবুল বারকাত ও অন্যান্য, ২০১১, Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact, পৃ. ২৭৬)। বর্তমানে মসজিদের মোট সংখ্যা নির্ধারণে মসজিদ-এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৪.৭ শতাংশ (যা প্রকৃতপক্ষে ১৯৭০-২০০৫ সময়কালে মাদ্রাসার সংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার); (২) ২০১৬ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি যার মধ্যে ৫১.৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯.৫ শতাংশ নারী, এবং জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মুসলমান; (৩) মুসলমান জনসংখ্যার মধ্যে যাদের বয়স ৫ বছর বা তদূর্ধ্ব তারা জুম্মার নামাজ পড়ার যোগ্য ((eligible population অর্থে), যাদের মোট সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ, (৪) প্রতিটি জুম্মা মসজিদে গড়ে ১০০ জন মুসল্লি জুম্মার নামাজ আদায় করেন। বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. Lead Speakers Paper for the workshop *"Countering Religious Extremism in South Asia"*, IISS, London: 09 September, 2015.

আগেই মাতৃগর্ভে এবং জন্মের ঠিক পরপরই বিকশিত হয়। ...মাতৃগর্ভসহ জন্মের পরপরই অতি দ্রুতগতিতে স্নায়ুকোষ বিকশিত হয়; তা চার বছর বয়স পর্যন্ত চলে এবং পরবর্তী সময়ে বিকাশের এ প্রক্রিয়ার গতি কমে আসে। স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত। স্নায়ুতন্ত্রের সুস্থ বিকাশের জন্য মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই যথেষ্ট পুষ্টির প্রয়োজন।... মাতৃগর্ভের পুষ্টিহীনতা শিশুর মস্তিষ্ক কোষের সুস্থ বিকাশে প্রতিবন্ধক, যার ঋণাত্মক প্রভাব বংশপরম্পরা চলে। এ দুষ্টচক্র ভেঙ্গে ফেলার একমাত্র উপায় হলো বিশ্বে খাদ্য সরবরাহের বণ্টনব্যবস্থা ন্যায্যতর করা"।[৭৫] সুতরাং একদিকে যেমন মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর যথামাত্রা যত্ন নিতে হবে; আর অন্যদিকে সমাজে শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা জিইয়ে রেখে মা-এর পুষ্টি এবং শিশুদারিদ্র্য-বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। আর এসব বিষয়ের প্রতি নজর না দিলে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব রোধও সম্ভব হবে না।

১৬. সমগ্র শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সেবাপ্রদান কর্মসূচিকে ১৯৭২-এর সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে সংস্কার সাধন ও তা কোনো ধরনের কালক্ষেপণ না করে বাস্তবায়ন করা।

আশু ও স্বল্পমেয়াদি উল্লিখিত কার্যক্রমে একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যদিকে দেশের গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশানির্বিশেষে সব অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক-সামাজিক- সাংস্কৃতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে তরুণ প্রজন্মকে আর একই সাথে শিশু-কিশোরদের অসাম্প্রদায়িক মন-মনন-মানসিকতা বিনির্মাণে প্রগতিমুখী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

মৌলবাদী জঙ্গিত্ব রোধে এতক্ষণ 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল' ও 'ঝুঁকি হ্রাস কৌশল' সম্পর্কে যা বললাম সেসব মূলত দেশের অভ্যন্তরে করণীয় বিষয় হলেও এসবের অনেকগুলোর সাথে বহিঃস্থ উপাদানসমূহের সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেমন মৌলবাদী জঙ্গিদের অস্ত্রের উৎস, অর্থের উৎস, জঙ্গি কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন

[৭৫] বিস্তারিত দেখুন, ডিক্ সোয়াব, ২০১৫, We Are Our Brains: From the Womb to Alzheimer's, পৃ. ৩২, ৩৬-৩৭, ৪৪-৪৬, ৩৯০।

ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। আর এসব কারণেই মৌলবাদী জঙ্গিত্ব রোধে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল' ও 'ঝুঁকি হ্রাস কৌশল' হিসেবে দেশের বাইরের শক্তিদের (যা আমি 'বহিঃস্থ উপাদান হিসেবে অভিহিত করেছি) কিছু করণীয় আছে। আমার মতে এসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হতে পারে নিম্নরূপ:

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বকে তাদের "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (War on Terrorism) নিয়ে পুনর্ভাবনা প্রয়োজন। এ পুনর্ভাবনায় অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে দুটি বিষয় স্পষ্ট হতে হবে: (ক) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে ভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দখল নয়, (খ) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে যেকোনো অজুহাত ধরে অস্ত্র ব্যবসা নয়। আমার মতে "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"- সূত্রটিই এক ভ্রান্ত সূত্র। কারণ 'যুদ্ধ' নিজেই 'সন্ত্রাস'। এ সূত্রটি এই কারণেও ভ্রান্ত যে যারা "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" ঘোষণা করেছে তারা নিজেরাই যদি সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ-এর স্রষ্টা হয়ে থাকেন তাহলে? সম্ভবত এ কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে লক্ষ্য করে নোয়াম চমস্কি বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ হ্রাস করার অন্যতম পথ হলো নিজেদের এসব থেকে নিবৃত্ত রাখা।"

২. ওদের বিজ্ঞানভিত্তিক নির্মোহ গবেষণা করে বলতে হবে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্বসহ অনুরূপ বিষয়াদির শেকড়ের কারণগুলো (root causes) কী? একই সাথে শেকড়ের কারণ উদ্‌ঘাটনকালে যদি দেখা যায় ওরাই কারণ বা ওরাও কারণ বা কারণের অংশ— তা স্বীকার করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ওদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

৩. ধর্মভিত্তিক (অথবা অনুরূপ) মৌলবাদী জঙ্গিত্ব মোকাবিলায় ওদের 'মিলিটারি/সামরিক সমাধান'-কে মুখ্য না ভেবে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমাধানে জোর দিতে হবে। ওদের সম্ভবত স্বীকার করার সময় এসেছে যে 'মিলিটারি/সামরিক সমাধান' কোনো সমাধানই নয়। ওদের স্বীকার করতে হবে যে চূড়ান্ত সমাধান নিশ্চিত করতে বিশ্ববাজারে ওদের অযৌক্তিক ও অন্যায্য কর্তৃত্ব দূর করতে হবে, প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ দেশ দখল করা বন্ধ করতে হবে, এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অসমতা দূর করতে

সহায়তা দিতে হবে (অথবা ওই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অসমতা সৃষ্টিতে তারা প্রভাব ফেলবে না)।

৪. ধর্মভিত্তিক (অথবা অনুরূপ) মৌলবাদী জঙ্গিত্ব দূর করতে উন্নত বিশ্বকে (বৈশ্বিক একক সাম্রাজ্যবাদকে) অস্ত্র বিক্রির বাজার সৃষ্টি এবং দখলকৃত দেশের পুনর্গঠনের নামে মহাবাজার সৃষ্টির লক্ষ্য বর্জন করতে হবে।

৫. মৌলবাদী জঙ্গিত্ব বিষয়ে তাদের "ওপর থেকে চাপিয়ে না দেওয়া সমাধান" (non-imposed solution)-এর বিষয় গুরুত্বের সাথে জরুরিভাবে ভাবতে হবে। আসলে "ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সমাধান" ইতিহাসে কখনো সমাধান হিসাবে কার্যকর ফল দেয়নি। এসব আসলে সমাধান প্রক্রিয়াকে জটিল থেকে জটিলতর করে।

৬. ওদের গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে যে ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্বসহ অনুরূপ বিষয়াদির কার্যকর সমাধানের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-সম্মানভিত্তিক বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ফোরাম গঠন সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক বিপর্যয় (catastrophe) রোধে ফলপ্রদ হতে পারে।

৭. ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব রোধে সব ধরনের কারিগরি, প্রযুক্তিগত (যেমন Cyber Space Management) ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের কথা শর্তহীনভাবে ভাবতে হবে।

ওপরে যা উল্লেখ করেছি সেসব হলো সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব রোধে আশু বা স্বল্প মেয়াদের "ক্ষতি হ্রাস কৌশল" ও "ঝুঁকি হ্রাস কৌশল"মাত্র। স্বল্পমেয়াদি এসব অবলম্বনে সমাধানও হবে কার্যত স্বল্পমেয়াদি। সুতরাং ভাবতে হবে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের কথা। আমার বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে মাত্র একটি— তা হলো দেশে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য বিলোপসহ অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসাম্প্রদায়িক সব মানুষের সচেতন ঐক্যের কোনো বিকল্পই নেই।

মৌলবাদী অর্থনীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট মৌলবাদী জঙ্গিত্ব— এসবই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে উল্লিখিত কর্মপ্রণালিদ্বয়ের ভিত্তিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো

বিকল্প নেই। ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের সুদৃঢ় এ ঐক্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে নিশ্ছিদ্রভাবে সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে যখন, এ দেশে আর কেউ যেন জন্মসূত্রে দারিদ্র-বৈষম্য জর্জরিত না হতে পারে। আর সে লক্ষ্যে মুক্তিসংগ্রামে অর্জিত জনগণের আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ আইন ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অঙ্গীকার *"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূল নীতি হইবে"* (১৯৭২ এর মূল সংবিধান, প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ), এবং মূল সংবিধানের দশম অনুচ্ছেদ (যা বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী অবৈধ জিয়া সরকার ১৯৭৮-এ বাতিল ঘোষণা করে) যেখানে জনগণের সুস্পষ্ট রায় বিধৃত ছিল এভাবে যে, *"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"*— সংবিধানে বিধৃত এসব গণ-অঙ্গীকার ও গণ-রায় সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এবং অখণ্ডিতভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। এসবের ভিত্তিতেই বাস্তবায়ন করতে হবে সংবিধানের জনকল্যাণকামী মূল বিধানসমূহ, যার মধ্যে আছে মানুষের সমমর্যাদা, সব মানুষের সমসুযোগের অধিকার, কাজ পাওয়ার অধিকার, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এসব সুযোগের অভাবই সে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করে, যার উপরই ভর করে ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক- রাজনৈতিক ভিত্তি যে মাত্রা নিয়েছে, তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়— সংকট নিরসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

এ গ্রন্থে আমি ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিত্বের যে বিচার-বিশ্লেষণ হাজির করেছি তা থেকে যে-কেউই যদি এ ধরনের কোনো উপসংহারে উপনীত হন যে "তাহলে তো আমাদের আরও একবার মুক্তির লড়াই করতে হবে"— সেক্ষেত্রে এ উপসংহার নিয়ে আমিসহ সম্ভবত এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খুব একটা দ্বিমত পোষণ করবে না। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা চেয়েছিলাম, আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম— 'জয় বাংলা' চেতনায় সিক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যে বাংলায় বিনির্মিত হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষনির্বিশেষে শোষণহীন-বঞ্চনাহীন-বৈষম্যহীন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা; যে বাংলায় সৃষ্টি

হবে অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামোর বিজ্ঞানমনস্ক আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ সমাজ; যে বাংলায় ধর্ম হবে যার যার রাষ্ট্র হবে সবার— এবং এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের চার মূল স্তম্ভ— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা— হবে আমাদের প্রগতির প্রধান দর্শনগত ভিত্তি। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৫ বছর পেরিয়ে গেল— এসব তো হলো না। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। আর তারই প্রতিফল হিসেবে ফুলে ফেঁপে উঠল রেন্ট-সিকারনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি; আর একই সাথে ব্যাপক জনমানুষের ক্রমবর্ধমান বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা। এ সবকিছুই আমাদের সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী, ওই চেতনার সাথে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, সম্পূর্ণ উল্টো, পূর্ণমাত্রায় সাংঘর্ষিক। তাই আমাদের দেশের জনগণের বিবেচনার জন্য একটি আহ্বান— আসুন সবাই মিলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের 'জয় বাংলা' চেতনায় আরো একবার ভাবি; আর ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে যা করা যুক্তিসঙ্গত সে পথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি।

এই গ্রন্থে আমার মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির মর্মবস্তু উদ্‌ঘাটন করে অন্ধকার যুগ থেকে আলোকিত যুগে প্রবেশের সম্ভাব্য পথনির্দেশ অনুসন্ধান করা। এ ক্ষেত্রে গবেষণার ভৌগলিক একক হিসেবে বেছে নিয়েছি, আমার নিজ দেশ— বাংলাদেশকে। এ গবেষণায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে প্রকৃত অর্থেই বড় মাপের প্রপঞ্চ; আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বহীন মনে হতে পারে এমন প্রপঞ্চ থেকে শুরু করে যেকোনো বিচারেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ; দৃশ্যমান প্রপঞ্চ থেকে শুরু করে অদৃশ্য প্রপঞ্চ— এ সবকিছু প্রথমেই ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ (analysis) করেছি; ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষিত প্রপঞ্চসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে চেষ্টা করেছি; এবং সবার শেষে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিশ্লেষিত বিষয়াদির সংশ্লেষণ (synthesis) করেছি। ধর্ম নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। গ্রন্থের শেষের দিকে এসে এসব মনে করানোর উদ্দেশ্য একটাই— আর তা হলো— গ্রন্থটি কী নিয়ে এবং কী নিয়ে নয়, তা স্পষ্ট করে আপাতত শেষ কথাগুলো বলতে চাই (আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি যে এসব নিয়ে শেষ কথা বলা দুরূহ ব্যাপার)।

এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত বিষয়াদির সংশ্লেষিত রূপ হিসেবে আপাত শেষ কথাগুলো এ রকম: ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল মৌলবাদী জঙ্গিত্বের শেষ কথা নয়; বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চিরস্থায়ীকরণই সম্ভবত চূড়ান্ত লক্ষ্য। বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার "হোতা" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর চারটি মৌলকৌশলিক সম্পদ— জমিসম্পদ, পানিসম্পদ, তেল-গ্যাস-জ্বালানি-খনিজসম্পদ, আকাশ-মহাকাশসম্পদ— এসবে তাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। বৈশ্বিক মৌলকৌশলিক ওই চার সম্পদ দখলের খেলায় 'হোতা' সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একক খেলোয়াড় নয়, সাথে আছে প্রতিযোগী সাম্রাজ্যবাদ ও অধীনস্থ সাম্রাজ্যবাদ। আর এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি-পন্থার অন্যতম হলো ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া (স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা যেকোনো ধর্মই হতে পারে)। সুতরাং যেহেতু "অর্থনৈতিক শোষণ" আর "বৈশ্বিক রেন্ট সিকিং ব্যবস্থা"-র মিথস্ক্রিয়া সবধরনের বিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য (disparity) ও ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) সৃষ্টির উৎস, যা সবধরনের মৌলবাদ— ধর্মভিত্তিক, বর্ণভিত্তিক, জাতি-গোষ্ঠীভিত্তিক ইত্যাদি—সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির ক্ষেত্র উর্বরতর করে এবং যেহেতু ওই শোষণব্যবস্থা বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও প্রভুত্ব-এর অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণের প্রধান শর্ত, সেহেতু মানব-প্রগতিবিরুদ্ধ এ লড়াই হতে হবে সর্বব্যাপ্ত— একই সাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং মৌলবাদবিরোধী। এ কর্মযজ্ঞটি সৃজনশীল। এ কর্মযজ্ঞ একক কোনো দেশে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয় সমগ্র বিশ্বের শোষিত, নিগৃহীত, বিচ্ছিন্নতার শিকার, বঞ্চিত সবার কাছে এ আহ্বান যুক্তিসঙ্গত যে, আসুন সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদবিরোধী লড়াই-এর এই সৃজনশীল কর্মযজ্ঞে শামিল হই এবং বিনির্মাণ করি শোষণমুক্ত-বঞ্চনামুক্ত-অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের পৃথিবী। এ কর্মযজ্ঞে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে— শুধু বাংলাদেশেই নয় সমগ্র বিশ্বে।

পরিশিষ্ট ১

বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট অথবা জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী অথবা ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনকারী ইসলামি সংস্থাসমূহের নাম
(সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত ও কালো তালিকাভুক্তসহ)

১.	আফগান পরিষদ
২.	আহলে হাদিস আন্দোলন
৩.	আহলে হাদিস যুব সংঘ (এএইচজেএস)
৪.	আহলে হাদিস তবলিগা ইসলাম
৫.	আহসাব বাহিনী (আত্মঘাতী সুইসাইড গ্রুপ)
৬.	আল হারামাইয়েন (এনজিও)
৭.	আল হারাত আল ইসলামিয়া
৮.	আল ইসলাম মারর্টারস ব্রিগেড
৯.	আল ইসলামী সংহতি পরিষদ
১০.	আল-জাজিরা
১১.	আল জিহাদ বাংলাদেশ
১২.	আল খিদমত
১৩.	আল কুরত আল ইসলামী মারর্টারস
১৪.	আল মারকাজুল আল ইসলামী
১৫.	আল মুজাহীদ
১৬.	আল-কায়েদা
১৭.	আল সাঈদ মুজাহিদ বাহিনী
১৮.	আল তানজীব
১৯.	আল উম্মাহ
২০.	আল্লার দল *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
২১.	আল্লার দল ব্রিগেড (আত্মঘাতী দল)
২২.	আল ইয়াম্মা পরিষদ
২৩.	আমানাতুল ফারকান আল খাইরিয়া
২৪.	আমিরাত-ই-দিন
২৫.	আমরা ঢাকাবাসী
২৬.	আনজুমানে তালামজিয়া ইসলামীয়া
২৭.	আনসার আল ইসলাম
২৮.	আনসারুল্লাহ মুসলামিন

২৯.	আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)*
৩০.	আরাকান আর্মি (এএ)
৩১.	আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট (এএলপি)
৩২.	আরাকান লিবারেশন পার্টি
৩৩.	আরাকান মুজাহিদ পার্টি
৩৪.	আরাকান পিপলস আর্মি
৩৫.	আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স
৩৬.	আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট
৩৭.	আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)
৩৮.	ইউনাইটেড স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আরকান মুভমেন্ট
৩৯.	ইবতেদাদুল-আল মুসলিমা
৪০.	ইকতেদুল তালাহ-আল মুসলেমিন
৪১.	ইকতেদুল তুলাহ-আল-মুসলেমিন (আইটিএম)
৪২.	ইন্টারন্যাশনাল খাতমে নব্যুয়ত মুভমেন্ট
৪৩.	ইসলাহুল মুসলেমিন
৪৪.	ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ
৪৫.	ইসলামী জিহাদ গ্রুপ
৪৬.	ইসলামী লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ (আইএলটিবি)
৪৭.	ইসলামী প্রচার মিডিয়া
৪৮.	ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
৪৯.	ইসলামী সমাজ *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৫০.	ইসলামিক ডেমোক্রাটিক পার্টি *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৫১.	ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট
৫২.	ইয়ং মুসলিম
৫৩.	এবতেদাতুল আল মুসলামিন
৫৪.	এহসাব বাহিনী
৫৫.	ওয়ারেট ইসলামিক ফ্রন্ট
৫৬.	ওয়ার্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ
৫৭.	ওলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যানাত *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৫৮.	কালেমায়ে-জামাত
৫৯.	কালেমা-ই-দাওয়াত (অধ্যাপক আবদুল মজিদ এ দলের প্রধান)
৬০.	কতল বাহিনী (আত্মঘাতী গ্রুপ)
৬১.	খাতেমী নব্যুয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ (কেএনএপিবি)
৬২.	খাতেমী নব্যুয়াত কমিটি বাংলাদেশ

৬৩.	খিদমত-ই-ইসলাম
৬৪.	খিলাফত মজলিশ
৬৫.	খিতল-ফি-সাবিলিল্লাহ
৬৬.	খিলাফত-ই- হুক্‌মত
৬৭.	ছাত্র জামায়েত
৬৮.	জাদিদ-আল-কায়েদ
৬৯.	জাগ্রত মুসলিম বাংলা
৭০.	জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)*
৭১.	জামাত-এশ-সাদাত
৭২.	জামায়াত-উল-ইসলাম মুজাহিদ
৭৩.	জামা'আতুল-মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)*
৭৪.	জামাত-ই-মুদারাসিন বাংলাদেশ
৭৫.	জামাত-ই-তুলবা
৭৬.	জামাত-ই-ইয়াহিয়া
৭৭.	জামাত-উল-ফালিয়া
৭৮.	জামাতুল ইসলাম মুজাহিদ
৭৯.	জামাতে আহলে হাদিস
৮০.	জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া
৮১.	জামিয়াতি ইসলামী সলিডারিটি ফ্রন্ট
৮২.	জামিয়াতুল ইয়াহিয়া উত তুরাজ
৮৩.	জঙ্গি হিকমত
৮৪.	জয়শে মুস্তাফা
৮৫.	জয়শে মোহাম্মদ
৮৬.	জামাতুল আল-শাদাত
৮৭.	ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান
৮৮.	ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকান (এনইউপিএ)
৮৯.	নিজামায়ে ইসলামী পার্টি
৯০.	ফার ইস্ট ইসলামী
৯১.	তা আমির-উল-দীন বাংলাদেশ *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৯২.	তাহফিজ হারমাইন
৯৩.	তামির উদ্দিন বাংলাদেশ
৯৪.	তানজিম বাংলাদেশ

৯৫.	তানজিন-ই-খাতেমি নব্যুয়ত
৯৬.	তাওহিদী জনতা
৯৭.	তাওহিদ ট্রাস্ট *(সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)*
৯৮.	দাওয়াত- ই- ইসলাম
৯৯.	বাংলাদেশ ইসলাম রক্ষা কমিটি
১০০.	বাংলাদেশ জামায়াত-উল-তালাবা-ই-আরাবিয়া
১০১.	বাংলাদেশ সন্ত্রাসবিরোধী দল
১০২.	বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট
১০৩.	মজলিশ-ই-তাফিজা খাতমি নব্যুয়ত
১০৪.	মুজাহিদ অব বাংলাদেশ
১০৫.	মুজাহিদী তোয়াবা
১০৬.	মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্ট অব বার্মা
১০৭.	মুসলিম মিল্লাত শরীয়াহ কাউন্সিল
১০৮.	মুসলিম মুজাহিদীন বাংলাদেশ (এমএমবি)
১০৯.	মুসলিম মিল্লাত বাহিনী
১১০.	মুসলিম রক্ষা মুজহাদিল
১১১.	রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেস ফোর্স
১১২.	রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট
১১৩.	রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট
১১৪.	রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন
১১৫.	রিভাইভাল অব ইসলামীক হেরিটেজ (এনজিও)
১১৬.	লিবারেশন মিয়ানমার ফোর্স
১১৭.	লুজমা মককা আল খায়েরা
১১৮.	শাহাদাত-ই-আল হিকমা *(২০০৩ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)*
১১৯.	শাহাদাত-ই-নব্যুয়াত
১২০.	শহীদ নাসিরুল্লাহ খান আরাফাত বিগ্রেড (আত্মঘাতী গ্রুপ)
১২১.	সত্যবাদ
১২২.	সাহাবা সৈনিক
১২৩.	হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদ
১২৪.	হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি) *(২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)*
১২৫.	হায়েতুল ইগাসা
১২৬.	হেফাজতে খাতেমী নব্যুয়ত
১২৭.	হিজবুত তাহ্‌রীর *(২০০৯ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)*

১২৮.	হিজবা আবু ওমর
১২৯.	হিজবুল মাহাদী
১৩০.	হিজবুল্লাহ আদেলী বাংলাদেশ
১৩১.	হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ
১৩২.	হিজবুত তাওহিদ
১৩৩.	হিকমত-উল-জিহাদ

উৎস: আবুল বারকাত, ২০০৭, "Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the basis of 30 Case Studies", in Berger MS and A Barkat (2007), Radical Islam and Development AID in Bangladesh, Netherlands Institute for International Relations "Clingendael"; আবুল বারকাত, ২০১৫, A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A high probability global catastrophe with reference to Bangladesh. Lead Speaker's Paper for the workshop *"Countering Religious Extremism in South Asia"* IISS, London, United Kingdom: 09 September 2015; আবুল বারকাত, ২০১৭, Political Economy of Religion-based Extremism in Bangladesh: When in a Unitarian Imperialism External Causes Override Internal Causes, XVIII World Congress of the International Economic Association, Mexico: 19-23 June 2017.

নোট: এই তালিকায় যে ১৩৩টি সংগঠন/সংস্থা/দল/গ্রুপ/গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার বেশির ভাগই প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম ধর্মভিত্তিক জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু আছে যারা উক্ত জঙ্গিবাদ সমর্থন করে, আবার দু-একটি সংগঠন/সংস্থা আছে যাদের সাথে উল্লিখিত জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতা পাওয়া না গেলেও তারা ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং/অথবা খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলে। বাংলাদেশে ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা সবাই একমত। ইসলাম শরিয়াহ্ভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ-পদ্ধতি নিয়ে এদের অনেকের মধ্যেই মতপার্থক্য থাকলেও এদের সবাই যা বলে তার মূল কথা "ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম নয়, রাষ্ট্রই হবে ইসলামি" অথবা "সংবিধানে ইসলাম নয়, ইসলামই হবে সংবিধান "।

পরিশিষ্ট ২

গণজাগরণ মঞ্চ-এর ৬ দফা

১. একাত্তরের সকল ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

২. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে বিবাদীপক্ষের মত বাদীপক্ষেরও আপিলের সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং আপিল বিভাগের সর্বোচ্চ ৩ মাসের মাথায় আপিল নিষ্পত্তির আইনি বিধান রেখে আইন সংশোধন করতে হবে ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমার বিধান এ আইনের ক্ষেত্রে রহিত করতে হবে।

৩. ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ঘাতক-দালালরা দেশ ধ্বংসের যে রাজনীতি করছে সেই রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা এসব কুলাঙ্গারদের গ্রেফতার করে অবিলম্বে কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে।

৪. যেসব রাজনৈতিক দল, শক্তি, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষার চেষ্টা করছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা করছে এবং তাদের সঙ্গে আঁতাত করছে, তাদেরও আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে।

৫. পঁচাত্তরের পরে যেসব যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে আবার গ্রেফতার করে বিচার করতে হবে।

৬. যুদ্ধাপরাধীদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করে তাদের আয়ের উৎস বন্ধ করতে হবে।

প্রথম প্রচারের তারিখ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

পরিশিষ্ট ৩

১৭ আগস্ট ২০০৫ দেশব্যাপী (৬৩ জেলায়) ইসলামি জঙ্গিদের একযোগে বোমা হামলার সময় বিতরণকৃত লিফলেট (জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ, জেএমবি-র নামে প্রচারিত)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে

বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আহ্বান!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'আলার জন্য এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে - "আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার অধিকার নাই" (সূরা ইউসুফ-৪০)। "শুনে রাখ! তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা" (সূরা আ'রাফ-৫৪)। "আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি ঈছাবা (দল) সব সময় সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে" (সহীহ মুসলিম - ৪৮০৪/৫ ইঃ ফাঃ)।

জনগণের প্রতি আহ্বান!

প্রিয় দেশবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে এবং শুধুই তাঁর ইবাদতের জন্য যাতে থাকবে না কোন অংশীদার। আমাদের মাঝে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন এই শিক্ষা দেয়ার জন্য যে আমরা কিভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কাজে কর্মে তাগুতকে বর্জন করতে পারি। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন - "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন কর" (সূরা নাহল-৩৬)।

তাগুত ঃ- মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ বা উপাস্যের আসনে বসিয়ে তার ইবাদত বা আনুগত্য করে এবং কোন ব্যাপারে তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তবে সেই অংশীদার ইলাহকে বলা হয় "তাগুত"। ক্ষমতাসীন তাগুত ঃ- আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী জালিম শাসক, অর্থাৎ যে শাসক আইনের বলে হারামকে হালাল করে। যেমনঃ- যিনা, সুদ, মদ্যপান বা অশ্লীলতার অনুমোদন দেয়, কিংবা হালালকে হারাম করে। যেমনঃ- জিহাদ-কিতালে বাধা দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরিকৃত অথবা কাফের-মুশরেকদের বিধান অনুযায়ী শাসন করে সে হলো "ক্ষমতাসীন তাগুত"।

কোন মুসলিম ভূখন্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান চলতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম বাস করা সত্ত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহর বিধান কার্যকর নেই। উপরন্তু দেশের জেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নিম্ন ও উচ্চ আদালত গঠন করে যে বিচারকার্য পরিচালনা করা হচ্ছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে মনুষ্য রচিত সংবিধান। যে সংবিধান প্রণয়ন করেছে কিছু জ্ঞানপাপী মানুষ। কথা ছিল মানুষ হিসেবে একজন মানুষের কাজ হবে আল্লাহর দাসত্ব করা ও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা। কিন্তু সে মানুষ আজ নিজেই সংবিধান রচনা করে আল্লাহর বিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছেন তা একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কোথাও প্রচলিত কাফির-মুশরিক বিরচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এসব প্রত্যেকটি পদ্ধতিই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের প্রতিপক্ষ এক একটি ব্যবস্থা। এবং কাফির-মুশরিক ও ইহুদী মস্তিষ্ক প্রসূত এসব বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার মানসে। কাজেই এদেশের মুসলিম জনতার আজ ভাবার সময় এসেছে।

তাই জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ আল্লাহর হুকুম ও ঈমানের দাবীকে সামনে রেখে এই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। পাশাপাশি যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক; বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকায় দেশ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। অন্যথায় জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ্‌ নির্দেশিত ক্বিতাল পদ্ধতির সামগ্রিক বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। অতএব, যতদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন। আপনাদের যেকোন বিচার ফয়সালার জন্য মসজিদের খতিব, মাদ্‌রাসার মুহাদ্দেস ও অভিজ্ঞ আলেমেদ্বীনের কাছে গিয়ে আল্লাহর আইনের ফয়সালা প্রার্থনা করুন। তাগুত সরকারের আইন উপেক্ষা করে আল্লাহর আইনের বিচার ফয়সালা নিন।

আল্লাহ্‌ বলেনঃ- "তারা কি জাহেলী বিধানের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্‌ অপেক্ষা ঈমানদারদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" (সূরা মায়েদাহ-৫০)। "তবে কি আমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করবো?" (সূরা আন'আম-১১৪)। "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা তাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে।" (সূরা নিসা-৬০)।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান!

যারা হেদায়েতের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম। হেদায়েত প্রাপ্তির পর গোমরাহী ও অন্ধকারের দিকে ফিরে আসা উচিত নয়। আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে সত্য দ্বীন সহকারে সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী হিসাবে। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে, আল্লাহ্‌ তাদের সঠিক ভাবে হেদায়েত দিয়েছেন। আর যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। অতঃপর তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের আনুগত্য করেছে। অতএব বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান! আপনারা এদেশে আল্লাহর আইন চালু করুন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো। আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা দেশে তাগুতী শাসনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন চাই।

পরের পৃষ্ঠায়

জামাআ'তুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর কর্মীরা আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করার জন্য এরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে। যেমন নিয়েছিলেন নবী-রাসূল, সাহাবী ও যুগেযুগে বীর মুজাহিদগণ। জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এদেশ থেকে সমস্ত শিরক-বিদ'আতের অবসান ঘটিয়ে খালেছ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। এবং এর মাধ্যমে জনগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী দেখতে চায়।

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ লিফলেট ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে সরকারকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিপূর্বে দু'বার আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিবারই সরকার তাদের কর্মীদেরকে গ্রেফতার করেছে। জামা'আতুল মুজাহিদীন তার কোন পাল্টা এ্যাকশন নেয় নি। কিন্তু এবারের আহ্বান জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার তৃতীয় আহবান। এই আহ্বানের পর সরকার যদি এদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করে, বরং আল্লাহর আইন চাওয়ার অপরাধে কোন মুসলিমকে গ্রেফতার করে, অথবা আলেম ওলামাগণের উপর নির্যাতন চালায় তাহলে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা এ্যাকশন নিবে ইন'-আল্লাহ্।

জাতীয় সংসদের সরকারী ও বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান!

কাফের রচিত গণতান্ত্রিক এই পদ্ধতিটি সরকারী ও বিরোধী দল নামে দুটি পক্ষ সৃষ্টি করে জাতিকে দলে দলে বিভক্ত করে দেয়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য হরতাল, অবরোধ করে জনগণের ক্ষতি সাধন করার অধিকার দেয়। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির অপরাধের জন্য জনগণকে অবরুদ্ধ করে রাখা, সারা দেশ অচল করে দেয়াও গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান সম্মত।

এদেশে যারা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায় তারা ইসলামের শত্রু। অতএব, আল্লাহর হেদায়েত পেতে চাইলে দলাদলি বাদ দিয়ে সরকারী ও বিরোধীদল মিলে অবিলম্বে দেশে ইসলামী আইন চালু করুন। তাগুতী সংবিধান পরিত্যাগ করে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ থেকে সমুদয় শিরক-বিদ'আত, অশ্লীলতা দূর করে জনগণকে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করতে দিন। আর আপনারা যদি বুশ-ব্লেয়ার চক্রের ভয়ে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার সাহস না পান, তাহলে গণতন্ত্রের তাগুতী রাজনীতি ছেড়ে দিন। আলেম-ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে গড়াই পদ্ধতিতে তৌহিদী জনতা এদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে ইনশা-আল্লাহ্।

সরকারী আমলা ও বিচারকগণের প্রতি আহ্বান!

সরকার দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করলে আপনারা প্রশাসনিক কাজকর্ম ও তাগুতী আইনে বিচারকার্য পরিচালনা বন্ধ করুন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন ধন্য করুন। সেই সাথে আর্মি, বিডিআর, পুলিশ ও র‍্যাব সহ সকল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের প্রতি আহ্বান। আপনারা তাগুতী আইন হেফাযতের পরিবর্তে আল্লাহর আইন হেফাযতে সচেষ্ট হউন। তাগুতের আদেশ মানবেন না, আল্লাহর আদেশ মানুন। তাগুতের নির্দেশে আল্লাহর সৈনিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। তাগুতের গোলামী ছেড়ে আল্লাহর সৈনিকদের দলে যোগ দিন। তাগুতের সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সৈনিক হয়ে যান। আর যারা তাগুতের গোলামী না ছাড়বে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- "যারা ঈমানদার তারা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করে আল্লাহর রাহে, পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে– (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল" (সূরা নিসা-৭৬)।

বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান!

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হচ্ছে জর্জ ডব্লিউ বুশ। সে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিরীহ মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং জোর করে সকল মুসলিম দেশে কুফুরি সংবিধান চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঈমানহারা করতে চায়। সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রের কুফুরি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে New world order এর মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকেই তার নির্দেশের আওতায় আনতে চায়। এ যেন এক নব্য ফেরাউনী অভিলাষ। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা তার এ অভিলাষ পূর্ণ হতে দিবে না, এবং গণতন্ত্রের কুফুরি মতবাদও প্রতিষ্ঠা হতে দিবে না। গণতন্ত্র হচ্ছে তাগুতের উদ্ভাবিত পদ্ধতি। পৃথিবীতে তাগুতী শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা তাদের প্রধান অস্ত্র। তাগুতী বিধান আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অস্ত্র ধরে তাদেরকে বলে জঙ্গী, সন্ত্রাসী। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- "হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়" (সূরা নিসা-৭১)।

অতএব বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান, আপনারা প্রতিটি মুসলিম দেশে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বাধ্য করুন। সকল মুসলিম দেশ হতে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাগুতী শাসকদের উৎখাত করে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করুন। কুফুরি জাতিসংঘ পরিত্যাগ করুন। ইসলামী দেশ মিলে মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করে মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করুন।

কাফের-মুশরেকদের প্রতি হুশিয়ারী!

বুশ-ব্লেয়ার সহ সমস্ত জালেম শাসকদেরকে হুশিয়ার করা যাচ্ছে যে, তোমরা মুসলিম দেশের দখলদারীত্ব ছেড়ে দাও। মুসলিম দেশে আর মোড়লীপনা করার চেষ্টা করো না। সারা বিশ্বে মুসলিমরা জেগে উঠছে। এখনো যদি মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ না কর, তাহলে তোমাদেরকে পৃথিবীর কোথাও নিরাপদে থাকতে দেয়া হবে না। ইসলামদ্রোহী NGO দেরকে সতর্ক করা যাচ্ছে যে, তোমরা মুসলিম দেশে ইসলাম বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধ কর। তা নাহলে তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটন করা হবে ইনশা-আল্লাহ্।

ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিও ওয়া'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

আহ্বানেঃ-জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ।

পরিশিষ্ট ৪

ঢাকায় ৫ মে ২০১৩ সালে লংমার্চের পরে হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক পেশকৃত ১৩ দফা দাবিনামা

১. সংবিধানে 'আল্লাহ্ উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুণঃস্থাপন এবং কোরান-সুন্নাহ্ বিরোধী সকল আইন বাতিল করতে হবে।

২. আল্লাহ্ রাসুল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে।

৩. কথিত শাহবাগী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক-মুরতাদ এবং প্রিয় নবী (সা.)-র শানে জঘন্য কুৎসা রটনাকারী কুলাঙ্গার ব্লগার ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতার নামে সকল বেহায়াপনা,অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্বলনসহ সকল বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

৫. ইসলামবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সকল অপ-তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

৭. মসজিদের নগরী ঢাকাকে মূর্তির নগরীতে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করতে হবে।

৮. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সকল মসজিদে মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা

অপসারণ এবং ওয়াজ-নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করতে হবে।

৯. রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় দাড়ি-টুপি ও ইসলামী কৃষ্টি-কালচার নিয়ে হাসি-ঠাট্টা এবং নাটক-সিনেমায় খল ও নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস-পোশাক পরিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করতে হবে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণসহ সকল অপ-তৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

১১. রাসুলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম-ওলামা, মাদরাসা ছাত্র এবং তৌহিদী জনতার ওপর হামলা, দমন-পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং গণহত্যা বন্ধ করতে হবে।

১২. সারা দেশের কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ এবং মসজিদের ইমাম-খতিবকে হুমকি-ধামকি ও ভয়ভীতি দানসহ তাদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।

১৩. অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত সকল আলেম-ওলামা, মাদরাসা ছাত্র ও তৌহিদী জনতাকে মুক্তিদান, দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আহত ও নিহতদের ক্ষতিপূরণসহ দুষ্কৃতকারীদেরকে বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

পরিশিষ্ট ৫

২০১৩-১৪ সালে হিযবুত তাহ্‌রীর কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত কয়েকটি লিফলেট ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

হে দেশবাসী! আওয়ামী-বিএনপির ধ্বংসাত্মক রাজনীতির হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নতুন ধারার রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলুন

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌'র নিয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং নিজ জাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে?" [সূরা ইব্রাহীম : ২৮]

পবিত্র কুর'আনের মুফাস্‌সিরগণের বর্ণনামতে উপরোক্ত আয়াতটি কুরাইশ জাহেল সর্দারদের বিষয়ে নাযিল হয়েছে, যারা রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যার ফলে তারা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র রহমতকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জাতিকে নিক্ষেপ করেছিল এক ধ্বংসস্তূপে। আজ ঠিক সেই একই পরিণতির পুনরাবৃত্তি আমরা এদেশে দেখছি। আওয়ামী-বিএনপির জাহেল সর্দাররাও ইসলামের শাসনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পরিণামে বাংলাদেশকে দাঁড় করিয়েছে ধ্বংসস্তূপের দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশে চলমান সংঘাত, বিশৃংখলা, হরতাল এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, এসবই আওয়ামী-বিএনপির ব্যর্থ রাজনীতির ফসল ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই দুর্নীতি, বিভক্তি এবং ধ্বংসাত্মক দলাদলির রাজনীতিকে তার গর্ভে লালন করে। আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে ২০০৬ সালের কথা যখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম লগী-বৈঠার হিংস্র তান্ডব। এই ব্যবস্থা, এদেশের সমস্ত ক্ষমতা ও সম্পদকে সাম্রাজ্যবাদীদের মদদপুষ্ট দুটি পরিবারের হাতের মুঠোয় পুঞ্জীভূত করেছে। এবং এই দুই পরিবারের সহযোগী হিসেবে রয়েছে তাদের ঘনিষ্ট কিছু উচ্ছিষ্টভোগী রাজনীতিবিদ ও গুটিকয়েক বড়মাপের ব্যবসায়ী। এই ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এদেশকে তাদের হীনস্বার্থে যাচ্ছেতাই শাসন করেছে। তারা রয়েছে সকল আইনের উর্ধ্বে এবং যে কারও নিকট হতে দায়বদ্ধহীন! আর দেশের সমস্ত জনগোষ্ঠী তাদের কাছে জিম্মি। সামান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে মানুষ বাধ্য হচ্ছে তাদের হাতে-পায়ে ধরতে, ঘুষ দিতে... হোক তা সরকারী অফিসের সামান্য একটি পিয়নের চাকুরির জন্য, অথবা দেশের 'সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকুরির জন্য; কিংবা গ্রামে অতিপ্রয়োজনীয় ছোট্ট একটি স্কুল বা ব্রীজ নির্মাণের জন্য, ইত্যাদি। এ ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে তারা জন্ম দিয়েছে, কিছু অপরাধী-সন্ত্রাসী-ভন্ড প্রচারকদের সমন্বয়ে একটি দক্ষ-চাটুকার গোষ্ঠী। আর এই গোষ্ঠীকে তারা সর্বদা সময়মতো, জাতির বিরুদ্ধে অবর্ণনীয় ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ও বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাস সংঘটনের জন্য লেলিয়ে দিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষের লাশের উপর ভর করে এই দুই পরিবার ও তাদের সহযোগীরা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে কিংবা ক্ষমতায় আসীন হতে পারে। তারপর তারা তাদের এই তান্ডব ও ধ্বংসলীলাকে জায়েজ করেছে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', 'দেশপ্রেম' কিংবা 'দেশ বাঁচাও' এর মতো সস্তা শ্লোগান দিয়ে।

ধ্বংসাত্মক এই রাজনীতি থেকে মুক্তির পথ কী?

মুক্তির পথ হচ্ছে, হাসিনা-খালেদা ও আওয়ামী-বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করে, দেশকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে, একটি সম্পূর্ণ নতুন নেতৃত্বের অধীনে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এটা করা ছাড়া, আওয়ামী-বিএনপির আরও দুর্নীতি, অপশাসন, বিভক্তি ও ধ্বংসলীলা নীরব দর্শকের মতো চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া এ জাতির আর কোনও ভবিষ্যৎ নাই। নকল-বুদ্ধিজীবিদের বিরামহীন টকশো ও কলামে, তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নয়নের তত্ত্বকথা কিংবা দুই নেত্রীর সংলাপের প্রস্তাবকে বর্জন করুন; না এই দুই নেত্রী কিংবা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আর ভালো কিছু অবশিষ্ট আছে জাতির সামনে উপস্থাপনের।

একমাত্র ইসলামই, এই নতুন ব্যবস্থা ও নেতৃত্বকে খিলাফত রাষ্ট্রের আদলে আমাদের উপহার দিয়েছে। ইসলাম শাসনব্যবস্থা হতে বিষকে অপসারণ করেছে। একটি-দুটি পরিবার কিংবা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে তাদের সহযোগী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের মদদে ক্ষমতাকে পুঞ্জিভূত করে দেশ শাসনের কোন দরজাই ইসলাম খোলা রাখেনি। খিলাফত ব্যবস্থায়, জনগণ অবাধে কোনরকম ভয়-ভীতি, প্রলোভন কিংবা প্রতারণা ছাড়া রাষ্ট্রের প্রধান (খলিফা)কে নির্বাচিত করবে। এ ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক দলগুলোর সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার দাবিতে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার কোন সুযোগ নেই, কারণ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পাদনের বিস্তারিত প্রক্রিয়া ইসলাম উপস্থাপন করেছে। খলিফা কুর'আন এবং সুন্নাহ্‌ দ্বারা দেশ শাসন করবেন, তিনি আইন প্রণেতা কিংবা আইনের উর্ধ্বেও নন। তিনি জনগণ, মিডিয়া, রাজনৈতিক দলসমূহ, উম্মাহ্‌'র প্রতিনিধি পরিষদ (মাজলিশ আল-উম্মাহ্‌) এবং শাসন সংক্রান্ত বিচারিক আদালত (মাহ্‌কামাত আল মাযালিম) দ্বারা জবাবদিহীতার সম্মুখীন হবেন।

খিলাফত ব্যবস্থার দায়িত্ব হচ্ছে, ন্যায়ের সাথে, সঠিক উপায়ে জনগণের দেখভাল করা। খিলাফত বর্তমান শাসনব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত সমাজের নির্যাতিত-অবহেলিত নারী এবং পুরুষ সবাইকে এ করুণ অবস্থা হতে মুক্ত করবে। সমাজের সকল নারী-পুরুষের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে; এবং বিলাসী চাহিদা পূরণের সুযোগ করে দিতে খলিফা বাধ্য। রাসূল (সাঃ) আদেশ করেছেন, **"ইমাম হচ্ছেন অভিভাবক এবং তিনি জনগণের উপর দায়িত্বশীল।"** তাঁর (সাঃ) এই আদেশ মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে। খিলাফত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ধর্মের ভিত্তিতে নয়। কোন অমুসলিম নাগরিককে জোরপূর্বক তার ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করা, রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। এবং তাদের জান, মাল ও সম্মান রক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি একজন অমুসলিম নাগরিকের ক্ষতি সাধন করলো, সে যেন আমার ক্ষতি সাধন করলো।"** জনগণের চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে, খিলাফত বর্তমানে চলমান সীমাহীন দুর্নীতি এবং সম্পদের বৈষম্যের মূলোৎপাটন করবে, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করবে, এবং রাসূল (সাঃ) এর হাদিস, **"তিনটি জিনিসের উপর জনগণের অধিকার – আগুন, পানি এবং সবুজ চারণভূমি"**, অনুসারে তেল, গ্যাস ও কয়লা ইত্যাদির মতো গণমালিকানাধীন সম্পদ - ব্যক্তিমালিকানা ও বিদেশীদের হাত থেকে উদ্ধার করবে, এবং ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ

পরের পৃষ্ঠায়

দিয়ে, দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যাপক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলবে।

এই হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্রের স্বরূপ। আমরা, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত বিভিন্ন বই প্রকাশ করেছি, যেমন খিলাফত ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (যাতে খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো, জবাবদিহীতা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে), ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, খিলাফত রাষ্ট্রের আর্থিক উৎস, ইত্যাদি। তাছাড়া আমরা খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানও প্রকাশ করেছি।

হে দেশবাসী!

খিলাফতই, আওয়ামী-বিএনপির ব্যর্থ রাজনীতির যন্ত্রণা এবং দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে আপনারা যারা আত্মচিৎকার করছেন, তাদের একমাত্র আশার আলো। **হিযবুত তাহ্‌রীর**, তার যোগ্য নেতৃত্ব, শেখ আতা' ইবনু খলিল আবু আররাশতা-এর নেতৃত্বে, যথাযথ জ্ঞান, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং সাহস নিয়ে, সকল প্রকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস, ধ্বংসাত্মক দলাদলির রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিচালনা করতে পুরোপুরি প্রস্তুত। খিলাফত রাষ্ট্রই পারে দেশের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে এবং আপনাদের আজকের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী আওয়ামী-বিএনপির দূষিত রাজনীতির বিপরীতে দেশকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আসীন করাতে।

"আর যদি সে জনপথের অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং তাকুওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত নেয়ামতকে উন্মুক্ত করে দিতাম..." [সূরা আল-আরাফ : ৯৬]

হিযবুত তাহ্‌রীর, আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে, আপনারা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দাবি তুলুন, আর নয় হাসিনা-খালেদা, আর নয় আওয়ামী-বিএনপি, আর নয় গণতন্ত্রের অসাড় শ্লোগান...। দেশের সকল উলামা-মাশায়েখ, শিক্ষকবৃন্দ, আমলা, তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনমত সৃষ্টিকারী ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, আপনারা একত্রিত হউন এবং আপনাদের ওয়ার্ডে ও পাড়া-মহল্লায় **"খিলাফত কমিটি"** গঠন করুন। এবং জনগণকে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধে ও খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা-এক দাবিতে সংঘবদ্ধ করুন।

দেশের আপামর জনসাধারণ, পিতা-মাতা, অভিভাবক, ব্যবসায়ী, মুসল্লী, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান, আপনারা নিজ নিজ এলাকার আলেম সমাজ, শিক্ষকবৃন্দ, নেতৃবৃন্দ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট এই দাবি তুলুন, যেন তারা **"খিলাফত কমিটি"** গঠন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার আহ্বানকে একমাত্র আহ্বান করায় অগ্রগামী হয়। বিশেষ করে, আলেম সমাজ ও ইসলামী দলগুলোর নিকট গিয়ে আপনাদের এই দাবি তুলতে হবে, যেন তারা আওয়ামী-বিএনপি বলয় হতে বের হয়ে আসে এবং নবী-রাসূলদের উত্তরসূরী হিসেবে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তাদের ইসলামিক দায়িত্ব পালন করে; একমাত্র খিলাফতই রাসূল (সাঃ) এর সম্মান রক্ষা করবে, যে খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা এবং প্রসারের জন্য তিনি (সাঃ) তাঁর সমগ্র নব্যুয়তকাল সংগ্রাম করেছেন।

হে সেনাবাহিনীর নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ!

বাংলাদেশ আজ এমন এক ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে, যেখানে আপনারাই পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে। জনগণ আওয়ামী-বিএনপির রাজনীতির উপর হতাশ ও ত্যাক্ত-বিরক্ত। জাতিকে এই করুণদশা থেকে মুক্ত করুন। ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের এই স্মৃতি থেকে পরিত্রাণের আশায় তারা তীর্থের কাকের মতো আপনাদের পথ চেয়ে বসে আসে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এর ডাকে আপনাদের সাড়া দিতে এ জাতিকে আর কত প্রাণ দিতে হবে; আর কত ধ্বংসলীলা নিরুপায় হয়ে সহ্য করতে হবে? আর আওয়ামী-বিএনপির দুঃশাসনের অভিভাবক হবেন না, ফিতনা-ফ্যাসাদের এই সরকারকে অপসারণ করুন – গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার কিংবা সামরিক শাসনের জন্য নয় বরং **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিষ্ঠাবান, সচেতন এবং চিন্তাশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য। আমরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবো, পিলখানা হত্যাকান্ডের দায়ে হাসিনা ও তার দুষ্কর্মের সহযোগীদের বিচার করবো এবং সেনাবাহিনীকে মার্কিন-ভারতের কর্তৃত্ব থেকে চিরতরে মুক্ত করবো।

০৯ জমাদিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরী
১৯ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

www.khilafat.org
www.hizb-ut-tahrir.info

হিযবুত তাহ্‌রীর, *উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ*

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

নং: ১৪৩৪-০৯/১ | শুক্রবার, ২৩ শাওয়াল, ১৪৩৪ হিজরী | ৩০-০৮-২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মার্কিন দালাল অত্যাচারী বাশার আল-আসাদ কর্তৃক সিরিয়ার মুসলিমদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিবাদ সমাবেশ

মার্কিন দালাল অত্যাচারী বাশার আল-আসাদ কর্তৃক সিরিয়ার মুসলিমদের উপর বিভীষিকাময় রাসায়নিক অস্ত্র হামলার প্রতিবাদে হিযবুত তাহ্‌রীর আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছে। সমাবেশে বক্তাগণের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর অপরাধী বাশার সরকার কর্তৃক সংঘটিত এমন ঘৃণ্য কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষত ক্রুসেডার আমেরিকা ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে বাশার সরকারকে প্রত্যক্ষ মদদ প্রদানের বিষয়টিও তুলে ধরা হয় এবং তার নিন্দা জানানো হয়। মূলতঃ এদের সবুজ সংকেত পেয়েই বাশার খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সিরিয়ার জনগণের ইসলামী জাগরণকে ব্যর্থ করতে মুসলিমদের উপর ইতিহাসের এমন বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে। বক্তাগণ সিরিয়ার মুসলিমদের ইসলামী জাগরণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতি আহ্বান জানান। তারা বাশারের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের নামে "আমেরিকা ও পশ্চিমাদের ভাড়াটে সৈনিক" উপাধীর মতো অপমানজনক অর্জন নয় বরং বাশারের বিরুদ্ধে ১ম সারিতে অবস্থান নিয়ে দুনিয়াতে বিরাট সম্মান এবং আখিরাতে পুরস্কার অর্জনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। সবশেষে সিরিয়ার মুসলিমদের আসন্ন বিজয় এবং বাশার ও তার প্রভুদের আসন্ন পরাজয়ের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট দো'আ করা হয়।

সমাবেশ শেষে দলের নেতা-কর্মীগণ, হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ সিরিয়া-এর মিডিয়া কার্যালয়ের প্রধান হিসাম আল-বাবা কর্তৃক প্রেরিত নিম্নোক্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি বিতরণ করেন।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়

উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

দামেস্কের বিভিন্ন এলাকায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে নৃশংস হত্যাকান্ড বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উম্মাহ্'র সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক আশ-শামের জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার এটাই যথোপযুক্ত সময়!

এই নরঘাতক এবং তার চক্রান্তের সহযোগী এবং যারা উম্মাহ্'র শত্রু পূর্ব-পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত রাসায়নিক অস্ত্রের মতো বিভিন্ন মারণাস্ত্র দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করেছে, তাদের পরাজিত করার এটাই যথোপযুক্ত সময়!

শোকার্ত মা আর শ্বাসকষ্টে কাঁতর শিশুদের কান্নার রোল এতটাই প্রবল ছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও পশ্চিমা মারণাস্ত্রের শিকার নারী-পুরুষ-শিশুর মরদেহের স্তূপে দাঁড়ানো স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধাগণ এবং এক আল্লাহ্'তে বিশ্বাসী উন্নত শিরে শোক প্রকাশকারীগণের গর্জনেও তা শোনা যাচ্ছিল। বাশার এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শাসককে লানত বর্ষণ করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে তারা আল্লাহ্'র নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে জাহান্নামের আগুনই যেন এদের শেষ ঠিকানা হয়। গওতার আশ-শামের এমনই কোন এক বীরের গর্জনে তাদের জীবন-মরণ দশার চিত্র এভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে : "আল্লাহ্ আকবার তোমাদের উপর হে মুসলিমদের অত্যাচারী শাসকগণ, এগুলো নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের লাশ - এরা ইসলামের শহীদ। আল্লাহ্ আকবার তোমাদের নীরবতার উপর... কোথায় মুসলিম সেনাবাহিনী?" আশ-শামের বিপ্লবে উম্মাহ্ ও তার সমর্থন কোথায়? হে মুসলিমগণ, জল্লাদদের ক্ষমতার মসনদকে কাঁপিয়ে তুলতে কখন তোমরা জেগে উঠবে, কখন সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে?

Hizb ut Tahrir / Wilayah Bangladesh Official Website: www.khilafat.org
E-Mail: media@hizb-ut-tahrir.info

HT Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
HT Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info

পরের পৃষ্ঠায়

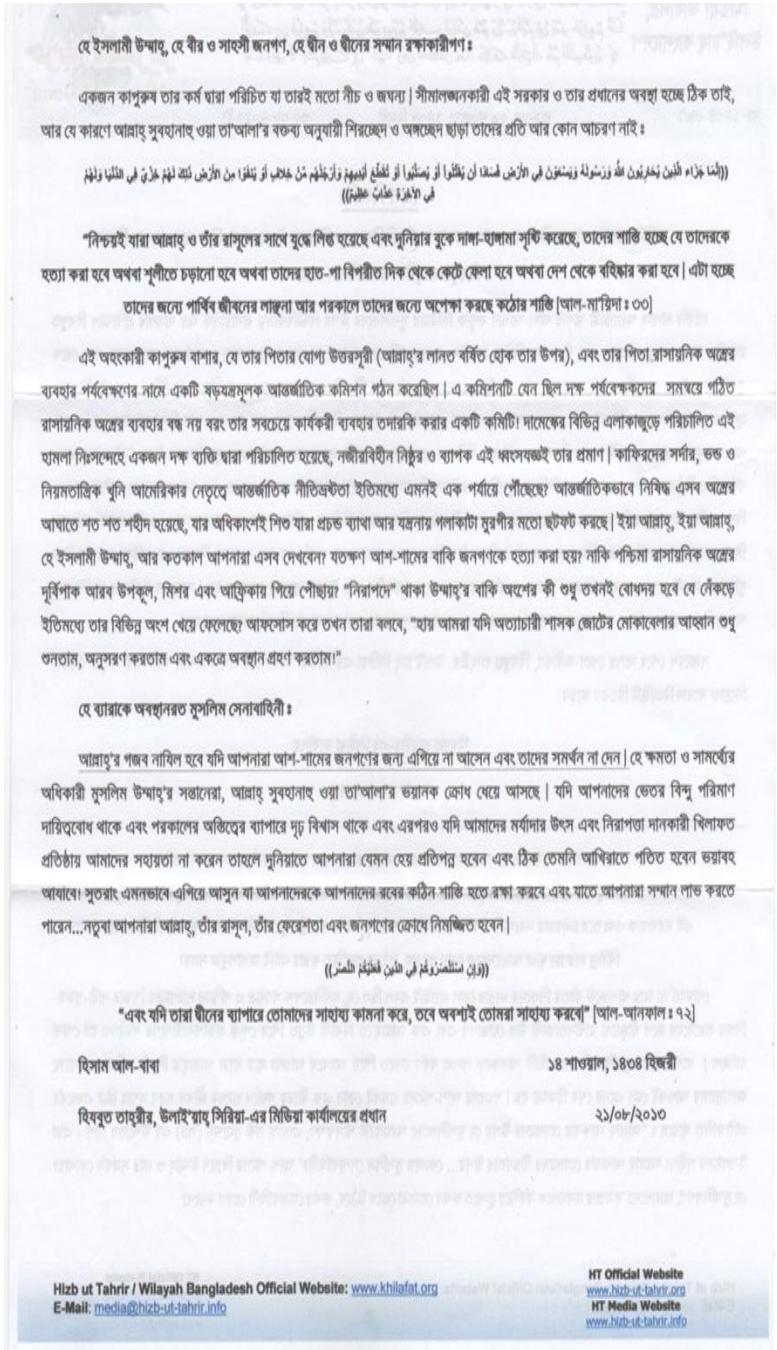

হে ইসলামী উম্মাহ্, হে বীর ও সাহসী জনগণ, হে দ্বীন ও দ্বীনের সম্মান রক্ষাকারীগণঃ

একজন কাপুরুষ তার কর্ম দ্বারা পরিচিত যা তারই মতো নীচ ও জঘন্য। সীমালঙ্ঘনকারী এই সরকার ও তার প্রধানের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তাই, আর যে কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বক্তব্য অনুযায়ী শিরচ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদ ছাড়া তাদের প্রতি আর কোন আচরণ নাইঃ

((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ))

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে, তাদের শাস্তি হচ্ছে যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হচ্ছে তাদের জন্যে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠোর শাস্তি [আল-মায়িদা ঃ ৩৩]

এই অহংকারী কাপুরুষ বাশার, যে তার পিতার যোগ্য উত্তরসূরী (আল্লাহ্'র লানত বর্ষিত হোক তার উপর), এবং তার পিতা রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণের নামে একটি ষড়যন্ত্রমূলক আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করেছিল। এ কমিশনটি যেন ছিল দক্ষ পর্যবেক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ নয় বরং তার সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবহার তদারকি করার একটি কমিটি! দামেস্কের বিভিন্ন এলাকাজুড়ে পরিচালিত এই হামলা নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, নজীরবিহীন নিষ্ঠুর ও ব্যাপক এই ধ্বংসযজ্ঞই তার প্রমাণ। কাফিরদের সর্দার, ভন্ড ও নিয়মতান্ত্রিক খুনি আমেরিকার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক নীতিভ্রষ্টতা ইতিমধ্যে এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছে? আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ এসব অস্ত্রের আঘাতে শত শত শহীদ হয়েছে, যার অধিকাংশই শিশু যারা প্রচন্ড ব্যাথা আর যন্ত্রনায় গলাকাটা মুরগীর মতো ছটফট করছে। ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্, হে ইসলামী উম্মাহ্, আর কতকাল আপনারা এসব দেখবেন? যতক্ষণ আশ-শামের বাকি জনগণকে হত্যা করা হয়? নাকি পশ্চিমা রাসায়নিক অস্ত্রের দূর্বিপাক আরব উপকূল, মিশর এবং আফ্রিকায় গিয়ে পৌছায়? "নিরাপদে" থাকা উম্মাহ্'র বাকি অংশের কী শুধু তখনই বোধদয় হবে যে নেকড়ে ইতিমধ্যে তার বিভিন্ন অংশ খেয়ে ফেলেছে? আফসোস করে তখন তারা বলবে, "হায় আমরা যদি অত্যাচারী শাসক জোটের মোকাবেলার আহ্বান শুধু শুনতাম, অনুসরণ করতাম এবং একত্রে অবস্থান গ্রহণ করতাম।"

হে ব্যারাকে অবস্থানরত মুসলিম সেনাবাহিনীঃ

আল্লাহ্'র গজব নাযিল হবে যদি আপনারা আশ-শামের জনগণের জন্য এগিয়ে না আসেন এবং তাদের সমর্থন না দেন। হে ক্ষমতা ও সামর্থ্যের অধিকারী মুসলিম উম্মাহ্'র সন্তানেরা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ভয়ানক ক্রোধ ধেয়ে আসছে। যদি আপনাদের ভেতর বিন্দু পরিমাণ দায়িত্ববোধ থাকে এবং পরকালের অস্তিত্বের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এবং এরপরও যদি আমাদের মর্যাদার উৎস এবং নিরাপত্তা দানকারী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আমাদের সহায়তা না করেন তাহলে দুনিয়াতে আপনারা যেমন হেয় প্রতিপন্ন হবেন এবং ঠিক তেমনি আখিরাতে পতিত হবেন ভয়াবহ আযাবে। সুতরাং এমনভাবে এগিয়ে আসুন যা আপনাদেরকে আপনাদের রবের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবে এবং যাতে আপনারা সম্মান লাভ করতে পারেন...নতুবা আপনারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, তাঁর ফেরেশতা এবং জনগণের ক্রোধে নিমজ্জিত হবেন।

((وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ))

"এবং যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে অবশ্যই তোমরা সাহায্য করবে।" [আল-আনফাল ঃ ৭২]

হিসাম আল-বাবা
হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ সিরিয়া-এর মিডিয়া কার্যালয়ের প্রধান

১৪ শাওয়াল, ১৪৩৪ হিজরী
২১/০৮/২০১৩

Hizb ut Tahrir / Wilayah Bangladesh Official Website: www.khilafat.org
E-Mail: media@hizb-ut-tahrir.info

HT Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
HT Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৪-১২/০১ | বুধবার, ২৫ জিলহজ, ১৪৩৪ হিজরী | ৩০-১০-২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গণতন্ত্র = জনগণের মৃত্যুস্তূপ

আওয়ামী-বিএনপির রাজনীতির কবল থেকে জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের কর্তৃক শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে এমন নিষ্ঠাবান ও সচেতন রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর

গত ৪ দিনে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বিরোধীদলীয় বিএনপি জোটের ডাকা হরতালে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং পুলিশের গুলিতে প্রায় ২০-২৫ জনের প্রাণহানী ঘটে। এই নিয়ে চলমান বছরে (২০১৩) রাজনৈতিক সহিংসতা এবং সরকারি বাহিনীর গুলিতে মোট মৃতের সংখ্যা প্রায় ২৮০০তে দাঁড়ালো। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গণতন্ত্র প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পন্থায় এদেশের জনগণকে হত্যা করে চলেছে। রানা প্লাজায় স্বজনহারাদের বুকফাটা কান্নার রোল এখনও আমাদের কানে বাজে। গণতন্ত্র দ্বারা এমন অগণিত হত্যাকান্ডের তালিকা আমরা তৈরি করতে পারবো। অধিকন্তু নিম্নের সব তালিকা গণতন্ত্রের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরেঃ

গণতন্ত্র = দুর্নীতি আর লুটপাট
গণতন্ত্র = অর্ধেক জনগোষ্ঠীর হতদরিদ্র জীবনযাপন
গণতন্ত্র = নারী নির্যাতন
গণতন্ত্র = ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মানের উপর আঘাত
গণতন্ত্র = সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য
ইত্যাদি, ইত্যাদি

এগুলো হলো বিগত দুই দশকের আওয়ামী-বিএনপির রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ফসল। সুতরাং তারপরও কেন তথাকথিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যে অহেতুক এতো উত্তেজনা? এবং হাসিনা-খালেদার সংলাপ হোক কিংবা না হোক এতে কি আসে যায়? মোজেনা-পঙ্কজের সংলাপই এই শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় কথা, হাসিনা-খালেদা এখানে শুধুমাত্র তাদের মার্কিন-ভারত প্রভুর দালাল। তাই সংলাপ হোক কিংবা সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হোক কিংবা একদলীয় নির্বাচন হোক, ফলাফল সেই একই। জনগণের জীবনে কোন প্রকৃত পরিবর্তন আসবে না। প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য পুরো শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করতে হবে। যার জন্য প্রয়োজন সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের দেশের জনগণের পক্ষে অবস্থান নেয়া। পরিবর্তনের জন্য জনগণ ব্যাকুল হয়ে আছে কিন্তু তাদের হাতে পরিবর্তনের হাতিয়ার নেই। যা নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের হাতে বিদ্যমান কারণ তারা সামরিক ক্ষমতা দ্বারা শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করতে সক্ষম। আর তাই এই শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ তাদের কাঁধে অর্পিত একটি দায়িত্ব কিন্তু তা সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়; বরং ইসলামী শাসন তথা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান এবং সচেতন রাজনীতিবিদদের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে।

পরের পৃষ্ঠায়

দেশের সকল নিষ্ঠাবান, সচেতন ও চিন্তাশীল জনগণের প্রতি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর জোরালো আহ্বানঃ

১. আওয়ামী-বিএনপির শাসন এবং তাদের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করুন। তাদের দ্বারা মৃত্যু আর ধ্বংসস্তূপের নীরব শিকার আর স্বাক্ষী হয়ে থাকবেন না। এবং তাদের সংলাপের জন্য ও আবারও ভোট দিয়ে তাদের উভয়ের একটিকে ক্ষমতায় আনার তাদের নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করবেন না;

২. বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে যোগদান করুন; এবং

৩. আপনাদের বাবা, চাচা, ভাই, সন্তান এবং আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে যারা সামরিক অফিসার তাদের নিকট বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অপসারণ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

এবং নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের প্রতি আমাদের আহ্বানঃ

১. মুসলিম হিসেবে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অন্য যে কোন মুসলিমের চেয়ে আপনাদের কোন অংশে কম নয় বরং অনেক বেশী, কারণ আপনাদের হাতে রয়েছে শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের হাতিয়ার অর্থাৎ সামরিক ক্ষমতা।

২. জনগণ ও দেশের স্বার্থরক্ষার যে শপথ আপনারা নিয়েছেন তা পূর্ণ করতে হবে। অত্যাচারী এবং জনগণের শত্রুদের সেবক কোন যালিমকে পাহারা দেয়ার শপথ আপনারা নেননি।

৩. খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে আনসারদের ভূমিকা পালন করতে হবে। আনসারগণের (রা.) সহায়তায়, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদিনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ১৩৪২ হিজরী (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত চলমান ছিল। যদি আপনারা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আনসার হন, তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের আনসার সাহাবীদের (রা.) মতো একইভাবে পুরস্কৃত করবেন, ইনশা'আল্লাহ্। সুতরাং, এই মুহূর্তে আপনারা হাসিনা সরকারকে অপসারণ করুন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (الأنفال: 24

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সে আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে।"

[সূরা আল-আনফালঃ ২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়

উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

Hizb ut Tahrir / Wilayah Bangladesh Official Website: www.khilafat.org
E-Mail: media@hizb-ut-tahrir.info

HT Official Website
www.hizb-ut-tahrir.org
HT Media Website
www.hizb-ut-tahrir.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে মুসলিমগণ! হাসিনা-খালেদার শাসনের অধীনে মৃত্যুবরণ হচ্ছে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ এবং এই কুফর শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করা ফরয দায়িত্ব

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ের সমাধান হিসেবে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হুকুম দিয়েছেন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে একমাত্র ইসলামকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

"নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সত্য কিতাব (আল-কুর'আন) নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়াঙ্গম করান।" [সূরা আন-নিসা : ১০৫]

এবং জনগণ যাতে তাদের খেয়াল-খুশি মতো যেকোন শাসন কাঠামোয় ইসলাম বাস্তবায়ন না করে এজন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র শাসন কাঠামো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ, যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোন নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন।" তাঁরা (রা.) (সাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলেন: 'তখন আপনি আমাদের কি করতে আদেশ দেন?' তিনি (সাঃ) বললেন: **"তোমরা (তাদের) একজনের পর একজনের বাই'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।"**

তিনি (সাঃ) এই হাদীসটির মাধ্যমে পরিষ্কার করেছেন যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্র যেখানে খলীফা জনগণের কাছ থেকে বাই'আত প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি জনগণের কাছ থেকে তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। জনগণ কুর'আন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়কে তত্ত্বাবধানের জন্য খলীফাকে স্বাধীনভাবে বাই'আত দ্বারা নির্বাচিত করেন। সুতরাং ইসলামী শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্র নয় যেখানে শাসক হচ্ছে একজন রাজা যে তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এটা স্বৈরতন্ত্র নয় যেখানে শাসক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে শাসন করে। এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন নয় যেখানে জনগণ আইন প্রণয়নের জন্য তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে। ইসলাম পশ্চিমাদের প্রবর্তিত মানবরচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ ইসলামে সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্'র এবং জনগণের জন্য আইন হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত শারী'আহ্; দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের প্রণীত আইন নয়।

মুসলিমদের জন্য খিলাফত ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোন শাসনব্যবস্থার অধীনে এবং অন্য কোন শাসনব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হওয়া ভয়াবহ গুণাহ্, হোক সেটা রাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, অথবা গণতান্ত্রিক অথবা অন্য কোন শাসনব্যবস্থা। এবং যতক্ষণ তারা খিলাফত ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোন শাসনব্যবস্থার অধীনে এবং অন্য কোন শাসনব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হতে থাকবে ততক্ষণ তারা এমন একটি শাসনব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করছে যাকে জাহিলিয়্যাতের জীবন হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এমন শাসনব্যবস্থার অধীনে তাদের মৃত্যুবরণ হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার কাঁধে (কোন খলীফার) বাই'আত নেই, সে যেন জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।"

হাদীসটির অর্থ পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট। মুসলিমদের জন্য এমন অবস্থায় বসবাস করা যখন খিলাফত রাষ্ট্র বিদ্যমান নাই, যেখানে ইসলাম দ্বারা শাসনের জন্য একজন খলীফাকে বাই'আত দেয়া যায় এবং তারা যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, অর্থাৎ তারা ভয়াবহ গুণাহ্গার হবে যদি না তারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এই একই অর্থে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে – "যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যখন তার উপর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মুসলিম জামা'আহ্'র কোন ইমাম নাই, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।"

যথাসম্ভব দ্রুত মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করা ফরয দায়িত্ব হওয়া সত্ত্বেও, রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর সাহাবাগণের (রা.) খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে মনোনিবেশ করাটা বিষয়টির সর্বাধিক গুরুত্বের ব্যাপারে তাঁদের (রা.) ঐক্যমত্যেরই (ইজমা আস্-সাহাবা) প্রতিফলন। আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)-এর দাফন সম্পন্নের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিলম্বিত করে তাঁরা (রা.) প্রথমে খলীফা নিয়োগে মনোনিবেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সোমবার সকালে মারা যান এবং তাঁকে (সাঃ) ঐ দিন এবং রাত দাফন ছাড়া রাখা হয়। অতঃপর আবু বকর (রা.)-কে খলীফা হিসেবে নিয়োগের বাই'আত দেয়ার পরই কেবল মঙ্গলবারে রাতে রাসূল (সাঃ)-এর দাফন সম্পন্ন করা হয়। অর্থাৎ তাঁর (সাঃ) দাফন কার্যকে দুই রাত বিলম্ব করা হয়, এবং তাঁর (সাঃ) দাফনের পূর্বে আবু বকর (রা.)-কে বাই'আত দেয়া হয়। এটা কখনোই বৈধ হতো না যদি না মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের ফরযের চেয়েও খলীফা নিয়োগ করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয না হতো; তথাপি এটা ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন বিলম্বের মতো স্পর্শকাতর বিষয়।

হে মুসলিমগণ!

এই হচ্ছে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণের মাধ্যমে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্বের গুরুত্ব। যে ব্যক্তি বর্তমান কুফর শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত না থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, ইসলামের দৃষ্টিতে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং যারা বর্তমানে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যখন হাসিনা দেশ শাসন করছে এবং তারা তাকে অপসারণ এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করল না তবে তাদের মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, যদিওবা আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্ব পালন করি। এবং আগামীকাল যদি খালেদা শাসক হয়, অতঃপর যারা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যখন খালেদা দেশ শাসন করছে এবং তারা তাকে অপসারণ এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করল না, তবে তাদের মৃত্যুও

পরের পৃষ্ঠায়

জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, যদিওবা আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্জ পালন করি।

আপনাদের চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, হে মুসলিমগণ। হাসিনা-খালেদার শাসনের অধীনে কী শুধু জাহিলিয়্যাতের বিস্তৃতিই ঘটছে না? সীমাহীন প্রচণ্ড দুর্নীতি এবং জনগণের সম্পদ লুটপাট করা এখন সরকার এবং রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ! গুম-হত্যা দৈনন্দিন রুটিন কাজ। সেকেন্ডের মধ্যে মানুষকে কুপিয়ে এবং পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে, দ্বিতীয়বার চিন্তাও করতে হচ্ছে না। বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজন (যেমন: বিদ্যুত) মেটাতে কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হচ্ছে এবং অধিকার পেতে বিচারককে ঘুষ প্রদান করা আদালতের আইনে পরিণত হয়েছে। দরিদ্র, হতদরিদ্র এবং এতিমরা মক্কার কুরাইশ সর্দারদের মত বর্তমান শাসকদের দ্বারা উপেক্ষিত হচ্ছে। ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সাথে অসদ্ব্যবহার, ব্যাংকে সুদ, বাজারে প্রতারণা, রাস্তায়-পার্কে-লেকে অশ্লীলতা, ঘরে-বাইরে-সমুদ্রতীরে হলিউড-বলিউড ধাঁচের কনসার্ট...। ইসলাম, কুর'আন এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ) এর উপর ক্রমাগত আক্রমণ। এই তালিকা সীমাহীন। এবং এসব কর্মকাণ্ডে শাসকগোষ্ঠী হয় সরাসরি জড়িত অথবা তাদের দ্বারা অনুমোদিত অথবা তাদের কুফর নীতিগুলোর প্রতিফলন।

হে মুসলিমগণ!

জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু হতে নিজেকে রক্ষা করুন। আপনাদের বর্তমান জীবন হচ্ছে কষ্ট, দুর্দশা এবং দুর্ভোগের জীবন। পরকালের জীবনে প্রশান্তি প্রাপ্তির আশায় সচেষ্ট হন। ডান হাতে আমলনামা নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার রবের সাথে সাক্ষাতের আশায় সচেষ্ট হন। এই শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, যা আপনাদের জন্য আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে এবং দুনিয়ার জীবনে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।

ভাববেন না যে পরিবর্তন অসম্ভব এবং আপনারা যা কিছুই করেন না কেন হাসিনা অথবা খালেদা জিয়া অথবা তাদের বংশধরেরাই দেশ শাসন করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিয়ম ঠিক তার উল্টো এবং তাঁর নিয়মের কোন পরিবর্তন হয় না। এবং তাঁর নিয়ম হচ্ছে জনগণ তার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তখন তাঁর সাহায্য সহকারে জনগণ কর্তৃক পরিবর্তন অর্জিত হবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" [সূরা আর-রা'দ : ১১]

পরিবর্তন অনেক দূরের পথ তা ভেবে পরিবর্তনের কাজ হতে বিরত থাকবেন না। মনে রাখবেন খিলাফত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। আপনাদের চোখের সামনে আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন বিশ্বজুড়ে কিভাবে অত্যাচারী যালিম শাসকদের সিংহাসনগুলো কেঁপে উঠছে এবং এসব যালিম শাসকদের সাহায্যে ও নিজেদের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে তাদের প্রভুরা, বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইউরোপিয়ানরা, যে কত দুর্বল তাও সুস্পষ্ট। বর্তমান অত্যাচারী শাসনের পতন এবং খিলাফতের প্রত্যাবর্তন যে কত সন্নিকটে এসব তারই একমাত্র প্রতিফলন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"এবং তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত নবুয়্যতের আদলে।"

সুতরাং **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সাথে যোগ দিন এবং আপনাদের নিকটবর্তী এবং ঘনিষ্ঠ পরিচিত নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের নিকট শেখ হাসিনাকে অপসারণ এবং **হিযবুত তাহ্রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। এটাই একমাত্র সূক্ষ্ম পরিকল্পনা যার মাধ্যমে সত্যিকারের পরিবর্তন নিশ্চিত।

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ!

আপনাদের যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি চান আপনার মৃত্যু হোক জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু, নিশ্চিতভাবে বলা যায় আপনার জোরালো উত্তর হবে "না"। এখন সুস্পষ্ট এই বার্তা আপনাদের নিকট পৌঁছে গেছে এবং আপনারা জানতে পেরেছেন যে আপনারা জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন না যদি আপনাদের মৃত্যু হয় বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অধীনে। সুতরাং এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন: এই শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আমাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে কার্যকর পদক্ষেপ নিন। এবং জেনে রাখুন যে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আনসারের ভূমিকা পালনকারী এবং সহায়তা (নুসরাহ্) প্রদানকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে এক মহান পুরস্কার।

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ
رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আর যেসব মুহাজির এবং আনসারগণ (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান, যার মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সফলতা।" [সূরা আত-তওবাহ্ : ১০০]

৬ রমযান, ১৪৩৫ হিজরী
৪ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

New offcial website : www.ht-bangladesh.info

www.hizb-ut-tahrir.info

হিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/Ata.AbualRashtah

হিযবুত তাহ্রীর
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ
PeoplesDemandBD

তথ্য উৎস

আনিসুজ্জামান (২০১৭)। আমাদের সংবিধানের মূলনীতি। বাঙলার পাঠশালা আয়োজিত বাংলাদেশ সংবিধান দ্বিতীয় সম্মাননা স্মারক ২০১৭ প্রাপ্তি উপলক্ষে স্বাগত ভাষণ। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ নভেম্বর, ২০১৭।

আফজাল, শা. মো. (২০১৬)। *সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

আফজাল, শা. মো. (২০১৬)। *জঙ্গিবাদের উৎস: মওদুদীপন্থীদের ভ্রান্ত শিক্ষা, রাজনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবসা*। তৃতীয় প্রকাশ। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

আহমেদ, সি. উ. (২০১১)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইমাম, এইচ. টি. (২০১১)। স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু। লেনিন, নূ. (সম্পাদিত) *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু* সংকলন গ্রন্থতে প্রকাশিত। ঢাকা: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

খান, মি. র. (২০১৪)। *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৬)। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬*। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (জুন, ২০১৬)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (২০১১)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সর্বশেষ সংশোধনিসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১)।

জামান, মুহম্মদ শহীদ উজ (২০১৩)। ঊনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ: সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ। ঢাকা: গদ্যপদ্য।

বারকাত, আ., র. আরা, এম. তাহেরউদ্দিন, ফ. ম. জাহিদ, ও মু. বদিউজ্জামান। (২০১৭)। *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস, বিকাশ ও প্রভাব* (অনুবাদ - রেজা, সে. ও সা. রেহানা)। ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স।

বারকাত, আ. (২০১৬)। *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আ. (২০১৬)। *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আ. (২০১৬)। *মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার-প্রসঙ্গে*। বাঙলার পাঠশালা আয়োজিত দক্ষিণ-এশিয়ায় মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নারী-প্রতিরোধ শীর্ষক তৃতীয় দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন ২০১৬-এর জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা, ১১-১২ মার্চ, ২০১৬।

বারকাত, আ. (২০১৫)। *বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন*। বিভাগীয় সেমিনার ২০১৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, রংপুর, ২৪ অক্টোবর, ২০১৫।

বারকাত, আ. (২০১৫)। *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ: মর্মার্থ ও করণীয়*। জাতীয় সেমিনার ২০১৫, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫।

বারকাত, আ. (২০১৫)। *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ : বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছত বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আ. (২০১৪)। *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত লোকবক্তৃতা, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১৪।

বারকাত, আ. (২০১৩)। *বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*। বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি আয়োজিত "বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক একাডেমিক কনফারেন্স ২০১৩-এর জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

বারকাত, আ. (২০১৩)। *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*। বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী আয়োজিত "ধর্ম ও রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়া" শীর্ষক আন্তর্জাতিক গণবক্তৃতা ও সম্মিলন উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ, ঢাকা, ৪-৫ অক্টোবর, ২০১৩।

বারকাত, আ. (২০১৩)। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌলবাদ ও মনোদারিদ্র্য। আহসান, এম., এম. সরকার, এবং বি. কবির (সম্পাদিত) *গদ্যমঙ্গল*-এ প্রকাশিত। কুষ্টিয়া: সাহিত্য একাডেমি।

বারকাত, আ. (২০১৩)। *নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ। ঢাকা, ১৯ জুলাই, ২০১২।

বারকাত, আ. (২০১২)। *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*। জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা, ২৬ জুন, ২০১২।

বারকাত, আ. (২০০৬)। *মৌলবাদী অর্থনীতির জঙ্গিত্বের বছর-২০০৫*। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, নববর্ষ সংখ্যা, ২০০৬।

বারকাত, আ. (২০০৬)। *একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবন, রাজশাহী, ১৫ জুলাই, ২০০৬।

বারকাত, আ. (২০০৬)। *বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি*। ঢাকা: ড. আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা (তৃতীয় সংস্করণ)।

বারকাত, আ. (২০০৫)। *ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার: মহা বিপর্যয় রোধে সেকুলার ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই*। সেকুলার ইউনিটি বাংলাদেশের জন্য উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৫।

বারকাত, আ. (২০০৫)। *বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি*। ড. আব্দুল গফুর স্মারক বক্তৃতা। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র বিষয় ভিত্তিক গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

বারকাত, আ. (২০০৫)। *গভীর ষড়যন্ত্রের পথ ধরে দেশ গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগুচ্ছে*। দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ আগস্ট, ২০০৪।

বারকাত, আ. (২০০৪)। *সাম্প্রদায়িকতা রুখতে হবে—অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য জরুরি।* জাতীয় সংলাপে বক্তব্য, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা, ২৩ মে, ২০০৪।

বারকাত, আ. (২০০২)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর তিরিশ বছরের অর্থনীতি: মানব কল্যাণে ব্যর্থতার ইতিহাস*। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ আয়োজিত "বাংলাদেশ: স্বাধীনতার ত্রিশ বছর" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ। কনফারেন্স হল, বিজনেস স্টাডিজ একাডেমিক ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২৬ এপ্রিল, ২০০২।

বারকাত, আ. (১৯৯০)। *আমেরিকায় পুঁজিবাদ বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে: একটি মার্কসীয় বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, খণ্ড ৩৭, জুন ১৯৯০, পৃ. ১-২০।

মুকুল, কা. (সম্পাদিত) (২০০৫)। *বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস জেহাদের ডাক: রাজনৈতিক দল ও সিভিল সমাজের করণীয়*। ঢাকা: একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

রহমান, মো. মা. (২০১১)। বঙ্গবন্ধুর শাসনামল। লেনিন, নূ. (সম্পাদিত) *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু* সংকলন গ্রন্থতে প্রকাশিত। ঢাকা: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

লেনিন, নূ. (সম্পাদিত) (২০১১)। *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*। ঢাকা: আওয়ামী লীগ।

লেনিন, ভ. ই. (তারিখহীন)। *সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রসঙ্গে* (লেনিনের ১৯১৫ সালে লেখা এবং ১৯২৭ সালে ২১ জানুয়ারি, ১৭ নং 'প্রাভদা'য় প্রথম প্রকাশিত)। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

লেনিন, ভ. ই. (১৯৮০)। *সাম্রাজ্যবাদ—পুজিঁবাদের সর্বোচ্চ স্তর*। লেনিন কর্তৃক জানুয়ারি-জুন ১৯১৬ সালে রচিত এবং ২৬ এপ্রিল ১৯১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত। ভ. ই. লেনিন রচনা সমগ্র (রুশ ভাষায়), পঞ্চম সংস্করণ, খণ্ড ২৭, পৃ: ২৯৯-৪২৬। মস্কো: পলিটিক্যাল লিটারেচার প্রকাশনা।

শরীফ, শ. (সম্পাদিত) (২০১৩)। *ধর্মের রাজনীতি ও বাংলাদেশ*। ঢাকা: গণপ্রকাশন।

সুফী, মো. হো. (২০০৯)। *ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক*। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনা।

AHMAD, A. (2008). Islam, Islamisms and the West. In PANITCH, L. and C. LEYS (Eds.) *Socialist Register 2008: Global Flashpoints*. Vol. 44. London: The Merlin Press.

AHMAD, H. M. T. (1989). *Murder in the Name of Allah* (S. B. Ahmad. Trans.). London: Lutterworth Press.

AHMED, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven and London: Yale University Press.

ALI, T. (2002). *The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity*. London: Verso.

AMIN, S. (2007). Political Islam in the Service of Imperialism. In FOSTER, J. B. and M. D. YATES (Eds.) *Monthly Review*. Vol. 59, No. 7. New York: Monthly Review Foundation.

ARNOLD, T. W. (1896). *The Preaching of Islam*. London: A Constable & Co.

ASAD, T. (2003). *Formation of the Secular: Christianity, Islam and Modernity*. Stamford, CA: Stamford University Press.

BARKAT, A. (2005). *Criminalization of Politics in Bangladesh*. SASNET Lecture, Lund University, Sweden, 15 March, 2005.

BARKAT, A. (2005). *Economics of Fundamentalism in Bangladesh: Roots, Strengths, and Limits to Growth.* Paper presented at South Asia Conference on 'Social and Religious Fragmentation and Economic Development'. Cornell University, USA, 15-17 October. 2005.

BARKAT, A. (2005). *Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh*. Lecture presented at the session organized by SIDA and FÖreningen for SUS. SIDA Auditorium, Stockholm, Sweden, 18 March, 2005.

BARKAT, A. (2006). Economics of Fundamentalism and Growth of Political Islam in Bangladesh. In *Social Science Review*, The Dhaka University Studies. Part D, Vol 23, No. 2. December 2006.

BARKAT, A. (2007). "Islamic Militants in Bangladesh: An Analysis on the basis of 30 Case Studies", in Berger MS and A Barkat (2007), Radical Islam and Development AID in Bangladesh, Netherlands Institute for International Relations "Clingendael"; Netherland: September 2007.

BARKAT, A. (2013). *Economic Power Base of Islamic Fundamentalists in Bangladesh: Formation, Evolution and Strength.* Presented at the Round Table Conference on "Bangladesh: Prospects of Democratic Consolidation", organized by The Society for Policy Studies, India International Centre, New Delhi, 07 November. 2013.

BARKAT, A. (2013). *Political Economy of Fundamentalism in Bangladesh*. Paper presented at the International Public Lecture Series and Conference on 'Religion and Politics: South Asia', organized by Bangladesh Itihas Sammilani, Dhaka, 4-5 October. 2013.

BARKAT, A. (2013). Political Economy of Fundamentalism in Bangladesh. In *Mainstream*, Special Supplement on Bangladesh. New Delhi: Vol. Ll, No 14, March 13, 2013.

BARKAT, A. (2015). *A Political Economy Treatise on Religious Fundamentalism and Extremism: A High Probability Global Catastrophe With Reference to Bangladesh*. Lead Speaker's paper for the workshop "Countering Religious Extremism in South Asia", IISS, UK: London, 09 September, 2015.

BARKAT, A. (2015). *Imperialism and Religious Fundamentalism: A Treatise on Political Economy with reference to Bangladesh*. Keynote paper presented at the International Seminar titled "Combating Fundamentalism and Imperialism in South

Asia", organized by Workers Party of Bangladesh, Dhaka, 29 May, 2015.

BARKAT, A. (2016). *Political Economy of Religion-based Extremism in Bangladesh: When in a Unitarian Imperialism External Causes Override Internal Causes*. Valedictory Paper Presented at International Seminar Organized Jointly by Dhaka University, University Grants Commission, India Bangladesh Foundation, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies (Delhi), and RDC. Dhaka University Senate Hall, Dhaka, 29 August, 2016.

BARKAT, A. (2017). *Political Economy of Religion-based Extremism in Bangladesh: When in a Unitarian Imperialism External Causes Override Internal Causes*. Paper presented at the Eighteenth World Congress of the International Economic Association, Mexico: Santa Fe, 19-23 June, 2017.

BARKAT, A., R. ARA, M. TAHERUDDIN, F. M. ZAHID, and M. BADIUZZAMAN. (2011). *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact.* Dhaka: Ramon Publishers. ISBN 984-70350-0080-0.

BARKAT, A., S. ZAMAN, M. S. KHAN, A. PODDAR, S. HOQUE, and M. TAHERUDDIN. (2008). *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property*. Dhaka: Pathak Shamabesh. ISBN 984-10212-0004-7.

BARKAT, A., S. ZAMAN, M. S. KHAN, A. PODDAR, S. HOQUE, and M. TAHERUDDIN. (2000). *An Inquiry into the Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act: Framework for a Realistic Solution*. Dhaka: PRIP Trust. ISBN 984-70212-0004-7.

BEVERLY, H. (1872). Report of the Census of Bengal 1872. Calcutta: H. Beverly, 1872.

BLACK, J. (1998). *Why Wars Happen*. London: Reaktion Books Ltd.

CAPRA, F. (1988). *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. New York: Bantam Books.

CHOMSKY, N. (1967). On Resistance. In Arnove A. (Ed.) *The Essential Chomsky*. New York: The New Press.

CHOMSKY, N. (2004). *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance*. New York: Henry Holt and Company-A Metropolitan/Owl Book.

CHOMSKY, N. (2005). *Imperial Ambitions: Conversations on the Post-9/11 World - Interviews with David Barsamian.* New York: Henry Holt and Company-Metropolitan Books.

CHOMSKY, N. (2008). Reflections on 9/11. In Arnove A. (Ed.) *The Essential Chomsky*. New York: The New Press.

CHOUEIRI, Y. M. (1990). *Islamic Fundamentalism*. London: Printer Publishers.

COLLINS, C. (2012). *99 To 1: How Wealth Inequality is Wrecking the World and What We Can Do About It*. California: Berrett-Koehler Publishers.

CROOKE, A. (2009). *Resistance: The Essence of the Islamist Revolution*. New York, London: Pluto Press.

DABASHI, H. (2008). *Islamic Liberation Theology: Resisting the Empire*. Oxon: Routledge.

DAWKINS, R. (2006). *The God Delusion*. London: Black Swan.

EATON, R. M. (1993). *The Rise of Islam and Bengal Frontier-1204 to 1760.* Berkeley: University of California Press.

ELLIOT, H. M. and J. DAWSON. (1867-1877). *The History of India as Told by Its Own Historians*. Vol.1-8. London: Trübner & Co.

ESPOSITO, J. L. (Ed.) (1997). *Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* Colorado: Lynne Reiner Publishers.

ESPOSITO, J. L. and D. MOGAHED. (2007). *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*. New York: Gallup Press.

FULLER, G. E. (2003). *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan.

GIBB, H. A. R. (2004). *Ibn Battuta: Travels in Asia and Africa*. New Delhi: D K Publishers.

GIDDENS, A. (2003). Runaway World: How Globalization is Reshaping Own Lives. New York: Routledge.

Global Wealth Report 2017, Credit Suisse Research Institute, Geneva: Switzerland.

HACKETT, C. et al. (2015). *The Future of World Religions: Population Growth Projection, 2010-2050*. Pew Research Center [Online]. Available at http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050, 6 August 2017.

HANSEN. G. H. (1979). *Militant Islam*. London: Pan Books.

HARRISON, F. (2013). *Political Islam & the Elections in Bangladesh*. London: New Mellennium.

HERMAN, E. S. and N. CHOMSKY. (1994). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. London: Vintage Press.

HERRING, G. C. (2008). *From Colony to Superpower: U. S. Foreign Relations Since 1776*. New York: Oxford University Press.

ISLAM, M. (2015). *Limits of Islamism: Jamaat-e-Islami in Contemporary India and Bangladesh*. Delhi: Cambridge University Press.

JANSEN, J. J. G. (1997). *The Dual Nature of Islamic Fundamentalism*. New York: Cornell University Press.

KAPLAN, R. D. (2011). *Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power*. New York: Random House Trade Paperback.

KHAN, M. A. (2009). *Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery*. New York, Bloomington: IUniverse, Inc. (বঙ্গানুবাদঃ জিহাদ : জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সন্ত্রাসবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার। ঢাকাঃ ব-দ্বীপ প্রকাশন)।

LAL, K. S. (1994). *Muslim Slave System in Medieval India*. New Delhi: Aditya Prakashan.

LANDAU, J. M. (1990). *The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization*. Oxford: Clarendon Press.

Latin American Documentation, Torture in Latin America (Lima, Peru: LADOC, 1987). Julio Godoy, The Nation 250, no. 9 (5 March, 1990). [Found from N. Chomsky's Hegemony or Survival]

LAWRENCE. B. B. (1995). *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age*. Columbia: The University of South Carolina Press.

LEVEY, G. B. and T. MODOOD (Eds.) (2009). *Secularism, Religion and Multicultural Citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press.

LEVTZION, N. (Ed.) (1979). *Conversion to Islam*. New York: Holmes and Meier Publishers Inc.

MARTEL, G. (Ed.) (2012). *The Encyclopedia of War* (in 5 Volumes). New Jersey: Wiley-Blackwell.

MAUDUDI S. A. A. (2000). The Political Theory of Islam. In Moaddel, M. and K. Talattof (Eds.) *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam*. New York: Palgrave Macmillan.

MILTON, G. (2004). *White Gold: The Extraordinary Story of Thomas Pellow and Islam's One Million White Slaves*. London: Hodder & Stoughton.

MUHITH, AMA., M KHOSRU, and N. A. Lenin (ed. 2006). Rise of Fanatic Extremism in Bangladesh. Dhaka: Department of Information & Research, Bangladesh Awami League.

NIZAMI, K. A. (1991). *The Life & Times of Shaikh Nizm-u'd-din Auliya*. New Delhi: Idarah-i Adabyat-i Delli.

O'LEARY, D. L. (1923). *Islam at the Cross Roads: A Brief Survey of the Present Position and Problems of the World of Islam*. New York: E. P. Dutton & Co.

PATNAIK, P. (2003). Of Finance and Facism. In PANIKKAR, K.N. and S. MURALIDHARAN (Eds.) *Communalism, Civil Society and the State: Reflections on a Decade of Turbulence*. New Delhi: SAHMAT.

PATNAIK, P. (2003). *The Retreat to Unfreedom: Essays on the Emerging World Order*. New Delhi: Tulika Books.

PEW RESEARCH CENTER (2015). *The Future of World Religions: Population Growth Projection, 2010-2050* [Online]. Available at http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050, 6 August 2017.

PHILLIPS, C. and A. AXELROD. (2005). *Encyclopedia of Wars* (in 3 Volumes). New York: Facts On File, Inc.

PISCATORI, J. P. (Ed). (1983). *Islam in the Political Process*. Cambridge: Cambridge University Press.

RIZVI, S. A. A. (1978). *A History of Sufism in India*. New Delhi: Munshiram Monoharlal Publishers.

SAHIH MUSLIM. *The Book of Tribulations and Portents of the Last Hour*, Chapter: *The Conquest of Constantinople*, book 54, hadith 44, "The Emergence of the Qajjal and the Descent of `Eisa bin Mariam'.

SAIKAL, A. (2003). *Islam and the West: Conflict or Cooperation?* New York: Palgrave Macmillan.

SCHULZE, K. E. (2009). Indonesia ─ The Radicalisation of Islam. In HANSEN, S. J., A. MESOY and T. KARDAS (Eds.) *The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington's Faultlines from Al-Andalus to the Virtual Ummah*. London: Hurst & Co.

SIVAN, E. (1985). *Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics*. New Haven: Yale University Press.

STIGLITZ, J. E. (2013). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W. W. Norton & Company.

STIGLITZ, J.E. (2002). *Globalization and Its Discontents.* New York: W. W. Norton & Company.

SWAAB, D. (2015). *We Are Our Brains: From the Womb to Alzheimer's*. London: Penguin Books.

TALEB, N. N. (2010). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. London: Penguin Books.

"The Monroe Doctrine. (1823)". Basic Readings in the US Democracy. United State Department of State.

The International Institute for Strategic Studies (IISS). (2016). *Asia-Pacific Regional Security Assessment 2016: Key developments and trends*. London: IISS

The Politics Book, (2013)., London: Dorling Kindersley Limited.

TIBI, B. (1998). *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*. Berkeley: University of California Press.

TRITTON, A. S. (1970). *The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of 'Umar*. London: Frank Cass & Co. Ltd.

UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, POPULATION DIVISION. (2015). *World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables*. Working Paper No. ESA/P/WP 241.

WATT, M. W. (1988). *Islamic Fundamentalism and Modernity*. London: Routledge.

WEBER, M. (1977). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Pearson.

WRIGHT, R. (2001). *Sacred Rage: The Wrath of Militant Islam*. New York: Simon & Schuster.

নির্ঘণ্ট

অ
অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ১২৭
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সহচর, ১০২
অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ২২০
অদৃষ্টবাদী, ১২৬
অ্যাংলো-আমেরিকা, ৬৭
অলৌকিক, ২১, ২২
অঢেল সম্পদের মালিক, ১১২
অধীনস্থ সাম্রাজ্যবাদ, ২২১
অন্যায় যুদ্ধ, ৬০, ৭৫
অনন্ত বিজয় দাস, ১৫৮
অপশাসন, ৪৪, ৪৯, ১১১
অপশক্তি, ৩৮
অপারেটিং প্রফিট মুনাফা, ১৩৭, ১৪১
অপার্থিব বিষয়াদি, ১৯৬
অবন্তি, ১২
অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি, ৬২, ১২৮
অরণি, ১২
অসমতা, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৬৪, ৮৭, ১১০, ১১১, ১২৯, ১২২, ১২৬, ১২৮, ১৩৬, ১৫০, ১৬৯, ১৮৬, ১৮৮, ২০২,২০৩, ২১০, ২১১, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০, ২২১
অসাম্প্রদায়িক, ১৩, ১৬, ৩৭, ৫০, ৫৯, ৯৯, ১০৮, ২০৯, ২১৬, ২১৮
অসাম্প্রদায়িক মানসকাঠামো, ১৩, ১১৩, ২২০
অজানা বিষয়াদি, ১৭৮
অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু, ৪১
অধিকার, ২৬, ২৭, ৪৯, ৫০, ৬৫, ৬৬, ৭৯, ৮০, ৮১, ১০৫, ১৭১, ১৭৫, ২২১
অভিবাসন, ৯১, ৯২, ৯৫
অভিগম্যতা, ৮৩, ১৮৬
অভিঘাত, ১৩, ২৮, ১১৫, ২১০
অভিজিৎ রায়, ১৫৮
অগ্নিসংযোগ, ১৬৫, ১৯৮
অতিপ্রাকৃত বিষয়াদি, ১৯৬
অতিজাগতিক, ২১, ২২
অন্তর্নিহিত শক্তি, ৩৮
অশুভ বাস্তব, ১০৮
"অর্থনৈতিক শোষণ", ২২১
"অর্থনৈতিক শক্তিভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া", ১৫২
"অস্ত্র ব্যবসা", ৫৪
"অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ", ৯২
"অজ্ঞাত", ৯২
'অনুপার্জিত সম্পদ', ১৪৯
'অবাধ্য', ৭১, ৭২
"অবাধ্যতার শাস্তি", ৭৭
"অসাম্প্রদায়িকতা", ১২৯
"অ-জনগণকরণ", ৯৮, ৯৯
'অ-জনগণ', ১০০, ২০৮

আ
আর্থসামাজিক, ১২, ২৬, ৪৮, ৬৫, ৭২, ৮৭, ১১২, ১২২, ১২৫, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৬৪, ২০৩, ২১০, ২১৮
আদুরি খাতুন, ১১
আস্থাহীনতা, ১৩৩
আগুন, ২০, ৪১, ৪৫
আধেয়, ৪১
আনিসুজ্জামান, ২৮
আনোখি, ১২
আপেল, ৪৩, ৫৪, ৬৯, ৭১, ৭৫
আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, ১৯৪
আধ্যাত্মিক, ১৭, ২২, ১৯৬, ২০৫
আধ্যাত্মিক বিষয়াদি, ১৯৬
"আধ্যাত্মিকতা", ১৯৬
আব্দুল মোতালেব, ১২
আইএমএফ, ৪৯, ৭৫, ৭৮

আইএস, ১৮, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৫৫, ৬১, ৬৪, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ১২১, ১৬২, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬
আইযায আহমদ, ৩৩
আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, ১৫৮, ১৬৪, ১৮৪, ২২২
আশ্চর্য প্রদীপ, ১৪৩
আবদুর রহমান ফারুকী, ১১৯
আবদুল হক বাবুল, ১১
আবুল আলা মওদুদি, ২৩, ৩৩
আবুল বারকাত, ১২, ১৮, ৬৪, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১১০, ১১১, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৪০, ১৪৫, ১৬৪, ১৭৮, ১৮৯, ১৯২, ২১২, ২১৬, ২২৬
আমলাতন্ত্র, ১২২
আরাধনা, ২২
আল-কায়েদা, ১৬, ১৮, ৩৮, ৫৫, ৬১, ৬৪, ৭৯, ১৬২, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ২২২
আশরাফতত্ত্বের বিশ্লেষণ, ৯৪
আশরাফুল ইসলাম, ১৫৮
আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, ১১
আকাশ-মহাকাশ, ৪৮, ৬১, ৬২, ৮৮, ১৪৬, ২০২, ২২০
আহমেদুর রহমান, ১৫৮
আহমেদিয়া, ৩৬, ৯৩, ১৫৫
আয়না-নিউরন, ১৯৭
আয়াতুল্লাহ খোমেনি, ১৭, ১৩৬
আলায়ি, ৯৩
আলেভি, ৯৩
আলোকিত, ৪৩, ১০৭, ১২৫, ১২৯, ১৯৩, ২০৫, ২০৭, ২২০, ২২১
আন্তর্জাতিক, ১১, ৪১, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৬০, ৬৬, ৭৩, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮৮, ১৩০, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৫৪, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ১৮৪, ২২০, ২২৭
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সমিতি, ১১
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ৭৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ১৩৩, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৭১, ১৭৩
আস্তিক-নাস্তিক, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১
আরিফ রাব্বানি, ১২
আরিফ রায়হান দীপ, ১৫৮
আসিফ মহিউদ্দিন, ১৫৮
আত্মসাৎকারী, ১৩০
আত্মঘাতি, ১০৯
আত্মহত্যা, ১৭০
আত্মতুষ্টি, ৯৫, ১৬০, ১৭৮, ১৮৩
আতাতুর্ক, ৩৮
'আইনের শাসন', ৭৯
'আইএস', ১৮, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৫৫, ৬১, ৬৪, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ১২১, ১৬২, ১৭৩, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬
আমরা বিশ্বপ্রভু, ৮০
"আমরাই বিশ্বপ্রভু", ৮৬
"আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ", ৭৩, ১৭৫
"আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতি", ১৬৫

ই
ইন্টারনেট, ১৩৬
ইন্দোনেশিয়া, ৩৮, ৫২, ৮৩, ৮৪
ই-মেইল, ১৩৬
ইউফ্রেটিস, ৭৪
ইউসুফ চৌয়েরি, ৩৩
ইমানুয়েল সিভান, ৩৩
ইরান, ৭১, ৭৪, ৮০, ৮৩, ৯৫, ২০৪
ইরাক, ২২, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৬০, ৬২, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮৫, ১৭৩, ১৭৫, ১৮৮
ইসলামের শত্রু, ১৭৩, ১৮৮, ১৮৬
ইসলাম, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২২, ২৩, ২৬, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৭,

৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬২, ৭৭, ৮৪, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১৭, ১১৯, ১২৯, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৫, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ২৩১, ২৪১
ইসলাম ধর্ম, ২৭, ৫০, ৯২, ৯৭, ১০৬, ১১১, ১২৯, ১৮৭
ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, ৯৫, ১০৬, ২২২
ইসলাম বিপন্ন, ২৭, ১০৩
ইসলামই হবে সংবিধান, ১০৩, ১৭২, ২২৬
ইসলামাইজেশন, ৩৪
ইসলামী ব্যাংক, ১৩৪, ১৩৮, ১৪২, ১৪৩
ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১৩৪
ইসলামী চিন্তাবিদ, ১৪২
ইসলামিক স্টেটস, ৩৫, ৮৪
ইহলৌকিক, ১৪৯, ১৭২
ইহজাগতিক, ১৩, ৪০
ইহুদি, ২৮, ৩১, ৩৬, ২০৩, ২০৪
ইরিত্রিয়া, ৭৭
ইতালি, ৭১
ইতিহাস, ২২, ২৬, ২৮, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৮১, ৮৬, ৯১, ৯২, ১০৭, ১২১, ১৬৮, ১৭৯, ১৯৩, ২০১, ২০৩, ২৪২, ২৪৩
ইবাদায়িহ, ৯৩
ইসমাঈলি, ৯৩
'ইয়ানত', ১৪৩, ১৪৪
'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং', ৭৮
'ইসলামিক স্টেট', ১৭৮, ১৭৯
'ইদাদ', ১৮২, ১৮৫
"ইয়ে আজাদি ঝুটা হায় লাখো ইনসান ভুখা হায়", ১০২
"ইউনাইটেড স্টেটস অব আফ্রিকা", ৭৭
"ইসলামের বিপন্নতা", ১০৩
"ইসলাম শান্তির ধর্ম", ১৮৫
"ইসলামী জিহাদের ইশতেহার", ১৮৭

ঈ
ঈশ্বর, ২২, ২৫, ২৬, ৬৬, ১৯৭, ১৯৮
ঈশ্বর প্রদত্ত, ৬৬

উ
উইকিলিকস্, ৫৩
উদারনৈতিক, ১৬, ৬২, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১৬০, ২০৯
উদীচী, ১১৮, ১১৯, ১৫৬
উচ্ছেদ, ৩৬, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৯৭, ১০০, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৭৫
উড়োজাহাজ, ১৩৪, ১৪০, ১৪৮
উইঘুর, ৩৭, ৮৪
উইলিয়াম মন্টগোমেরি ওয়াট, ৩৩
উপখাত, ১৪৯
উত্তর সুদান, ৭৭
উন্মত্ত, ৮৬
উত্থান, ৩৩, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৬০, ৬১, ৬৯, ১০৪, ১২০, ২৪২
উদ্ভবসূত্রে, ৯৫, ৯৭, ১০৩
উদ্ভব-বিকাশ-অবলুপ্তি, ২২
"উদারনৈতিক ইসলাম", ১১, ১৬, ৯৭

এ
একেশ্বরবাদী, ২২
একশিলা, ৯৩
একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ, ৬১, ৮১, ১৮৬
একাধিক শক্তির অস্তিত্ব, ২১
এম এম আকাশ, ১১
এস এম তারিকুল ইসলাম, ১২
এহুনি গিডেনস্, ১৩৬
এনসাইক্লোপিডিয়া, ১৯৪

এলিট, ১২১, ১৫৯, ২১৭
"একক জঙ্গি", ২১৩

ঐ
ঐতিহাসিকভাবেই উদারনৈতিক, ১৬, ৯১, ৯৪
"ঐতিহাসিক যুদ্ধের", ১০৪
"ঐতিহাসিক সংগ্রামের", ১০৪

ও
ওয়াহাবি মতবাদ, ১৫৯
ওয়াসিকুর রহমান বাবু, ১৫৮

ঔ
ঔপনিবেশিক, ৫১, ৯৮, ১৯৩, ১৯৪
ঔষধ শিল্প, ১৩৩, ১৩৯, ১৪০, ১৪৮, ১৫১

ক
কম্যুনিস্ট, ৩৫, ৫২, ১৭৪
কোটালিপাড়া, ১১৯
কোচিং সেন্টার, ১৩৩
ক্যাডেট মাদ্রাসা, ১২১
কৃষক সমিতি, ১৬১
কৃষি ঋণ, ৪২
কর্পোরেট ট্যাক্স, ১৪১
কর্মপ্রণালি, ১৭৮
কওমি মাদ্রাসা, ১৩, ৩৭, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১৬৬
কনফুসিয়াস, ৩১
কাতার, ৭১, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ১৩৮, ১৭৪, ২০২
কালো টাকা, ১১১, ১১৩, ১২৯, ১৩১, ১৬১
কালোবাজারি, ১৫১, ১৬৬
কবি-দার্শনিক, ২১
কার্যকারণ সম্পর্ক, ৪০, ৪১, ৪২, ২৪২
কারণ-পরিণাম, ১৮, ৪০, ৪১, ৪২,৫২,৮১, ১০২, ১৯১, ১৯৮, ২৪১
কাসপিয়ান, ৭৪
কুশাসন-অপশাসন, ১১১
কুয়াত ইল ইসলাম, ১২
কুনিও হোশি, ১৫৬
কুমিল্লা, ১৫৬
কিউবা, ৬৭, ৭১
কৌশিক বসু, ১১
ক্রমপুঞ্জীভূত, ৭৫, ১৩১, ১৩৯, ১৪৭
ক্রয়-বিক্রয়-হস্তান্তর, ২১৪
কুশাসন, ৪৪
ক্ষমতাহীনতা, ১০০
ক্ষমতার ভাগাভাগি, ১৬০, ১৭৩
ক্ষুদ্রঋণ, ১৪৪
ক্ষত্রিয়, ৯২
"কূটনৈতিক দৃষ্টিতে বাস্তবানুগ", ১৭৩
'কম্যুনালইজম', ৩০
"কার্য", ৪০, ৪৫
'কিলাল', ১৫৯, ১৮২, ১৮৫, ১৮৭
'ক্ষতি হ্রাস', ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২১৮
"ক্ষতি হ্রাসের কৌশল", ২১২

খ
খারিজ, ১৭৪
খেরোখাতা, ১২, ১১৫
খেলাফত, ১৮০, ১৮১, ১৮৫, ২২৬
খোস্ত, ১১৮
খুন-জখম, ৬০
খুরশেদিয়া মহিলা মাদ্রাসা, ১১৯
খ্রিষ্টধর্ম, ৩১
খিজির হায়াত খান, ১৫৬, ১৫৭

গ
গাইবান্ধা, ১৫৬, ১৫৫
গণহত্যা, ৩৭, ৮৩, ২৩১

গণজাগরণ, ১৩, ১৩৬, ১৬৭, ১৭১, ২০৮, ২২৭
গণতন্ত্র, ৬৩, ৮১, ৮৯, ১০১, ১৩৩, ১৬০, ১৮৭, ২১৯, ২২০
গণবিরোধী, ২৭
গতানুগতিক, ৩৪
গাজীপুর, ১৫৬
গ্রাহাম ফুলার, ৩৩
গ্রেনেড হামলা, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৭০, ১৮৯
গোথ্, ১৯৪
গোপালগঞ্জ, ১১৮, ১৫৫
'গ্রান্ড এরিয়া', ৬৮, ৭০
"গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের ফাঁসি চাই", ১৭১
"গণতান্ত্রিক নামধারী", ১৬২

ঘ
ঘনীভবন, ৪৭, ৪৮
ঘুষ, ৪৪, ১১১, ১৩২, ১৬৩

চ
চেতনায়ন, ৫০
চেতনাবিরুদ্ধ, ৫৯
চট্টগ্রাম, ১৫, ১৫৬
চরম লঙ্ঘন, ৩৭
চার্লি রোজ, ৩৯
চাঁদ, ৭৭, ১৩৫, ১৪৩, ১৫৬
চাঁদপুর, ১৫৬
চাঁদা, ১৪৪
চরিত্র-নিয়ামক, ১১১
চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ১৯৫
চীন, ৫৫, ৬২, ৭০, ৭১, ৭২, ৮২, ৮৩, ৮৬
চীন-ভারত, ৫৫
"চরমপন্থীয় সমাধান", ২১০, ২১১
"চীন ঠেকাও", ৮৩
"চীনকে ঘেরাও করো", ৮২, ৮৪

ছ
"ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাও", ৮৪

জ
জ্যোতিষির সংখ্যা, ১১৩
জেনারেল জিয়াউর রহমান, ৯৭, ১০৪
জেএমবি, ১৩৪, ১৩৭, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৮, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ২২৪, ২২৮
জোহান্স জ্যানসেন, ৩৩
জলোচ্ছ্বাস, ২১
জন ইসপোসিটো, ৩৩
জন কুইনসি এডামস, ৬৭
জন্মসূত্রীয়, ১৩, ৩১, ১৯১, ১৯৬
জন্মহার, ২৪
জনমানুষ, ১৩৩
জর্জরিত, ১৯, ১১০, ২১৯
জবরদখল, ৪৮, ৬০, ৭৯, ১০২, ১৬৯
জলপথ, ৭৬, ৮৩
জলবায়ু পরিবর্তন, ৫০
জল-রাজনীতি, ৭৪
জলাভূমি, ৬৬, ১৩২
জগন্নাথ হলের ছাদ, ২০৮
জয়পুরহাট, ১৫৬
জাপান, ৭১
জার্মানি, ৭২
জামান, ২৪১
জোলা, ৯৩
জামায়াতের রাজনীতি, ১৪৩
জামায়াত, ১৩৭, ১৪৪, ১৮৪, ২০৮, ২১৩, ২২৪, ২২৫
জামায়াত আদর্শের ব্যক্তি, ১৪৪
জোরপূর্বক, ৬৪, ৭৫, ১০০, ১৮০, ১৮৬
জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, ১০০
জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা ২০১২, ১৫, ২৪২
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৩, ৯৭, ১০৬, ২২০
জাতিসংঘ, ৪৯, ৭৬, ৭৮

জঙ্গিত্বের অনুঘটক, ১২০
জঙ্গিবাদ, ১৩, ১৫, ১৬, ৩৩, ৩৪, ৫৯, ৮৪, ৮৮, ৯৫, ৯৯, ১০১, ১১৪, ১২০, ১২৮, ১৬১, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ২০৭, ২১৩, ২১৭, ২২০, ২২২, ২২৬, ২৪১, ২৪২
জঙ্গিরূপ, ১৩৫
জঙ্গিত্ব সৃষ্টির উৎস, ৮২
জঙ্গিত্ব-প্রমোটার, ২১৪
জুম্মার নামাজ, ২১৪, ২১৫
জুন্নুন, ১১
জুলহাস মান্নান, ১৫৭
জি এইচ হ্যানসেন, ৩৩
জিওফফ্রে, ৩৪
জিওফফ্রে ও তারিক মোদুদ, ৩৪
জিহাদ, ১১, ১৬, ২৩, ২৪, ৩৬, ৪২, ৯২, ১১৯, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৯, ১৭৭, ১৭৯, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২৪৮
জিয়াউর রহমান, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭
জিম্মি, ১১২, ১৫৭
জিডিপি, ৬৩, ১৪৭
জ্ঞানপাপী মানুষ, ১৭০
জ্ঞানশাস্ত্রীয়, ৩৪, ৪১
"জ্ঞানী", ৮৮
"জাতিসংঘের রিফর্ম", ৮৮
"জাত সাপের শাবকদল", ১৯৩
"জিহাদি ইশতেহার", ১৫৩, ১৫৬, ১৬১, ১৮৮
'জিহাদ', ১৬, ২৩, ২৪, ৩৬, ৪২, ৯২, ১১৯, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৯, ১৭৭, ১৭৯, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২৪৮
"জরুরি অবস্থায়", ৯৮
'জয় বাংলা', ২১৯, ২২০
'জাগো মুজাহীদ', ১১৯
'জনমনে অসাম্প্রদায়িক', ১৬৭

ঝ
ঝালকাঠি, ১৫৬
ঝুঁকি হ্রাস কৌশল, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২১৮
'ঝুঁকি হ্রাস', ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২১৮

ট
ট্রাস্ট, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৪৮, ১৫১, ১৬২, ১৮৪, ২১২, ২২৪
টার্গেট নির্ধারণ, ১৭৮, ১৮৪
টাইগ্রিস, ৭৪
টুইটার, ১৩৬

ঠ
ঠাকুরগাঁও, ১৫৬

ড
ড. আবদুল গফুর স্মারক বক্তৃতা, ১৪
ডায়ালেক্টিকস্, ২০৯
ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ১৩৩, ১৩৯
ডালিয়া মোগাহেদ, ২৩
ডাউটফুল, ১৪৩
ডোনাল্ড ট্রাম্প, ৩৭, ৫১, ৭০, ২০৪
ডিপ টিউবওয়েলকেন্দ্রিক সমিতি, ১৬১
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, ১৩৩, ১৪০, ১৪৮, ১৫৯
ডিক চেনি-রোনাল্ড রামস্‌ফল্ড, ৫০, ৬৬, ৭১
"ডলার অর্থনীতির বিপর্যয়", ৬২, ৬৩

ঢ
ঢাকা, ১২, ১৫, ৩৭, ৯৩, ১১৮, ১১৯, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৭২, ২০৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৮

ত
তেল-গ্যাস-জ্বালানি-খনিজসম্পদ, ৬১, ২২১
তনয় মজুমদার, ১৫৬

তরবারি, ৯১, ৯২, ৯৫, ১৯৮, ২০৩, ২০৯
তালেবান, ৬৪, ৭৯, ১৭৯, ২০৪
তালেবানইজম, ৩৭, ৬১, ৬৪, ১৮৬
তালাল আসাদ, ৩৩
তারিক আলী, ৩৪
'তাগুতি', ১৮৭
"তারকা বালক", ৮৪

থ
থাইল্যান্ড, ৮৩
থিওডর রুজভেল্ট, ৬৭, ৬৮
"থুকোডাইডেস প্রিন্সিপ্যাল", ৪৯, ৮৬

দ
দমন-পীড়ন, ১১১, ২৩১
দর্শনশাস্ত্রীয়, ৪০, ৪১
দরিদ্রদের সন্তুষ্ট, ২৩, ৪৪
দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ৩৯, ৪৯, ৭৯
দরিদ্র, ৭২, ১০২, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১৪২, ১৬১, ১৮৯
দারিদ্র্য, ৪৪, ১০০, ১১০, ১২৬, ১৮৯, ২৪৩
দারিদ্র্য-বৈষম্য, ১২৮, ২১৬
দুর্নীতি, ৪৪, ৫০, ৫২
দুর্বৃত্তদের সহচর, ১০২
দুর্বৃত্তায়ন, ৪৪, ১২২, ২২০, ২৩০
দুঃশাসন, ৪৪, ৫২
দেশি-বিদেশি, ১৫৪, ১৫৭, ১৬২
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ১৫৩, ১৮৮, ২১৯
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৬৮, ১৯৪
দৃশ্যমান, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৮১, ৮৫, ১১৫, ১৬১, ১৬২, ১৬৫, ১৬৬, ১৯৮, ২০২, ২২০
দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪৩, ২৮৯
'দখলদার', ৪৮
'দাদাগিরি নীতি', ৬৬
'দাওয়ায়ে হাদিস', ১৬৬
'দাওয়া', ১৫৯, ১৮২, ১৮৫
"দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা", ৪৫, ৪৭, ১৫০, ২৪১, ২৪২
"দালাল আইন", ১০৪

ধ
ধর্মের উদ্ভব, ১১, ১৬, ২২, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫
ধর্মের মধ্যে রাজনীতি, ২৭, ২৯
ধর্মের রাজনীতি, ২৭, ২৯, ২৪৪
ধর্মের রাজনৈতিকীকরণ, ২৯, ১০৭
ধর্ম দর্শন, ১৬, ১৯১, ১৯৮
ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ১৩১
ধর্ম ও ব্রেইন, ১৪, ১৬, ১৩৫, ১৯১
ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, ২৭, ২৯, ৩৯, ১০৭ ২০০
ধর্মভীরু, ২৭, ৬০, ১০৭, ১৮৭, ২০৭
ধর্মানুভূতি, ৮৪, ৮৯, ১৯১
ধর্মাচার, ৩১, ৬০
ধর্মান্ধ, ২৭, ১২৭, ২১৯
ধর্মনিরপেক্ষতা, ১৩, ২৮, ৩০, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১৩, ১২৯, ১৬০, ২২০
ধর্মবিশ্বাস, ২১, ২৭, ১৯৭
ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬১, ৬২, ৮১, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২৮, ১৩০, ১৫১, ১৬৪, ১৯১, ২০১, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২২১
ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান, ৯৮, ১০৪, ১২৮
ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব, ১৬, ৩৫, ৩৬, ৫৭, ১৬০, ১৬৮, ২১৮

ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ৯৯, ২১৯
ধর্মীয় মতাদর্শ, ৪৬
ধর্মতত্ত্বে আদি পাপের কাহিনি, ৪৩
ধর্মীয় উগ্রবাদী, ১৩৭, ১৫৮
ধোঁয়া, ৪১, ৪৫
ধর্মাচার, ৩১, ৬০
ধার্মিক, ২৫, ২৯, ৩০, ১০৭
'ধর্ম' ও 'বিশ্বাস', ২৬
'ধর্ম নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি', ২৫
"ধর্মবিশ্বাসী", ২৫, ১০৭, ১১২
'ধর্মপ্রবণ', ২৫
'ধর্মপ্রাণ', ২৫, ৩০, ১০৭, ১৪৪
'ধর্ম', ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৪৮, ৮৮, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৬, ১২২, ১২৯, ১৩৩, ১৩৫, ১৬১, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ১৯৯, ২০০, ২০৭, ২২০
'ধর্মান্ধ', ২৫, ২৭, ৯৯
'ধর্মান্ধতা', ২৫, ১৯১
"ধর্ম-রাজনীতি", ২৮, ৩০
"ধর্মের প্রোগামিং", ১৯৬
"ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল", ৬৩, ২২১
"ধর্মের ভূমিকা", ১৩০, ১৮৭
"ধর্মের রাজনীতি", ২৭, ২৯, ২৪৪
"ধর্মের সাথে রাজনীতি", ২৯,
"ধর্ম পরিচয়", ১৯৯
"ধর্ম-উদ্ভূত", ৮৪
"ধর্ম ও রাজনীতি", ১৪, ২৮, ২৯
"ধর্মভীরু", ২৫, ৬০, ১০৭, ১৮৭, ২০৭
"ধর্মনিরপেক্ষতা", ২৮, ৩০, ৯৮, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১২৯, ১৬০, ২২০
"ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র", ২৮, ৮২, ৯৫, ৯৮, ১০৬, ২২২
"ধার্মিক", ২৫, ২৬, ৩০, ১০৭

ন
নৌবাহিনী, ৬৭
নোবেল পুরস্কার, ৭০, ১৯৫
নব্য-জেএমবি, ১৮৩
নওগাঁ, ১৫৬
নাইজার, ৭৭
নারী আত্মঘাতী, ১৬৮
নারী-প্রতিরোধ, ১৫, ৪৭
নারীবিদ্বেষ, ৩৮, ৬০, ১৬৭, ১৭১
নাজিমুদ্দিন সামাদ, ১৫৮
নর্ডহাউস সাহেব, ৭৬
নীলয় নীল, ১৫৮
নির্বাহী বিভাগ, ৪৬
নিম্নমধ্যবিত্ত, ১২৫, ১২৬, ১৬৪, ১৭২
নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, ১২৫, ১২৬
নিযার্স, ১৪
নিরঙ্কুশ, ৬১, ৭২, ৮১, ৮২, ৮৮, ৮৯, ১২৬, ১২৭, ১৩৫, ১৬৯, ১৮৬, ২২১
নিরঙ্কুশ দক্ষতা, ১৩৬
নিরঙ্কুশ মালিকানা, ৬১, ৭২, ৮১, ৮৮, ৮৯, ১২৭, ১৬৯, ১৮৬, ২২১
নিট মুনাফা, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৮
নিখিল জোয়ার্দার, ১৫৫
নিত্য চন্দ্র, ১২
নেতা-ক্যাডার, ১৪৩, ১৪৪
নোয়াম চমস্কি, ৪৫, ৪৯, ৫৯, ৬১, ২১৭
নিজারি, ৯৩
নির্ণায়ক, ৪৫
'ন্যায় বিচার', ৬৫
"নিরুদ্দিষ্ট হিন্দু জনসংখ্যা", ১০০
"নয়া দুনিয়ায়", ৬৪
"নারীর প্রতি অবিচার", ২০৩
"নীরিহ খাত", ১৪৬
"নীতিগত", ২৫, ১৭৩

প
পেশোয়ার, ৩৫, ১১৮

পেশাজীবী, ১৩৪, ১৩৫
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ৩৭, ৭০, ২০৪
পৌরাণিক কাহিনি, ১৮, ৪২
পোয়াতি, ১৭৫
পথযাত্রা, ৭৯
পথসভা, ৭৯
পূর্ব বাংলায় ইসলাম, ১৬, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮
প্যালেস্টাইনে হামাস, ২০৪
পৃষ্ঠপোষকতা, ৯১, ৯২, ১৩২
পঙ্গুত্ববরণ, ২১৩
প্রেসিডেন্ট জেমস মন্‌রো, ৬৫
প্রদীপ বকশি, ১২
পশু-পাখি, ২১
পরজাগতিক, ৪০
পরজীবী শ্রেণি, ১৩০
পরাক্রমশালী, ৮২, ১০১
পল কেলি, ২৪
প্রক্ষেপণ, ১২০, ১৬১, ১৭০, ১৮৮
পুঁজিবাজার, ১৩৮, ১৪৩, ১৫১
প্রভাবনা-মাত্রা, ১১৬
প্রভাত পাটনায়েক, ৩৪, ৫১
প্রযুক্তি দখলকারী গোষ্ঠী, ৫৩
প্রগতিবিরুদ্ধ, ২৮, ২২১
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১২১, ১২২
প্রাণ-সংযোগ, ১৬৩
প্রতিশোধস্পৃহা, ১৬৯
প্রতিক্রিয়াশীল, ২৩, ২৮, ১০৪, ১০৬
পাঞ্জাবি-সিন্ধি-বেলুচ, ১০৩
পারস্য, ৭৪, ৮৩২, ১৯৩
পানিসম্পদ, ৬১, ৭২, ২২১
পাকিস্তান, ২৬, ৩০, ৮৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৮, ১১২, ১২২, ১২৮, ১৭২, ১৮১, ১৯৩, ২০০
পশ্চিম সাহারা, ৭৭
পবিত্র কোরআন, ১৫৮, ১৭৯, ২০৪
পরিপ্রেক্ষিত, ৫৪, ১৪৫, ১৬২, ২১১
পরিচয়-সংকট, ৪০, ১২১, ১৬৯, ২০০, ২০১, ২০২
পীর-ফকিরের সংখ্যা, ১১৩
পুঞ্জিভূত, ১২২, ১২৭, ১৫৮
পুঞ্জিভবন, ১২৬
পর্তুগাল, ১৯৪
পিরামিড, ৫৫, ৫৭
প্রভাবকি, ১৯
পানামা পেপারস্, ৫৩
পাঠান, ৯৩
প্রপঞ্চ, ১৭, ২২০
'পৃষ্ঠপোষকতা', ৯১, ৯৫, ১৩২
"প্রকৃতি বিশ্বাসী", ২৫
"প্রোগামড্ বিশ্বাস", ১৯৬
"পরোক্ষ", ২১৩
"প্রলেপপন্থী", ৮৯
"প্রভাবক", ৪৫, ১০১, ২১৬
"প্রভুভক্ত ডিক্টেটর", ৭৭
"প্রচলিত অর্থের ধর্ম", ৩০
"পচা আপেল", ৫৪, ৭১
'পারিবারিক সংস্কৃতি', ২০০
"পবিত্র জোট", ৬৫
"পবিত্র যুদ্ধ", ১৫৮, ১৬৯, ১৮২
"পরিসংখ্যানিক অর্থনীতি, ১১১
"পিভট্-টু-এশিয়া", ৮৩

ফ
ফ্রান্স, ৬৮, ৭৮
ফয়েজ, ১১
ফয়সল আরেফিন, ১৫৮
ফটকাবাজ, ১২৮
ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, ১৩৩
ফাঁস, ১৫৪
'ফতোয়া', ১১৭, ২০৪

ব
ব্রেইন সার্কিট, ১৯৫, ১৯৬

বেসরকারি সংস্থা, ১১৯, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০, ১৪৬, ১৪৮, ১৬২, ১৮৪
বৌদ্ধ, ২৮, ৩১, ৩৭, ৯৩, ১০২, ১৫৫, ১৫৭
বৌদ্ধ ভিক্ষু, ১৫৫, ১৫৭
ব্যবধান-ফারাক, ১০৮
ব্যাংক, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৬
ব্যাবিলন, ১৯৩
বঙ্গবন্ধু, ১৩, ৯৭, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১২৯, ১৩০, ২১৯, ২২০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩
বাগদাদ, ৬৬, ১৯৪, ১৯৫
বাসনা, ৬৬, ১৯৪, ১৯৫
বাসসাম টিবি, ৩৩
বাহরাইন, ৩৯, ৭৭, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ২০২
বৈজ্ঞানিক, ২২, ৩৪, ৫৩, ১৯১, ২১৫
বাহ্যিক, ১৯, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৯, ৫৩, ৫৯, ৭৪, ৭৫, ৮১, ১৬২, ১৭১, ১৭৫, ১৮৭, ১৯৩, ২১০, ২১৭
বার্ট্রান্ড রাসেল, ২৩
ব্রাহ্মণ, ৯৩
বিভ্রান্তিকর, ৩০, ৩৪, ১৪৪
বিমা কোম্পানি, ১৪২
"বিশ্বব্যাপী, ১৭, ২১, ২৩, ৩৯, ৪৫, ৫০, ৫১, ৬০, ৬৮,
বিশ্লেষণ, ১৪, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৫২, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৮০, ৮১, ৮৭, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১০৩, ১১২, ১১৬, ১২২, ১২৬, ১২৯, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৫১, ১৫৩, ১৬৪, ১৭২, ১৭৩, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ২০০, ২১১, ২১৯, ২২০, ২৪৩
বহুস্তর, ১৫২
বাঙালি, ৯৯, ১৬৯, ১৯৬
বাংলা ভাষা, ৯৯
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ১৫, ২৪২, ২৪৩
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ১৩৮, ১৪০, ১৪৮, ১৫২
বহিঃস্থ বিষয়াদি, ৬২, ৮৯, ১২৮
বহিঃস্থকরণ, ৪০
বর্ণভিত্তিক, ২১০, ২২১
বিমান ঘাঁটি, ৩৯
বিদ্যুতের ঝলক, ২১
বিস্তৃতি, ৩৩, ৪১, ৪৫, ১০৮, ১২৫, ১২৯, ১৪৯, ১৬০, ১৮৪, ২০৯, ২৪২
বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা, ১৬, ১২৯, ১৪৭
বিশ্বের সবকিছুই আমাদের, ৭৯
বিক্ষোভ, ৭৯
ব্রিটেন, ৬৭, ৬৮, ১৯৪,
বিজ্ঞানসম্মত, ১৪, ১২০, ১২২, ১৪০, ১৮৪
বিধ্বংসী বোমা, ১৫৮
বিন লাদেন, ৬১, ১৭৯, ১৮৬
বিবর্তনগত, ২২, ১৭২, ১৯২
বিলুপ্তি-প্রবণতা, ১৬৭
"বিশ্বব্যাপী, ১৭, ২১, ২৩, ৩৯, ৪৫, ৫০, ৫১, ৬০, ৬৮, ৭৪, ৭৫, ১৬২, ১৭১, ১৭৫, ২১০, ২১৭
বিশ্ব কব্জাকরণ, ১৬
বিশ্বপ্রভু, ৪৫, ৬৫
বিশ্বব্যাংক, ৪৯, ৭৬, ৭৮
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, ৪৯
বিশ্বশক্তি-পরাশক্তিতে রূপান্তরিত,৬৭
বিচার বিভাগ, ৪৬, ১৫৯
বিচারহীনতা, ৩৪, ৪৪, ৪৯, ৫০, ১২২, ১৪৯, ১৫১, ১৯১, ২০০
বিচার-বিশ্লেষণ, ২১৯,

বিডিআর, ১৭৫, ১৮৮
ব্যক্তি-গোষ্ঠী, ৫৩
বেভারলি, ৯৪
বৈষম্য, ১৩, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৭৯, ৮২, ৯২, ১০৫, ১১৩, ১২১, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৬৪, ১৬৯, ২০০, ২০২, ২০৩, ২১৭, ২১৮, ২২১
বৈশ্বিক আধিপত্য, ১০৮
বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, ৫৯
'বেহেশতবাসী', ১১১, ১৯৭
'বাস্তবায়নযোগ্য', ৮৫
'বিশ্ব-প্রভুত্বে', ৭০
'বিশ্বাস হিসেবে ধর্ম', ২৫
'বিশ্বায়ন', ৬১, ১৩৬
"বাষ্পীভূত হওয়ার", ১০১
"ব্রিফকেস পুঁজিবাদ", ১০৯
"বিজ্ঞান দখলকারী", ৫৩
"বিজ্ঞানসম্মত একমুখী বাধ্যতামূলক শিক্ষা", ১২০
"বিচারহীনতার সংস্কৃতি", ৪১, ৪৮, ২৫৪
"বৈশ্বিক শোষণ", ৫১, ৫৪

ভ
ভৌগোলিক-রাজনৈতিক, ১০৬
ভূমিহীন, ১২৫, ১৩৩,
ভূমিচ্যুত, ৯৯
ভলতেয়ার, ১৯৩, ২০৭
ভাগ্য, ২৩, ৪৪
ভেদনীতি, ৯৩
ভীতি, ১৭, ৭৫, ১৩৬, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৮১, ২০৪
ভ্রান্ত সূত্র, ২১৭
ভাস্কর্য, ৩৮, ১৬৮
ভাইকিংস, ১৯৪
ভাববাদী দর্শন, ২২
ভারসাম্যপূর্ণ, ১৫০
ভাষা, ১২, ৩৮, ৬৭, ৯৯, ১৪২, ১৯৭
ভাষাবিজ্ঞানী, ৩০
ভাষাতাত্ত্বিক, ৩০
"ভেটো", ৮১
"ভীতি বলয়", ১৮১

ম
মৌলবাদ, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৮, ৫৪, ৫৮, ৬০, ৭১, ৮০, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯৬, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১০৮, ১১৪, ১১৮, ১২০, ১২৫, ১২৬, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫, ১৫১, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২, ১৮৬, ১৮৯, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১৬, ২২০, ২২১
মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, ১৪
মৌলবাদী জঙ্গি, ১১, ১৬, ১৮, ২২, ২৮, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৪৭, ৫৪, ৫৯, ৬১, ৮০, ৮৬, ৮৮, ৯৫, ১০২, ১০৭, ১১৫, ১১৮, ১৫১, ১৫৬, ১৫৯, ১৬২, ১৭১, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৭, ২২১
মৌলবাদী জঙ্গিত্ব, ১১, ১৬, ২০, ২৪, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৮০, ৯৩, ১০০, ১০৩, ১০৪, ১২০, ১৪৭, ১৫০, ১৭০, ১৭৫, ১৮৬, ১৮৯, ২০১, ২০৯, ২১১, ২১৭, ২১৮, ২১৯
মৌলবাদের অর্থনীতি, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ৫৮, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৬০, ১৬৮, ২০৭
মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ১৪, ১৫, ১৬, ৫৯, ৬৪, ৮৯, ১৭৩, ২০৭, ২৪২
মৌরিতানিয়া, ৭৭
মো. মোজাম্মেল হক, ১১
মো. শহিদুল্লাহ, ১৫৫

মোল্লা ওমর, ৬১, ১৭৯
মেক্সিকো, ১১
মডারেট মুসলিম, ১০৬
মনে মনে ধারণ, ৮৭
মু. কামারুজ্জামান, ১৭৫
মুক্তবাজার, ৪৫, ৬৩, ১১০, ১৩০
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ১১০, ১১১, ১৪১, ১৪২
মুফতি আবদুল হান্নান, ১১৮, ১১৯
মুফতি শফিকুল ইসলাম, ১১৯
মুকাল্লা, ৩৮
মুসলমান, ২৩, ৩৬, ৬২, ৮৪, ১০১, ১০২, ১৪৪, ১৮৪, ১৮৮, ২০২, ২০৮, ২১৫, ২৪২
মুসলমান সম্রাট, ৮৯
মুসলিম ভীতি, ২০৪
মুক্তিযোদ্ধা, ১০৭
মুক্তিযোদ্ধার আবরণ, ১০৪
মুক্তিযুদ্ধ, ১৫৮
মতভেদ, ২১
মতাদর্শ, ১৮, ২৫, ৪৬, ৬৯, ১১৬, ১৭৭, ১৮৫, ২০৭
মূল্যসন্ত্রাসী, ১৫১
মঙ্গোল, ১৯৪
মনোজাগতিক, ১৬, ১৮, ১১২, ১১৩, ১৩৫, ১৯১, ১৯২, ১৯৮
মনোজাগতিক ধর্মদর্শন, ১৩৫, ১৯২, ১৯৮
মধ্য-মধ্যবিত্ত, ১২৫, ১২৬, ১২৮
মন্‌রো, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ১০৬
মন-মনন, ৪২, ২০৫, ২১২, ২১৫, ২১৬
মঈন, ১১
মর্মবস্তু, ২১, ২৪, ৫১, ৫৯, ৮১, ১২৯, ১৬২, ২২০
মর্মকথা, ৪৮, ৮৭
মহাদুর্নীতিবাজ, ১৩০
মহাশূন্য-মহাকাশ, ৭২
মহা-বিপর্যয়, ১৬৮
ময়নাতদন্ত, ১১২
ময়মনসিংহ, ১৫৫
মং শৈউ চ, ১৫৫
মানব উন্নয়ন, ২১৩
মানব সম্পদ বিনষ্ট, ৯৮
মানবকল্যাণমুখী, ১০৮
মানবকল্যাণকামী, ৯৮
মানবাধিকার, ৯৯, ১০৪, ১৭১, ১৭৪
মানবতাবিরোধী, ১৬৪, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ২০৯, ২১২
মানসকাঠামো, ১৩, ৫৯, ১০৮, ১০৯, ১১৩, ২১৮
মানবিক, ১১, ১৬, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ১০৩
মাও-সে-তুং, ১৯৪
মারাত্মক, ২৩, ২৮, ৬০, ৭৭, ১০৫, ১১৩, ১৫৪, ১৭২, ১৮৪, ১৯৮
মালয়েশিয়া, ৮৩, ৮৪
মালাক্কা চ্যানেল, ৮৩
মহাবিপর্যয়কর, ৩১, ৬০, ১৮৪
মানবিক, ১৬, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০৩
মালি, ৪২, ৪৫, ৭৭
মার্কিন, ১১, ১৭, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১২৭, ১৩৮, ১৬০, ১৬৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৬, ১৯৪, ২০৪, ২০৫, ২১৭, ২২১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১১, ১৯, ৩৯, ৫২, ৬১, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৬, ১৭৩, ১৭৪, ১৮৬
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৪৯, ৫৩, ৭২, ৭৬, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৪,

৮৮, ১০৬, ১১৩, ১৬২, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৮, ২২১
মার্টিন লুথার, ১৯১
মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, ১০০
মাতৃগর্ভ, ১৯০, ১৯৫, ২১৬
মস্তিষ্ক কোষ, ১৯০
মুস্তাফি, ৯১
মোঘল, ৯১
মিসর, ৩৮, ৭০, ৭৬, ৮৪, ১৯২
মিছিল, ৭৯, ১০২
মওদুদী, ২২, ১৪০, ১৪২
মুক্তচিন্তা, ৫৯, ১৫৭, ১৬৫, ১৮৩
'মিলিটারি/সামরিক সমাধান', ২১৭
'মৌনতা', ১৬৮
'মাদ্রাসা শিক্ষা', ১১৬, ১১৭, ১২০
'মাদক সম্রাট', ৩৫, ১৮৬
'মসজিদ', ৯৪, ১১৬
'মূলধারা', ১১৭
'মূর্তি-ভাস্কর্য', ১৬৮-১৭১
'মূল ধারার শিক্ষা', ১১৭
'মতাদর্শ হিসেবে ধর্ম', ২৫
"মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ", ১০১৯৯
"মৌলবাদের অর্থনীতি", ১৩, ১৪
'মোরো', ৩৮
"মদ্যপ শাসন", ৬৫
'মন্‌রো মতবাদ'সহ ম্যানিফেস্ট ডেসটিনি, ৭০
"মধ্যপন্থীয় সমাধান", ২১০, ২১১
"মন্‌রো মতবাদ", ৬৫-৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ১০৬
মহান, ১০৫, ১০৬
"মহাদেশীয় পুলিশম্যান", ৬৭
"মানবাধিকার লঙ্ঘন", ১০৪, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫
"মানবাধিকার সংস্থা", ১৭৪
"মানামা", ১৮১
"মস্তিষ্কের ধর্মভিত্তিক প্রোগ্রামিং", ১৯২
"মুক্তির পথে", ১১১

য
যাত্রামঞ্চ, ১৫৯
যুদ্ধংদেহী, ১৭, ৩১, ২০৭
যুদ্ধাপরাধ, ৭৩, ৮০, ১০৭, ১৭২,
যুদ্ধবিরতি, ৪৯, ৬২, ৭২, ৭৮
যুক্তরাজ্য, ১৭১
যুক্তিক্রম, ১৭১
"যুদ্ধ নয়", ১৭৯
"যুদ্ধ ও শান্তি স্টাডি প্রজেক্ট", ৬৮
"যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা", ৬৩, ৭৫
"যুদ্ধাপরাধতুল্য", ১৭৫
"যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি", ৮৮

র
রেন্ট সিকিং, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫২, ১৩১, ১৫০, ১৫১, ২১১, ২২১
রেন্ট-সিকার, ১৩, ৪২, ৪৬, ৫৩, ৫৫, ৬৩, ১০২, ১০৯, ১১১, ১১২, ১২২, ১৩০
রেক্স টিলারসন, ৭৯, ৮৪
রাকিব মামুন, ১৫৮
রেলপ, ৬৪
রোম, ১৯২
রুশ বিপ্লব, ৬৪
রংপুর, ১৫৪, ১৬২
রাষ্ট্র ও সরকার, ১৩০
রাষ্ট্রশক্তি, ২৭, ৮৮, ৮৯
রাষ্ট্র-সরকার, ২৮, ৪৯, ৭৩
রাখাইন, ১৮৬
রায়পুর, ১৫৮
রাজ কায়েম, ২২, ১৭৯
রাজনৈতিক ধর্ম, ২৮, ২৯
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ১৫২
রাজনীতিতে ধর্ম, ১৫২
রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতির 'ইসলামীকরণ', ১৩
রাজশাহী, ১৫৭, ১৫৮

রাজশক্তি, ২৭
রাজাকার, ১০৩, ১৭২, ১৭৬
রাজীব হায়দার, ১৫৮
রাশিয়া, ৬৭২, ৮৪, ৮৬
রবিনসন ক্রুশো, ৪৮
রিক্রুটমেন্ট পলিসি, ১৩৪, ১৩৯
রিয়েল এস্টেট, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৬, ১৪৯
রিচার্ড ডাওকনিস, ৩৪
রুশ বিপ্লব, ১৯৪
"রাজনৈতিক ইসলাম", ১১, ১৬, ৯৫
'রিবাত', ৯৭
'রাসায়নিক বাহক', ৯৭
"রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র", ১৯৬

ল
লেইলা আহমেদ, ৩৪
লোকজ সংস্কৃতি, ৩৪
লোহিত সাগর, ৭৩
'লাল ঘেটিওয়ালা সাদারা', ৩৭
লিবিয়া, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৪
লিজিং কোম্পানি, ৮৪, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯
লিজিং, ১৩১, ১৩১, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯
লড়াই-সংগ্রাম, ২৩, ২৭
লর্ড কার্লাইল, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫
লর্ড সালিসবারি, ৬৬
লক্ষ্মীপুর, ১৫৬

শ
শেখ, ১৩, ১৬, ৩৬, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৯০, ৯২, ৯৫, ১০৪, ১২৮, ১৫৩, ১৮৭, ২২০
শেখ মুজিবুর রহমান, ১২৮
শ্রেণি, ২২, ৫০, ১০২, ১৩০
শ্রেণিবিভক্ত, ২২
শোলাকিয়া, ১৫৫
শোষণ, ৩৪, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৮৯, ২০১, ২১৯, ২২১
শোষণমুক্ত, ১১, ১০৩, ১০৫
শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি, ৯৯, ১০০, ১০১
শ্রমের যন্ত্র, ১৯৭
শাস্তি, ৭২, ৭৫, ৮৫, ৯৮, ১০৪, ১৯৭, ২০৩, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২২৭
শক্তি ও খনিজসম্পদ, ৭২
শক্তিশালী, ২৬, ৪৫, ৬৩, ৮২, ১২৮, ১৪৬, ১৬১, ১৬৪, ১৮৭, ২০১, ২০৭
শরিয়াহ্ভিত্তিক, ২৯, ৩৮, ১৪৪, ১৫১, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৭, ২২৬
শিল্পকলা, ২২৬
শিল্পী খাতুন, ১১
শিয়া, ১৭, ৩৬, ৭৯, ৯১, ১৫৭
শিক্ষার ইসলামীকরণ, ১৭১
শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা, ১১৩
শুদ্র, ৯১
'শান্তি', ২২, ৬৮
'শোষণ-বৈষম্য-অসমতা', ১৮৬
'শক্তি প্রয়োগের শাসন', ৭৯
"শুভ অঙ্গীকার", ১০৮
"শত্রু সম্পত্তি আইন", ৯৮, ৯৯, ১০০, ২০৮
"শ্যাম এলাকা", ১৮১

স
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ৬৯
স্কুল, ১২, ১১৭, ১১৯, ১৩৩, ১৪০, ১৪৮, ১৬৬, ১৭২
স্থানীয় সরকার, ১৩২, ১৩৩
স্পেন, ১৯৪
সেনেগাল, ৭৭
সেনাবাহিনী, ৭৭, ১০৩, ১২২
সৌরমণ্ডল, ২২

সৌদি আরব, ৩৯, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮৪, ২০২
সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৩৫, ৬৮, ৬৯, ৭১
সেলিম রেজা, ১২
সৃজনশীল, ১৩৬, ২২১
সম্প্রদায়গত-গোষ্ঠীগত-ধর্মপরিচয়গত, ৪৯
সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, ১০৫, ১২৯
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ২২
সমস্যা সমাধানের দর্শন, ২৭
সমাজ-দালান, ১১৬
সমাজবদ্ধ, ৪৯, ১৯২১
সমাজহত্যা, ৮৩
সমাজতন্ত্র, ৩৫, ৬১, ৬৯, ৭৩, ১০৭, ১২৮, ১৬০
সমাজতন্ত্রী, ৬১, ৬৯
সমুদ্রগামী জাহাজ, ১৩৪, ১৪০, ১৪৮
সড়কপথ, ৮৩
সংকীর্ণতা, ৬২
সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য, ৪৪
সংঘ, ১৭, ৩০, ৮১, ৮২, ১০৫৩, ১৯৪, ২২২
সংবিধানে ইসলাম, ১০২০, ১৭২, ২২৬
সংবিধান, ২৭, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১৩০, ১৭২, ২১০, ২১৯, ২২৬
সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৩৯, ৭৭, ৮৪, ৮৫, ২০২
সাঁওতাল, ১০০
সাঈদ আবুল আলা মওদুদি, ৩২
সাম্রাজ্যবাদ, ১২, ১৫, ১৮, ১৯, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ১০৫, ১০৮, ১১৩, ১২১, ১২৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৯, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৮, ২১৮, ২২১, ২৪১, ২৪২
সাম্রাজ্যবাদী, ১২, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৮৮, ১২৮, ১৮৬, ২১৭, ২২১, ২৪১
সামন্তবাদী, ১০৯, ২৪১
সামাজিক মুক্তি, ৯১
সামাজিক জীব, ৪৯
সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ২২, ৪৩, ৪৬, ৮৭, ১০৩, ১০৯, ১২১, ১৪০, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৯, ১৬২, ১৬৮, ২১৩, ২১৫, ২১৭, ২৪১
সামাজিকবিজ্ঞানী, ২৯, ২৪১
সামরিক শক্তি, ৩৫, ৬৫, ২৪১
সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ১৪৩, ২৪১
সাদ্দাম হোসেন, ৭৪, ১৭৩, ২৪১
সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ১৭১, ২৪১
সাংস্কৃতিক সংগঠন, ২৪১
সামির আমিন, ৩৩, ৫১০, ২৪১
সাহিদা আখতার, ১২, ২৪১
সঙ্গিত, ২৪১
সফিউল ইসলাম লিলন, ১৫৮
সুইসাইড, ৪৫, ১১১, ১৫৩, ১৭০, ২০৪, ২০৯, ২২২
সুরা আনআম, ১৭৯, ১৮০
সুরা আনফাল, ১৮০
সুরা বাকারা, ১৮০
সুরা হুজুরাত, ১৮০১
সুশাসনের অভাব, ৫০
সুখ-শান্তি, ২২
সুন্নি, ১৭, ৩৬, ৭৯, ৯৩
সুফিবাদ, ১০৭
সুফি-ওলামা, ৯৮
সিলেট, ১৫৫, ১৫৮
সিসেরো, ৪০, ১৯৩
সিঙ্গাপুর, ৮৩
সিআইএ, ৩৫, ৫১, ৮৪, ১৭৯
সিবিএস নিউজ, ৩৯
সিরাজগঞ্জ, ১৫৪, ২৪১

সিরিয়া, ৩৬, ৬০, ৬২, ৭৪, ৮৪, ১৮১
সিরিজ বোমা, ১৫৩, ১৫৬
সিসিয়া, ২৪১
সোহাগপুর, ১৭৫, ১৭৬
স্পিলিন্টার, ৯৩
সাফরি, ৯১, ২৪১
সংগ্রাম, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৭২, ১৪৫, ১৭১, ১৮৯, ২১৪
সৈয়দ, ৯৩
সংঘাত, ২৬, ৩৪, ৮৩, ১০০, ১৭৯, ১৯৮
স্টিফেন হকিংস, ২৪১
সাম্প্রদায়িকতা, ১৩, ১৬, ২১, ২৫, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৫, ৫৬, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৯, ১২৯, ১৮৮, ১৯১, ২২০, ২৪২
'সন্ত্রাস', ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ১১১, ১৪২, ২১৭
"সুপার ধনী', ১২৭, ২৪১
'সুর নরম', ১৯, ২৪১
'সামাজিক মুক্তি', ৯২
"সীমানা", ১৬, ৫০, ৭৪, ২০৭, ২০৯
"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ", ২১৭, ২৪১
"সময়", ১৭, ৪৪, ৫১, ৫৪
"সমাধান", ৪৯, ১৭০, ১৯৭
"সরবরাহ চেইন", ১৬৫, ২৪১
"সরকারের মধ্যে সরকার", ১৫১, ২৪১
"সাম্রাজ্য বিস্তারের মহাকৌশল", ৭২, ২৪১
"সাম্রাজ্যবাদ পরিপুষ্ট", ৮৫, ২৪১
সার্বভৌমত্ব, ৫০, ৭৮
"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ", ২১৭
"সুশীল সমাজ শ্রেণি", ২৪২
"সীমানা", ১৬, ৫০, ২০৭, ২০৯

হ

হেফাজতে ইসলাম, ৩৭, ১০৭, ১৩৪, ১৬৮, ২৩০
হোতা সাম্রাজ্যবাদ, ১৮, ৫৩, ৫৭, ৬১, ৮৬, ৮৮, ১২৭, ১৬৯, ১৮৬, ১৮৮
হযরত শাহজালাল, ২৪২
হযরত মির্জা তাহয়ির আহমদ, ২৪২
হারাম, ১৭৩
হামিদ দাবাসি, ৩৪
হারি, ৯৭, ৯৮
হলি আর্টিজান, ৩৭, ৬০, ১৫৭
হতাশ-নিরাশ, ১২১, ১৬৪, ২০০, ২০১
হিন্দু, ২৪, ২৮, ৩১, ৩৭, ৯১, ৯২, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১৫৫, ১৯৫, ২০০, ২০৮, ২৪২
হিন্দু বনাম মুসলমান, ১০১, ১০৮
হিন্দু রাজা, ৯১
হিন্দুস্থান, ৯৮, ৯৯
হিন্দুখানা, ১০০
হিযবুল্লাহ, ২৪২
হাওয়ার্ড, ৪৫, ১৫৩, ২৪২
হানফি, ৯৩
হানবালি, ৯১, ২৪২
'হোতা', ১৮, ৩৪, ৫১, ৫৩, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৮২, ৮৩,৮৬, ৮৮, ১২৭, ১২৯, ১৬২১৬৯, ১৮৬, ১৮৮, ২২১
"হিন্দু রাষ্ট্র", ৩৭, ২৪২
"হলুদ বামন", ৭১, ২৪২
"হারিয়ে যাওয়া", ৪৪

১০ ট্রাক অস্ত্রবাহী জাহাজ, ১৫৫
১৩ দফা, ৬০, ১৬৭, ১৭১, ২৩০
১৩ শর্ত, ৩৯, ৮৬
১৩৩ চিহ্নিত গ্রুপ, ২৪২
১৭ আগস্টের বোমা হামলা, ২৪২
১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট, ২৪২
২১ দফা, ৬০, ১১৫, ১৭১
৯/১১, ৫০, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ২০৪, ২৪২

A
absolute monopoly and control, 60
absolute ownership, 61, 72, 242
access, 76, 186, 242
after death, 40, 195, 242, 244
aggregate, 210, 242
appearance, 34, 42, 59, 87, 135, 242

B
basic strategic resources, 64
Big Brother Policy, 66
Bourbon rule, 65, 242
Buddhist States, 84, 242
by product of evolution, 196, 242
catastrophe, 15, 218, 226, 245, 243
causal relation, 13, 40
cease fire, 242
Century Seapower, 83
chemical messenger, 196, 242
Christian States, 84, 242
Combating Fundamentalism, 13, 245
confusion, 178, 242
content, 41, 250
Continue Proxy War, 84, 242
Cornell University, 15, 244
Council on Foreign Relations, 68, 242
crony capitalism, 109, 242
crucial assumption, 149, 242
CS21R, 82, 242
Cui bono, 40, 193
‘crown prince’, 83, 243
“Capital in the Twenty-First Century”, 243

D
damage minimizing strategy, 212, 243
degree of communalization of economy, 139, 243
dialogue, 39, 243
drug lords, 186, 243
“divide and rule”, 85, 243
“Doctrine of resort to force at will”, 74, 243

E
earning asset, 149, 243
End of the Time Narrative, 24, 36
Enemy Property Act, 98, 99, 101
epistemological, 41, 243
essence, 41, 59, 87, 243
exclusion, 40, 243
exploitation, 45, 243
extermination, 10099
external, 14, 15,16, 18, 62, 81, 87, 88, 126, 128, 209, 211, 226, 243
extremistanic solution, 210, 211, 243

F
first order, 210, 243
foundation or basic structure, 243
freedom of choice, 108
fuel, energy, mineral resources, 72
fundamental strategic resources, 72
future impact and implications, 13, 243

"For the 1%, of the 1%, by the 1%", 128, 131

G
Gallup Press, 23, 241
generalization, 192, 241
genetically determined, 196, 241
genocide, 83, 241
God, 33, 195, 198, 241
Grand Strategy, 66, 72, 241

H
Hemispheric Policeman, 68, 241
Hindu States, 84, 241
History does not crawl, it jumps, 86, 241
Holy Alliance, 65, 241
Host, 241
host country, 39, 241

I
identity crisis, 40, 121, 169, 201, 202, 241
ideology, 25, 116, 241
immediate solution, 210, 241
immigration, 91, 241
Imperialism and Religious Fundamentalism, 15, 241
Independent Director, 141, 241
indoctrinate, 196, 241
informal sector, 166, 241
internal, 14, 16, 18, 62, 87, 88, 128, 209, 211, 241
internal form, 88
International Economic Association, 16, 227, 241
ISIS, 35, 241
Islamization of Education, 171, 241
Islamization of knowledge, 241
Itihas Sammilani, 15, 241

J
just extension and expansion of Monroe doctrine, 66, 241

I
land resources, 61, 72, 242
land resources which is not product of labor, 72, 242
life line, 165, 242
London, 15, 23, 24, 77, 80, 81, 159, 178, 195, 215, 227, 242
'logos', 172, 185, 242

M
Manifest Destiny, 66, 242
mass religion, 92, 242
Maulana Maududi, 23, 242
mediocristanic, 210, 211, 242
Mediocristanic solution, 210, 242
mirror neuron, 197, 242
monolithic, 93, 242
'mythos', 185, 242

N
net profit, 139, 145, 148, 242
Neuro scientist, 215, 242
Neurochemistry, 14, 242
Neurotheology, 14, 191, 192, 242
"No fly zone", 78, 242

O
observation, 210, 242
oil, gas, mineral resources, 61, 242
OPEC, 76, 242
ownership, 61, 72, 76, 186, 242
“Oklahoma City Bomber”, 242

P
patronage, 91, 242
perception of religion, 25, 207, 242
phases of transformation, 182, 242
Physical matter, 195, 242
Political CSR, 141, 243
Political Economy, 101
Political religion, 28, 243
Politicization of religion, 28, 243
Politics in religion, 27, 243
politics of convenience, 183, 243
Politics of religion, 27, 243
Politics using religion, 27, 243
poverty, 100
power, position and prestige, 69, 243
powerlessness, 100, 243
preventive war at will not preemptive war, 79, 243
primary solution, 210, 243
Projection, 24, 116, 243

R
red neck white, 37, 243
regime change, 69, 73, 243
regressive transformation, 98, 103, 243
relief, 210, 243
religion as faith, 25, 243
Religion in Politics, 27, 243
religiosity, 207, 243
religious brain, 3, 192, 198, 199, 243
risk reduction strategy, 212, 243
root cause, 18, 186, 243
rule of force, 79, 243
rule of law, 79, 243
‘role model’, 132, 243

S
sample, 210, 243
secularism, 30, 97, 160, 243
social liberation, 91, 243
Social phenomenon, 195, 243
sociocide, 83, 243
space, 61, 72, 243
speculation, 243
spiritual, 22, 244
spirituality, 196, 205, 244
statistical economy, 111, 244
structural, 210, 211, 244
subjugated form, 88, 244
sufism, 207, 244
super-duper rich, 127, 244
supply chain, 165, 244
sword, 91, 244
synthesis, 19, 220, 244

T
terror, terrorism, 80, 244
The Moududian Law of Apostasy, 23, 244
theologicians, 21, 244
time bound, 180, 244
total average asset, 244
total operating profit, 141, 244

U
unipolar world, 87, 244
Unitarian Imperialism, 15, 227, 244
unitarian system of imperialism, 88, 244
unpeopling, 98, 101, 244

V
vulture capitalism, 109, 244

W
War and Peace Studies Project, 68, 244
War Crime, 73, 244
War on Terror, 60, 70, 73, 244
water resources, 61, 72, 244
wealth accumulation, 193, 244
Weapon of mass destruction, WMD, 244
“We own the world”,, 245

X
xenophobia, 197

Y
yellow dwarves, 71

war lords, 186, 244